শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান

ড. সুনীতি বিশ্বাস

বিশ্বজ্ঞান
৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯



প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০ / ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক ঃ দেবকুমার বসু, বিশ্বজ্ঞান
৯/৩, টেমার লেন, কোলকাতা-৭০০ ০০৯।

অক্ষর বিন্যাস ঃ বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা
মুদ্রণ ঃ পদ্মনাভ ইম্প্রেশান, কলকাতা

উৎসর্গ

মনোরঞ্জন বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচিপত্র

নিবেদন		৫
ভূমিকা ডঃ সরোজমোহন মিত্র		৮
প্রাক কথন		১০
প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলা সামাজিক মৌলিক নাটকের প্রাথমিক পর্যায়		
রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'	(১৮৫৪)	২০
উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ'	(১৮৫৬)	৪৩
মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?'	(১৮৬০)	৫৮
মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'	(১৮৬০)	৬৯
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'	(১৮৬০)	৭৮
দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'	(১৮৬৬)	৮৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রাক-বঙ্গভঙ্গ ও বাংলা নাটক		
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'	(১৮৭২)	৯৩
অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'	(১৮৮৭)	১০০
গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল'	(১৮৮৯)	১০৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী'	(১৮৮৯)	১১৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন'	(১৮৯০)	১২৫
অমৃতলাল বসুর 'বাবু'	(১৮৯৩)	১৩২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ আধুনিক সমাজজীবন ও বাংলা নাটক		
গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান'	(১৯০৫)	১৪১
অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল'	(১৯১২)	১৪৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা'	(১৯২২)	১৫৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'	(১৯২৬)	১৬১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা'	(১৯৩২)	১৭০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঁশরি'	(১৯৩৩)	১৭৪
চতুর্থ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা নাটক		
বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'	(১৯৪৪)	১৭৭
পঞ্চম অধ্যায় ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক		
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা'	(১৯৪৭)	১৮৫
সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'	(১৯৫১)	১৯০
তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'	(১৯৫৩)	১৯৭
মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট'	(১৯৫৪)	২০৪
উপসংহার		২১০
গ্রন্থেতিবৃত্ত		২১৪

নিবেদন

আমার জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়েই এই গবেষণা গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আমি নারী। সমাজে সংসারে আমি পুরুষের আধিপত্যের অধীন। সহজ প্রবৃত্তির বশে ছোটবেলা থেকেই আমি এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে, আমি বিদ্রোহী হই। আমাদের গ্রামে (পূর্ব বাংলা) মেয়েদের পৃথক কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের পড়া নিষিদ্ধ। আমি নাছোড় হলে ছেলেদের স্কুলে আমার জায়গা হয়। সম্ভবত সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে পঞ্চম শ্রেণীর গণ্ডি পার করার আগেই আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। এরপর আরও দুই বছর ওখানকার স্কুলে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে আসি। বাপের বাড়ি ও স্বামীর সংসারের নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি মনুর সেই আদ্যিকালের অনুশাসন—নারী শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন, কখনই স্বাধীন নয়। বাপের বাড়িতে মা, ঠাকুরমাকে দেখে এবং শ্বশুরবাড়িতে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আমাদের এই সমাজ সংসারে নারী প্রকৃতই এক বিনা বেতনে সর্বক্ষণের কাজের লোক। কিছু আরাম আয়েশের প্রলোভন ও নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবনের আকাঙ্খায় বেশীরভাগ মেয়ে এই অসম্মানজনক ক্লেশকর জীবন আঁকড়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত এবং অন্যায় এবং অপমানকর অবস্থাকে সহজে তার সংস্কারে জড়িয়ে নেয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম শিক্ষার শক্তি এবং আর্থিক সামর্থ্য অর্জিত হলে নারী আপন শক্তিতে কিছুটা স্বাধীকার এবং মর্যাদার আসন ফিরে পাবে। আমি তখন সন্তানবতী। সংসারের যাবতীয় কাজ আমাকে করতে হত। থাকি উদ্বাস্তু পল্লি নববারাকপুরে। সেখানে অসংখ্য স্কুল কলেজ। প্রলুব্ধ হলাম বিনা বেতনের কাজের লোকের তকমাটা ঘোচানোর জন্য মাঝ পথে ছেড়ে দেওয়া পড়াটা আঁকড়ে ধরব। সংসারের ষোলয়ানা কাজ পুরো করে শ্বশুরবাড়ির প্রতিকূলতা সামলেছিলাম। শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এক সময় আমি শিক্ষিকা হলাম। এর ফলে সংসারের ভিতরে বাইরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সংসারে আমার অবস্থানের খুব একটা হেরফের ঘটেনি। পুরুষ আধিপত্যের সেই মনুবাদী ট্র্যাডিশন প্রবলভাবে বর্তমান।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থানগত তেমন কোন উন্নয়ন না ঘটলেও সমাজ বদলের ইঙ্গিত অনুভব করতে পারি। তবু বহু উত্তরহীন প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করে। শতাধিক বছর হল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ রদ হয়েছে। বিধবা

বিবাহের আইনগত স্বীকৃতি, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি যুগান্তকারী সব ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজে নারীর অবস্থানের গুণগত বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে না কেন? এই মূল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। শিক্ষা প্রবাহে যত অবগাহন করেছি ততই আরও নানা প্রশ্ন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত আমাকে ক্রমশ অস্থির করে বেড়ায়। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেও আমি সুস্থির হতে পারিনি। জেনেছি নানা সমাজ অর্থনীতির কথা। জেনেছি নানা সংস্কার আন্দোলনের কথা। দেশ-বিদেশের নারী প্রসঙ্গ আমাকে উদ্‌বেজিত করেছে। পড়েছি নানা নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা। জড়িত হয়েছি নানা প্রগতি আন্দোলনে। কিন্তু সবই আমাকে আরও জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। এর অনেকটাই দুর্বোধ্য এবং যেটুকু বোধ্য তাও সবটা মানতে পারা যায় না। তবে পরিবর্তনের যে একটা ধারা প্রবহমান তা তো অস্বীকার করা যায় না। এটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এই বোধ এবং জিজ্ঞাসাই আমাকে তাড়িয়ে এনেছে গবেষণার ক্ষেত্রে।

ঘটনাটা একান্ত ব্যক্তিগত হলেও এর মধ্যে একটা সার্বজনীনতাও আছে। প্রসঙ্গত তাই উল্লেখ করছি। আমার পড়াশুনার প্রতি আমার স্বামীর অনীহাটা কোনো কোনো সময় বৈরিতার রূপ নিত। তবু আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল যেদিন প্রকাশিত হয়েছিল সেদিন অফিসে না গিয়ে তিনি একখানা গেজেট কিনে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তার ব্যক্ত অনীহা ও বৈরিতার মধ্যেও একটা অব্যক্ত অনুরাগ না থাকলে এই কাজটা তিনি করতে পারতেন না। পুরুষ প্রাধান্য এবং আনুগত্য আধিপত্য থাকলেও তাদের সহযোগিতা এবং সমমর্মিতা ছাড়া নারী প্রগতিও বোধ হয় সম্ভব নয়। সমাজ সংস্কৃতির এই টানাপোড়েনের ঘটনা সম্যক না জানলেও নারীমুক্তির আন্দোলন সার্থকতা পাবে না। এই উপলব্ধি সরকারি স্তরেও দেখা যায়। ভারত সরকার সংবিধান সংশোধন করে (৭৩ তম) দশ লক্ষ নারীকে নেতৃত্বের আসনে তুলে আনতে পেরেছেন। তবু সমাজ ও সংস্কৃতির স্তরে বৈষম্যের যে ফল্গুধারা প্রবাহিত আছে তার সমাধানের পথ দূরবর্তী। অনেক সংগ্রাম ও শিক্ষার মাধ্যমে তা হয়তো পূর্ণ করা সম্ভব।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন নাটকের মধ্যে পরিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কথাটা মনে ধরে। তারপর নানা পথে ঘুরে সাহিত্যিক নাট্যকার সুহৃদ দীপক মিত্র আমাকে বিশ্বজ্ঞানের

কর্ণধার সাহিত্য প্রয়াসীর অকৃত্রিম বান্ধব দেবকুমার বসুর নিকট নিয়ে যান। তাঁদের পরামর্শে—"শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান" নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হই। দেবকুমার বসুর অনুরোধে অধ্যাপক ডক্টর সরোজমোহন মিত্র আমার গবেষণা পরিচালনা করতে স্বীকৃত হন। তিনি নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাপত্র রচনা পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে অসীম স্নেহে এবং অসাধারণ শ্রমসহকারে আমাকে পরিচালিত করেছেন। এই পর্বে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা বীথিকা মিত্রও আমাকে কন্যাসমা স্নেহে আশ্রয় দিয়েছেন এবং পরিপোষণা করেছেন।

এই কাজে নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও পুত্রবধূ, নববারাকপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বরুণ চক্রবর্তী, আমাদের সাহিত্যিকার অধ্যক্ষ কানাইলাল দত্ত, নাট্যব্যক্তিত্ব তুষার কান্তি মুজমদার, শিক্ষিকা নীলিমা দাস প্রভৃতি বহু সজ্জন শুভার্থীর বৌদ্ধিক সহায়তা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল কর্মীবন্ধুদের যাদের অকৃত্রিম সহযোগিতায়—কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরি, নববারাকপুরের রামকৃষ্ণ পাঠাগার ও ঋত্বিক ব্যবহারের অবারিত সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার পুত্রবধূদ্বয় দোলা ও সঞ্চিতা বিশ্বাসের আনন্দময় সহযোগিতা ছাড়া কাজটা হতে পারত না। কিন্তু সবার উপরে আমার কৃতজ্ঞতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার গবেষণাপত্রের পরীক্ষকদের প্রতি এবং আমার নির্দেশক পরিচালক ড. সরোজমোহন মিত্রকে। যাঁর চেষ্টা এবং পরিশ্রমেই আমার এই স্বীকৃতি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় গবেষণা পরিচালক ড. সরোজমোহন মিত্র স্নেহপ্রযুক্ত হয়ে আমার এই আরাধ্য প্রচেষ্টার একটি ভূমিকা লিখে একে অসামান্যতা দান করেছেন। তাঁকে প্রণাম।

১০১, কে. জি. রোড
নববারাকপুর

সুনীতি বিশ্বাস

ভূমিকা

একজন বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন কোন সভ্যতার মান জানতে হলে প্রথমেই দেখতে হয় সেখানে নারীর অবস্থান কী রকম। অর্থাৎ নারীর অবস্থান দিয়েই কোন সমাজ বা সভ্যতার পর্যায় নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে নারীর অবস্থান এবং প্রগতি নিয়ে বহু চর্চা হয়, নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদা নিরূপণের জন্য পালিত হয় নারী দিবস।

যারা সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি বা উন্নয়ন নিয়ে নানা পর্যালোচনা করেন তারা এই ব্যাপারে তাদের অনুসন্ধান, গবেষণা নির্ণয়ন করেন। আমাদের কাজ সাহিত্য নিয়ে। জীবনের প্রতিফলনই সাহিত্য। যুগে যুগে এই সাহিত্যে সৃজনের কাজ চলে। তার মধ্যে সাহিত্যকার তাঁর যুগের কথা, সময়ের কথা, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, তাঁর পর্যবেক্ষণের সমীক্ষণ প্রকাশ করে থাকেন।

আদম এবং ইভকে নিয়েই জীবনের বিকাশ। নারী ছাড়া এই বিকশন তো সম্ভব নয়। নর-নারী নিয়েই জীবনকথা। কোন সময়ের জীবনের কথা জানতে গেলে সাহিত্যেই প্রধান অবলম্বন। সাহিত্যের নানা রূপ। গদ্য পদ্যেই তার কেবল বিভাজন নয়। কথা, উপকথা, রূপকথা, কাব্য, মহাকাব্য, ছড়ায়, প্রবচনে গাথায় নাটকে, স্মৃতিতে রম্যরচনায় কত তার ব্যাপ্তি। জীবন সমুদ্রে উত্তরণের নানা প্রক্রিয়া আছে। আমরা শুধু নাটকের ডিঙা নিয়ে সেই উত্তরণের সন্ধানে ব্যস্ত। বাংলা মৌলিক নাটকের প্রথম প্রকাশ আঠারশো চুয়ান্ন সালে। তারপর নাটকের গঙ্গায় অনেক বান এসেছে। গবেষণায় একটা সময়সীমা আছে। একশ বছরের তেইশটি নাটকের মধ্য দিয়ে নারী প্রগতির সন্ধান করা হয়েছে।

ভারতে নবজাগরণের সূচনা উনিশ শতকে। সেই সূচনা হয়েছিল বঙ্গদেশেই ভারত পথিক রাজা রামমোহনের অভাবিত প্রচেষ্টায় এবং উদ্যমে। ইতিহাসে এক একজন মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে তাঁরা যুগচিন্তাকে অভাবিতভাবে যুগতিক্রমী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা যতই অতীত ভারতের গর্ব করি না কেন উনিশ শতকে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম এক বদ্ধজলায়। আচারে অত্যাচারে এবং বহু কুসংস্কারে এক অতলান্ত অন্ধকারে আমরা তলিয়ে ছিলাম। সেখানে নারীর অবস্থা কী দুর্বহ করুণ ছিল আধুনিকতার উজ্জ্বল্যে তা অকল্পনীয়।

শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর সেই অবস্থানের অনুসন্ধানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রাক্‌কথনে তা উল্লেখিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয়

নাটক ধরে ধরে তার উন্মোচন সাধারণ পথিকের কাছেই মনে হবে বিস্ময়কর। আমাদের দেশে যারা নারী অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত তাদের অনেক জানাকে এই গবেষণা অবশ্যই সমৃদ্ধ করে তুলবে।

এই গ্রন্থে আলোচিত নাটকের নাম অতি পরিচিত। কিন্তু তাদের মধ্যে নারী প্রগতির এত বিপুল তথ্যসম্ভার রয়েছে তা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তাদের মোহিত করবে। কৌলিন্য প্রথা থেকে ধর্মঘটের মিছিলে সামিল হওয়া এক দীর্ঘ পরিক্রমা। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যপ্রথার অন্ধ আনুগত্য থেকে হিন্দুমুসলমানের দাম্পত্য প্রেম এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালেও ধর্মের নামে যে বিভ্রান্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের সব ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে সেখানে এই ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের বিবেককে সচেতন করে তুলবে।

গবেষণার এই আলোচ্য বিষয় আমাকে দীর্ঘদিন ধরে বিচলিত করেছিল। শ্রীমতী সুনীতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করতে পেরে গভীর আনন্দ এবং সন্তোষ লাভ করতে পেরেছি।

শ্রীমতী সুনীতি কঠোর পরিশ্রমী। সে নিজেও নানা বঞ্চনা এবং অবহেলার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। আজ যাদের দলিত শ্রেণী বলে গণ্য করা হয় সুনীতি সেই শ্রেণীর মানুষ। কত প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে বাস করে সে প্রবীন বয়সে এই স্বীকৃতিলাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তাতে সুনীতির গৌরবের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে পেরে শিক্ষক পরিচালক হিসেবে আমিও গর্ব বোধ করি।

একান্ত অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠাই জীবনের বড় কথা। সার্টিফিকেট দিয়েই প্রতিভার মূল্যায়ন করা যায় না। কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিভার সার্থক পরিচয়। সুনীতির এই প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক বলেছিলেন ডিগ্রির চেয়ে কাজ বড়। সুনীতি এই গবেষণা দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বীকৃতি যে কেবল প্রতিষ্ঠানিক নয় আশা করি এই গ্রন্থ তার পরিচায়ক হয়ে উঠবে।

আমার চিন্তা এবং পরিশ্রম সুনীতির কাজের মধ্য দিয়ে যদি প্রশংসা লাভ করে তবেই শিক্ষক হিসেবে আমার সার্থকতা।

আই.এ. ২২, সল্টলেক
কলকাতা - ৭০০ ০৯৭

প্রাক্ কথন

আধুনিক যুগ হচ্ছে নারী জাগরণের যুগ। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যতই অগ্রগতি ঘটুক না কেন, নারী সব সমাজের মধ্যেই একটা অবহেলিত অংশ। অবশ্য যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সব দেশের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে নারী-পুরুষে সমান অধিকার স্বীকৃত। আধুনিক সমাজে শিক্ষায়, দীক্ষায় নারীরাও পুরুষের সঙ্গে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। তবুও নারীর অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। সেই জন্য আধুনিক নারীসমাজ নারীর অধিকার নিয়ে ভীষণ সোচ্চার। পৃথিবীর দিকে দিকে নারীমুক্তি আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নারীর এই অধিকারবোধকে আধুনিক সমাজ আর উপেক্ষা করতে পারছে না। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো এই অধিকারের আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। সেইজন্য বিশ্ব নারীদিবসও পালিত হয়। বর্তমান নারীসমাজ পুরুষের সমকক্ষ হ'য়ে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। তবুও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এখনও একটা পিছিয়ে-পড়া অংশ। সমাজের অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী। তাই নারীর প্রগতি ভিন্ন সামগ্রিকভাবে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌতূহল জাগে নারীর অবস্থা পূর্বে কীরূপ ছিল, এবং কীভাবে তা বর্তমান পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে।

সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ নাটক। সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যে থাকে জীবন সমালোচনা। নাটককে আরও বলা হয় সমাজের দর্পণ। নাটক সমালোচক বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই লিখেছেন, "মানুষের বাস্তব জীবন অবলম্বন করে নাটকের চরিত্র রূপায়িত হয়, যুগে যুগে তার সামাজিক রূপ ও অবস্থান এবং ক্রিয়াকলাপ, আচরণ, আদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তন হয়।" (নাটকের কথা)। অর্থাৎ নাটকের মধ্যেই যে সব চরিত্র রূপায়িত হয়েছে তাদের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন যুগের সামাজিক আদর্শ, রূপ ও স্বরূপ প্রভৃতি জানতে পারি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এইসব নাটকে যে সব নারীচরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে মানুষের বাস্তব-জীবন কতটা অন্বিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা বর্তমানে সমাজজীবনে যে নারীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করি প্রাচীনকালে বা একশ বছর আগে তা নিশ্চয়ই এরূপ ছিল না; ইতিহাসে আমরা একটা বিবর্তনরেখা জানতে পারি। কিন্তু সেখানে মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাবলি বা তার আন্তরপরিচয় লাভ

করতে পারি না। আমরা জানি, এই বাংলাদেশেই ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু ক'রে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ 'সমাজসংস্কার আন্দোলনে' ব্রতী হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তৎকালের সমাজজীবনে নারীদের অবস্থান কীরূপ ছিল; এবং সেই জীবন নাটকে কতটা বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাধারণভাবে কোনো সামাজিক অবস্থা বা যুগচিত্র অবলম্বন করে সাহিত্যের বিচার করা হয়। আমরা সেভাবে নাটকের বিচার করছি না। আমরা নাটকীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই যুগের নারীর অবস্থানকে জানবার চেষ্টা করেছি। কোনো দেশের বা সমাজের নারীর অবস্থানকে লক্ষ করলেই সেই দেশের বা সমাজের অগ্রগতি বা অবস্থানকে জানা যায়। এই জিজ্ঞাসার অনুবর্তী হ'য়েই আমরা 'শত বৎসরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান' অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি।

ইংরেজ আগমনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত একটা শিক্ষিতসমাজ এদেশে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা সমাজের আলোকিত অংশ। তাঁরাই প্রথমে আমাদের সামাজিক জীবনে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য উপলব্ধি করলেন। নানা ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অদ্ভুত সব আচার-আচরণে আমাদের সমাজজীবন আবৃত ছিল। তাঁরাই প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষ করলেন। তারজন্য আমাদের নাট্য প্রয়াসের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণই ছিল প্রধান। কিন্তু পরে আমাদের দেশীয় সমস্যা নিয়ে, সমাজজীবনের চিত্র-চরিত্র নিয়ে নাট্যকাররা নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন।

শতবর্ষ পূর্বে প্রথম বাংলা মৌলিকনাটক রচনা করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁর বিখ্যাত নাটক। নাটক হিসেবে এ নাটকের মধ্যে তৎকালীন সমাজজীবনের একটা বড় সমস্যা বিশেষ ক'রে নারীজীবনে যে করুণ অবস্থা বর্তমান ছিল তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমরা আরও জানতে পারি যে, তখন লক্ষ লক্ষ নারী এক ধরনের সাংসারিক দাসীর জীবন যাপন করত। তাদের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নিত্যকার এক মরিয়া প্রচেষ্টা, নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর সব কিছুতেই ব্যয়-সংকোচের বিনিময়ে তারা পরিবারের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টিত। সেজন্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নাটক এক দিক্‌চিহ্ন (ল্যান্ডমার্ক)।

'কুলীন-কুল-সর্বস্বে'র আগে বাংলা নাটকের ইতিহাসে যে সব নাটকের কথা জানা যায়, যেমন—যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), তারাচরণের

'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) বা হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) এর কোনোটি মৌলিক নাটকের মধ্যে গণ্য হয় না। এগুলো হয় অনুবাদ, না হয় কোনো পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকেই আমরা প্রথম বাঙালির সমাজে নারীর যথার্থ অবস্থানের কথা জানতে পারি। সেইজন্য এই নাটক নিয়েই আমাদের অনুসন্ধান শুরু।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের পর বাংলায় বহু নাটক রচিত হয়েছে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সব নাটকেই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া নারীচরিত্র আছে। নাটক যখন জীবনের দর্পণ তখন নারী ছাড়া কোনো পারিবারিক বা সামাজিকজীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সব নাটক আমাদের আলোচ্য নয়। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধের মধ্যে, একটি মাত্র গবেষণার মধ্যে তা করা সম্ভবও নয়। তাছাড়া নারীচরিত্র মাত্রই আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা সেই সব নাটক নির্বাচন করেছি যার নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানের তারতম্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিগত একশ বছর ধরে সামাজিক বিবর্তনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে-নাটকে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আমরা সেই সব নাটকই নির্বাচন করেছি।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক যখন রচিত হয় তখন বাংলার সমাজজীবনে কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক আন্দোলন দেখা দেয়। আমরা যথাস্থানে তার বিস্তৃত আলোচনা করব। কৌলীন্য-প্রথা, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ নারীজীবনে যে কীরূপ অভিশাপ ছিল, তা বর্তমানে কল্পনাও করা যায় না। যে রাজা রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের জনকরূপে গণ্য এবং যিনি ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ তাঁর পিতা অতি শৈশবে তাঁরও বিবাহ দেন। সেই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে রামমোহনের নয় বৎসর বয়সেই পর পর তাঁর আরো দুটি বিবাহ দেওয়া হয়। রামমোহনের পিতারও তিনজন স্ত্রী ছিলেন এবং রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতার চারজন স্ত্রী ছিলেন। তখন আমাদের দেশে কীরকম অন্ধ-কুসংস্কার এবং কদর্য আচার-বিচার ছিল তার কিছু পরিচয় এখন পাওয়া যায়। একই সঙ্গে স্মরণীয় তখন কলকাতায় ইংরেজের সংস্পর্শে অনেক নব্যবাঙালির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা ধনে-জনে বেশ সম্পন্ন ছিলেন। তখনও "এদেশে কুড়ি টাকায় মানুষ কেনা-বেচা হইত এবং ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর হইবার সময়ে সম্পত্তি-ভুক্ত 'গুলাম'-দলেরও মালিকানা বদলাইত; যে-কালে আঁতুড় ঘরে নব-জাত শিশুকে 'পেঁচোয়' পাইত ও গ্রামে গ্রামে জোয়ান পুরুষদের 'ডাইনী'রা 'যাদু' করিত; যে-যুগে কলিকাতা মহানগরীতে রক্ষিতার পরিচয়ে

'বাবু'দের পরিচয় হইত ও মর্যাদা মিলিত; যে-সময়ে "শক্তি মন্ত্রের উপাসক বামাচারীরা... প্রচুর মদ্য মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গ হিসাবে উপদেশ" করিতেন, "চন্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধনরূপে ব্যাখ্যা" করিতেন, "এবং কদাপি স্বয়ং চক্র মধ্যে ভৈরবী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বররূপে কারণ বলে ও মন্ত্র বলে চক্রিদিগকে অভিভূত" করিতেন, যে-চক্রে "গলিত নরমাংস পর্যন্ত তাহাদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ" পাইত না; যখন বাগবাজারের গাজার আড্ডা হইতে ছিলিম চড়াইয়া খাঁচার মধ্যে বসিয়া ছিলিমের সংখ্যানুক্রমিক পদ-বৃদ্ধি অনুযায়ী বুলবুলি, শালিক অথবা ময়না প্রভৃতির ডাক ডাকিতে ডাকিতে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া 'বাবু'দের বৈঠকখানায় আসিয়া 'কবির লড়াই' জিতিতে পারিলে সাহিত্যিক কালচারের পরাকাষ্ঠা হইত; এবং যে-যুগে কুলীন কন্যাদের বিষ খাওয়াইয়া, কন্যা সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া ও জীবন্ত বিধবা নারীদের ধর্মের নামে জ্বলন্ত চিতাকুন্ডে দড়ি-দড়া বাঁধিয়া হত্যা করা হইত;.....।" (দ্র. রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—যোগানন্দ দাস। পৃ. ১৩-১৪)।

নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এর পরে উল্লেখ করতে হয় বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের কথা। সতীদাহ অবলম্বনে রচিত কোনো নাটকের সন্ধান আমরা পাইনি। কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলনের উপর বহু নাটক পাওয়া যায়। আমরা এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বমূলক উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' আলোচনা করেছি। এই নাটকে পিতার সম্পর্কে তাঁর ছোট মেয়ে সুলোচনা বলেছিল, "নিজে একে একে ছয়টি বিয়ে করেছেন সম্ভবত বর্তমান স্ত্রী মারা গেল পুনরায় আর একটি বিয়ে করবেন।" এরকম পিতার চোখের সামনে এতগুলো বালবিধবা কন্যা, তবুও তাদের বৈধব্যযন্ত্রণা সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতন নন। ঘরের মধ্যে এতগুলো বিধবা থাকলেও বিধবা সম্পর্কে কোনো আলোচনাকে তিনি অসঙ্গত মনে করেন।

এরপর আধুনিক শিক্ষা অবলম্বন করে ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নাটক দুটি আলোচনা করে সেই সময় নারীর অবস্থান দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি মাইকেল এই নাটক দুটিকে প্রহসন বলে অভিহিত করেছেন। সেজন্য এই দুটি নাটকের মধ্যে আমরা

সমাজ-বাস্তবতাকে সেভাবে পাইনা। যেহেতু নাটক বিচার আমাদের আলোচ্য নয়, আমরা কেবল নাটকের চরিত্রের মধ্যে সে যুগের নারীর অবস্থানকে জানতে চেষ্টা করেছি, সেজন্য এ দুটি প্রহসনে একদিকে যেমন নাগরিক শিক্ষিত নব্য যুব-সমাজকে অবলম্বন করে শিক্ষিত পরিবারে নারীর অবস্থান লক্ষ করেছি তেমনি অন্যদিকে এক গ্রামীণ সমাজে ধার্মিক বলে পরিচিত এক প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের ধর্মের নামে ব্যভিচার লক্ষ্য করেছি। এই প্রহসনেই আমরা একটি মুসলমান নারী চরিত্র পেয়েছি। যারা দারিদ্র্যের জন্য ক্ষমতালোভী লম্পটের লাম্পট্যের শিকার হতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে এই সমাজের মধ্যেই নারীর একটা প্রতিবাদী অবস্থান বর্তমান ছিল। এই জমিদার এবং ধনীরা অর্থের জোরে যত খুশি স্ত্রী নামে বা রক্ষিতা নামে নারীদেহ উপভোগ করতে পারত। অন্যদিকে এদের লোভের ফলেই গণিকাবৃত্তির উদ্ভব, যার বিরুদ্ধে এরাই আবার নৈতিক ধিক্কার জানায়। এইসব ক্ষেত্রেও নারী প্রকৃতপক্ষে দাসীর জীবনযাপন করে।

আমাদের দেশ ছিল তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। ইংরেজের ধারাবাহিক শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার এবং লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেও নারীদের কিরূপ অবস্থা ছিল তা আমরা লক্ষ্য করি প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটকে। ইংরেজের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের প্রথম প্রতিবাদ 'সিপাহি বিদ্রোহ' (১৮৫৭) এবং 'নীল বিদ্রোহ' (১৮৬০)। 'নীলদর্পণ' এই বিদ্রোহের প্রথম সার্থক নাটক। বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলনও অব্যাহত ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং 'সধবার একাদশী' নাটকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নারীর অবস্থান জানা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান সুবিদিত। এদের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় অনেক নারী শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকের নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের চিন্তাধারা অতিক্রম করে তাকে একেবারে আধুনিক স্তরে উন্নীত করেছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারী স্বাবলম্বী না হলেও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে তারা অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। যাঁরা প্রাচীন চিন্তা-চেতনায় আস্থাবান তাঁরা এই অগ্রগতি পছন্দ করেন না। অমৃতলাল বসু ছিলেন একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি। তার নাটকগুলি প্রহসনধর্মী হলেও ওই সব নাটকে তিনি আধুনিক যুগের নারীদের যে

ব্যঙ্গ বা কৌতুকচিত্র পরিবেশন করেছেন তার মধ্যেও আমরা তৎকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করি।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে আধুনিক যুগ প্রকট হয়ে উঠেছে। পূর্বে বাঙালি সমাজের ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী পরিবার। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় সেই একান্নবর্তী পরিবার প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে পড়ল। ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য লাভ করল। কিন্তু নারী পুরানো মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়েও এই ব্যক্তিস্বার্থকে সব সময় সমর্থন করতে পারেনি। তার প্রধান উদাহরণ গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক (১৮৮৯)। তাঁর 'বলিদান' নাটক (১৯০৫) সামাজিক পণ-প্রথার এক শোচনীয় পরিণাম। এই নাটকেও আমরা প্রতিবাদী নারীচরিত্রের অবস্থান লক্ষ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে আধুনিক যুগের জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের নারীচরিত্র ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারের প্রভাবে একটু বিশিষ্টতার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাটকে সামাজিক সমস্যার চেয়ে তত্ত্বকথাই প্রধান, নানা রূপকের আবরণে জীবনের এক সত্যদর্শনই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রথমত এবং প্রধানত কাব্যধর্মী। তবু রবীন্দ্র নাটকের মধ্যে আমরা নারীচরিত্রের দায়িত্বশীলতা এবং তাদের অবস্থান কল্পরাজ্যে হলেও সেইসব চরিত্রের মাধুর্য প্রত্যক্ষ করতে পারি।

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) নাটকে রানি সুমিত্রা ও রাজা বিক্রমদেবের কাহিনী তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হলেও এই নাটকের প্রধান নারীচরিত্র জালন্ধরের রাজমহিষী সুমিত্রা। কবি নাট্যকার সুমিত্রা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ও নারীসত্তার দ্বন্দ্ব চিত্রিত করেছেন। সুমিত্রা কর্তব্যপরায়ণ এবং পতিপরায়ণাও। স্বামীকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু তার উর্ধ্বে তিনি রাজমাতা। দাম্পত্যপ্রেম-সুখে বিভোর থেকে প্রজাদের প্রতি কর্তব্যচ্যুত স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাবার মূলে সুমিত্রার মনে একটা বিরোধ ছিল। রানি সুমিত্রা কেবলমাত্র সাধারণ নারীসত্তার মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করে রাখেননি। সুমিত্রা রাজার মতো নিজেকে জৈবিক কামনার গোপন অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখতে পারেননি। প্রজাদের তথা দশের কল্যাণের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীসত্তার এক বৃহত্তর ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন।

কবির 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে একদিকে যেমন সংস্কারাচ্ছন্ন চিরবন্ধ্যা নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্খায় সংস্কারের সমর্থনে স্বয়ং রাজার প্রতিবাদ তেমনই অপরদিকে সামান্য এক ভিখারিনি অপর্ণা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন—রাজার আদেশে চিরায়ত 'বলিপ্রথা' রোধ হল। এখানেও একটি তত্ত্বকথা প্রাধান্য লাভ করলেও এ নাটকের প্রধান অবলম্বন ভিখারিনি অপর্ণা চরিত্রের মধ্যে দিয়েই আমরা তৎকালীন সমাজের অগ্রগতির পরিচয় পাই। 'বিসর্জন' নাটকের মূলকথাই হল সংস্কারের সঙ্গে মানবতার দ্বন্দ্ব। সেখানে সংস্কার নয়, মানবতাই প্রধান। আর এর মুখ্যভূমিকায় পাই নারীকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের যান্ত্রিক-সভ্যতা যে রূপ ও আকার ধারণ করেছিল একটি বিশেষ রূপকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা তুলে ধরেছেন 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে। এই নাটকে আছে 'বলিপ্রথার' বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ ও সত্যাগ্রহের উল্লেখ। যন্ত্র (মেশিন) এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে এবং যন্ত্র দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্র ভেঙেছে অভিজিৎ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ নাটকটিও তত্ত্বপ্রধান। এখানে বাস্তব-সমাজের যথাযথ চিত্র পাওয়া না গেলেও নিচু তলার নারীর দুঃখ, যন্ত্রণা ও বঞ্চনার করুণ চিত্র পাওয়া যায়। এখানে নারী অসহায় হলেও যুগ বদলের সাথে সাথে, 'দুখনী' ও 'ক্ষুদ্র বালিকা'র মনেও ভালো, মন্দ বিচারের চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকটিও তত্ত্বপ্রধান। এই নাটকের মধ্যে আমরা আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার ধনবাদী শোষণের এক মর্মন্তুদ নগ্ন চিত্র পাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাপে গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা গৃহহারা থেকে সর্বহারাতে পরিণত। কৃষক রমণী নন্দিনী—সে এক বিপ্লবী শক্তি। নন্দিনীর উপস্থিতিতে আমরা দেখি যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা বন্ধন ছিন্ন করে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়েছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নারীকে কল্পনার আসনে বসিয়ে কেবল মানব মুক্তির ভবিষ্যতই দেখাননি, ভবিষ্যৎ মানব সমাজেরও এক আনন্দোজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করেছেন—আর তার অগ্রপথিক যে নারী সেটাও আমাদের অনুভবের সীমার মধ্যে এনে দিয়েছেন।

'রক্তকরবী'র নন্দিনীর অভিযান যেন বাস্তব মাটির স্পর্শে রূপলাভ করল 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাটিকায়। তৎকালে গোটা দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের ঈর্ষাপ্রণোদিত অস্থিরতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ঘটনাবলিতে ছিল উত্তাল। কবির কাম্য সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সকলের সমান অধিকার, অর্থাৎ সকলের যথোচিত সম্মান। 'রথের রশি' নাটিকার মধ্য দিয়ে অচল রথ অবশেষে শূদ্রদের দড়ি টানার ফলে রথের চাকা এগিয়ে চলে। সমাজের অবহেলিত মানুষদের স্বীকৃতি এবং তাদের

উদ্যোগেই সমাজের রথ এগিয়ে চলে। পুরুষ-শাসিত সমাজের আচার নারীদের দুর্বল করে রাখলেও অচল রথ সচল না হলে অকল্যাণ হবে এই আশঙ্কায় তারা পথে নামে রথ সচল করতে এবং রথ ও রশির পূজা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বাধুনিক সামাজিক নাটক 'বাঁশরি' (১৯৩৩)। এই নাটকে আমরা আধুনিক নাগরিক সমাজের উচ্চ শিক্ষা সম্বলিত স্বাবলম্বী অতি আধুনিকা নারীকে প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলিতে আমরা একদিকে কৃষক-নারী, সংস্কারাচ্ছন্ন-নারী, আবার অন্যান্য দিকে সকল সংস্কারমুক্ত মুক্তির ধ্বজাবাহী নারীকেও প্রত্যক্ষ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের যখন তিরোধান হয় তখন বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে বন্যা, মহামারী, মন্বন্তর। এই সময়ে বাংলা নাটক পেশাদারি মঞ্চ অতিক্রম করে জনজীবনের অংশভাগী হয়ে উঠেছে। এই সময়কার প্রধান নাটক 'নবান্ন' (১৯৪৪)। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের চাপে যে-সমাজ ভেঙে গিয়েছিল সেই সমাজকে নারীরাই নতুন করে গড়ে তুলল। এই নাটকে নারীর অবস্থান খুবই সমাজ-সচেতন। এই ধারায় পরবর্তীকালে এল স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা—প্রতিবাদ প্রতিরোধ। তখন আমরা পাই দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩) এবং মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' (১৯৫৪)।

স্বাধীনতা, দেশভাগের আগে যে কুৎসিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল এবং যাকে ভিত্তি করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হল তাতে বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী সব মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেল। ঘরের নারীরা ধর্ষিতা হল। মান ও ইজ্জতের ভয়ে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অজানা, অচেনার উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়তে হল। বাস্তুহারা এই মানুষগুলোই উদ্বাস্তু। বাঙালি জীবনে সে এক ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক দুর্গতির ইতিহাস। কিন্তু জীবনের ধর্মই হল জয় করে এগিয়ে যাওয়া। পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু কলোনিগুলির মধ্যে আমরা নারী-পুরুষের সেই কঠোর কঠিন সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করি। এই সব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হল যুদ্ধশেষে কলকারখানায় লক্‌আউট, ছাঁটাই—শ্রমিকেরা যা সহজে মেনে নিতে পারেনি। দেখা দিল চারদিকে ধর্মঘট। এই সব কাজে নারীও অংশ নেয়। অবস্থার বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে এই দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও এই চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে। দেখা গেছে নারী এখন আর পূর্বের মত পরাধীন বা সংস্কারে আবদ্ধ নয়। জাত-

পাতের গণ্ডি অতিক্রম করে নারীরাও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। '**ধর্মঘট**' নাটকে নারীর এই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাবলম্বনের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতএব 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের নারী চরিত্র এবং 'ধর্মঘট' নাটকে নারী চরিত্রের মধ্যে যেমন শত বৎসরের ব্যবধান তেমনিই নারীর সামাজিক অবস্থানে, চিন্তা ও চেতনায় বিস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে। নারী ক্রমশ অর্থনৈতিক ও সমাজিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে আমরা নারীর অবস্থানে লক্ষ করেছি নারীর অসহায় অবস্থা, চোখের জলে আত্ম-নিগ্রহ বা আত্মহননের প্রচেষ্টা। ধীরে ধীরে শিক্ষা প্রসার ও নানা সংস্কার আন্দোলনের পর এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারীর মানসিকতায় যে পরিবর্তন ঘটেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের নাটকে তার প্রতিফলন বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই অনুসন্ধান কার্যটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে আমরা আমাদের আলোচনাকে বিন্যাস করেছি। **প্রথম অধ্যায়ে** আছে বাংলা সামাজিক মৌলিক নাটক। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঃ

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) **'বিধবা বিবাহ'** (১৮৫৬), **'একেই কি বলে সভ্যতা'** (১৮৬০), **'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'** (১৮৬০), **'নীলদর্পণ'** (১৮৬০), এবং **'সধবার একাদশী'** (১৮৬৬)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রাক-বঙ্গভঙ্গ ও বাংলা নাটক। এখানে আছে ঃ

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), **'বিবাহ-বিভ্রাট'** (১৮৮৭), **'প্রফুল্ল'** (১৮৮৯), **'রাজা ও রাণী'** (১৮৮৯), **'বিসর্জন'** (১৮৯০), এবং **'বাবু'** (১৮৯৩)।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আধুনিক সমাজজীবন ও বাংলা নাটক। এই আলোচনায় গৃহীত নাটকগুলি হল ঃ

'বলিদান' (১৯০৫), **'খাসদখল'** (১৯১২), **'মুক্তধারা'** (১৯২২), **'রক্তকরবী'** (১৯২৬), **'কালের যাত্রা'** (১৯৩২), এবং **'বাঁশরি'** (১৯৩৩)।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা নাটক। এই সময়কার আলোড়নকারী সামাজিক নাটক **'নবান্ন'**-এর মধ্যে নারীর অবস্থান।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ঃ

'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), **'নতুন ইহুদী'** (১৯৫৩), **'ছেঁড়াতার'** (১৯৫৩), এবং **'ধর্মঘট'** (১৯৫৪) প্রভৃতি নাটকে নারীর অবস্থান।

পরিশেষে আছে **উপসংহার**।

রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক থেকে আরম্ভ করে মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' নাটক পর্যন্ত একশত বৎসর সময়কালের প্রতিনিধি স্থানীয় ২৩ খানা ছোট বড় নাটকে আমরা নারীর যে অবস্থান লক্ষ করেছি তাতে দেখা যায় শত বছরের নাটকে নারীর অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নারী এখনও সমাজব্যবস্থার শিকার হলেও শিক্ষা-দীক্ষায়, সমাজ-সচেতনতায়, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে নারীর অবস্থানের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা নাটকের মধ্যে দিয়েই আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ করেছি। নাটক যে সমাজ-দর্পণ এ কথা যে কত সত্য সেটা আমাদের এই বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট অনুভূত হয়। এ কথা সত্য, সব ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে নাটকের নারীচরিত্র চিত্রণে বা তার অবস্থান বর্ণনায় কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেটা নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা চেতনার সীমাবদ্ধতা। আমরা বৃহদাকার আলোচনার সময়ে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

তবে একথা স্পষ্ট, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে নারীর অবস্থানের যে পরিবর্তন হয়েছে নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি সামাজিক চিত্র এবং চরিত্রই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে, সাহিত্যের চিত্র চরিত্র অবলম্বনে সামাজিক ইতিহাস লিখিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান। আমরা চেষ্টা করেছি নাটকীয় চিত্র চরিত্র বিশেষ করে নারীর বিভিন্নরূপের অর্থাৎ জননী, জায়া, পরিচারিকা, সঙ্গিনী হিসাবে নারীজীবনের একটি সামাজিক আলেখ্য ও অবস্থান তুলে ধরতে। এখানেই এই গবেষণার স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকতা।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সামাজিক মৌলিক নাটকের প্রাথমিক পর্যায়

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'

নাটক জীবনের দর্পণ। দর্শক নাটকের মধ্য দিয়ে মঞ্চে সমসাময়িক জীবন-সমস্যা, জীবন-যন্ত্রণা এবং সমকালীন সমাজ-পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করতেই ভালোবাসে। যে জীবনে যত সমস্যা আছে, সংঘাত আছে সে জীবন দর্শককে তত আলোড়িত করে। বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই নাটকে সমাজ জীবনের তৎকালীন মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল কৌলীন্য-প্রথা। এ নাটকে প্রথম নারীজীবনের এক মর্মন্তুদ অবস্থা, চোখের জলে আত্মনিগ্রহ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তৎকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৌলীন্য-প্রথার ভীষণ পরিণাম উপলক্ষে যে নাটক লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন তার নাম 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই নাটক রচনার একটা প্রেক্ষাপট আছে। দেশে ইংরেজ আগমনের ফলে এবং ইংরাজি-শিক্ষা বিস্তারের প্রভাবে আমাদের দেশে যে শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি হয় তাঁরা আমাদের সমাজের অনেক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য উদ্যোগী হন। এই আন্দোলন শুরু করেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়। তিনি আমাদের দেশের বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের জনক। তাঁর চিন্তা-ভাবনার উৎস অবশ্য পাশ্চাত্য দেশ। সেখানে তখন শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রামমোহনের যখন কুড়ি বছর বয়স তখন ফরাসি বিপ্লবের উচ্চ ঘোষণা সূচিত হয়েছে। বাস্তিল দুর্গ পতনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় বহু ধ্যান-ধারণারও অবসান ঘটেছে। সেই সময় টমাস পেইন নামে এক ভদ্রলোক তাঁর 'এইজ অব রিজ্‌ন' লিখে সারা পৃথিবীতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। আলেকজান্ডার ডাফ্ লিখেছেন, "কেবলমাত্র একটা জাহাজে এক হাজার 'এইজ অব রিজ্‌ন' কলকাতা এসে পৌঁছেছিল। প্রথম দিকে প্রতিটি বই এক টাকা করে বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু বই-এর চাহিদা এতই বেশি ছিল যে, দেখতে দেখতে এর দাম অনেক বেড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই পেইনের সব লেখার একটা সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হল।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশেও তখন যুক্তিবাদের বেশ সাড়া পড়েছিল। শিক্ষিত মানুষ কেবল বিশ্বাসের উপরে নির্ভর না করে সব কিছুকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে শুরু করেছিল। এই বিচারের ফলেই আমরা ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করি বাংলাদেশে তখন একটা সমাজ সংস্কার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' সেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই এক বিশেষ দর্পণ। এই নাটকে তিনি কৌলিন্যপ্রথার বিষময় পরিণামের একটা মর্মন্তুদ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রকাশকাল ১৮৫৪। এই নাটকের মূল অবলম্বন এক সচ্ছল ব্রাহ্মণ কুলপালকের পরিবার। তাঁর চারটি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স বত্রিশ (৩২) এবং সর্বকনিষ্ঠার বয়স আট (৮)। প্রথম মেয়েটির বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত, দ্বিতীয় মেয়েটির ছাব্বিশ (২৬) এবং তৃতীয়টির ১৫ বছর। তৎকালীন যুগের হিসাবে প্রথম দুইটির বয়স বিয়ের বয়সকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই তাদের বিয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সেজন্য সমাজে তিনি বিশেষভাবে নিন্দিত হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তিনি এক ঘটকের সাহায্যে বহুবিবাহিত কুৎসিত, কদাকার, অন্ধ, বধির, আকাট মূর্খ এক বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর চারটি মেয়েকে একসঙ্গে কুল রক্ষার্থে বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

রামনারায়ণ এই নাটকের বিজ্ঞাপনের ভূমিকায় নাটক রচনার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গ-স্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম।" তাঁরই অভিলাষ কার্যত "রংপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ" মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে বাস্তবায়িত হল। কালীচন্দ্র বাবু তাঁর বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন, "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় 'কুলীনকামিনীগণের' এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে তদ্বিষয়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করে রচনাকারদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দেখাতে পারবেন তাঁকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দেবেন। রামনারায়ণ সে বিজ্ঞাপন দেখে এই নাটক রচনা করেছিলেন এবং উক্ত ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন।

এই নাটকের ছয়টি ভাগ। প্রথমে,—কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার কন্যার

একত্রে বিবাহ অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়—ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব, তৃতীয়—কুলকামিনীদের আচার-ব্যবহার, চতুর্থ—শুক্রবিক্রয়ীদের দোষোদঘাটন, পঞ্চম—নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেশন, এবং ষষ্ঠ—বিবাহ নির্বাহ। আসলে কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাদের কৌলীন্যপ্রথা অনুযায়ী বিবাহ নামক প্রহসন এই নাটকের মুখ্য অবলম্বন হলেও প্রধান বিষয় হচ্ছে বল্লালীয় কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গ দেশে যে দুরবস্থা ঘটেছে তারই ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ। এই নাটকের নান্দীমুখ থেকে ছয়টি অঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা নামে যে প্রতারণা এবং ব্যভিচার চলছিল তারই এক মর্মান্তিক বর্ণনা আছে। বন্দ্যোঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান প্রধান কুলীন কুলপালকের কন্যাদের জন্য নানা চেষ্টা করেও তিনি সমযোগ্য পাত্র জোটাতে পারেননি। কুলপালক নিজেই বলেছেন, "তাঁর সংসার রাজসংসার। কোনো কিছুর অনটন নেই।" তবুও দৈব বিড়ম্বনায় কন্যাভারগ্রস্ত হয়ে তিনি চিন্তানিমীলিত নয়নে বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করেন। এর চেয়ে দুঃখের কী আছে। সেই সময় এই কৌলীন্য রক্ষার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিতেন। এরকম নিষ্ঠুর প্রথার কথা এখন কল্পনাও করা যায় না। যাই হোক, যথাসময় কন্যাদের বিবাহ দিতে না পারার জন্য তাঁর ভীষণ দুশ্চিন্তা। দেশীয়দিগের দ্বেষে এবং ব্রাহ্মণীর আদেশে পাত্রের সন্ধানে দুই ঘটককে দেশে দেশে পাঠিয়েছেন। এই ঘটকদের চরিত্র অপূর্ব। তাঁরা নানা সত্য মিথ্যার কারবারি। এক ঘটক নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমি সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্ত্ত-কন্যা চালায়েছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয়-কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব-কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তীর সন্তানে পদ্মরাজদুহিতা ঘটায়েছি; আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আঁতুর এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ।" এক চক্রবর্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর জুটিয়ে দিয়ে মার-ধরও খেয়েছেন। এহেন ঘটকের জুটিয়ে দেওয়া কুৎসিত, কদাকার, সারা গায়ে দাদ, বসন্তের দাগে বীভৎস মুখ, কানা, কালা, পলিতকেশ ষাট বছরের বৃদ্ধ এক আকাট মূর্খ কুলীন পাত্রের সঙ্গে কুলপালকের চার মেয়ের বিবাহ স্থির করেছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই বিবাহ আসলে একটা প্রহসন। কুলীন কুমারীদের দুঃখ-ক্লেশের কথা এঁরা চিন্তা করেন না। তাঁরা বলেন, কুলীন কুমারী তো সর্বদাই বৈধব্যবেদনা সহ্য করে। আর কুলীন কন্যার বিবাহের জন্য কোনো উত্তম দিনের আবশ্যক নেই। কারণ এই বিবাহে ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত নেই।

যেনতেনপ্রকারেণ একটি বিবাহ হলেই হল। একজন ঘটক নিজেই বলেছে, "একি আপদ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, ...অতএব কপটতা প্রকাশপূর্বক গ্রহাচার্য কে প্রতারিত করি।" সেই সময় একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল। যেমন, বল্লাল বলে, "কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বে নাই।"
কামিনী নামক একটি নারীচরিত্র আক্ষেপ করে বলে,

"যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
একে ত অবলা বালা তাহে কুলনারী।।
বিফলে বিফলে যায় যৌবন বহিয়ে।
কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে।।"

এরূপ অবস্থায় সব নারী যে নিজেকে সংযত করে রাখত তা নয়। রসিকা নাম্নী একটি নারীর কথা এই নাটকে আছে। তার বাড়ি বংশীপুরে। তার 'ঘেরা-ঘোরা' দুটি ঘর। সে নবীন যুবতী। তার স্বামী মারা গিয়েছে। তবু তার কোনো দুঃখ নেই। সে বলে,

"জাতিতে নাপিত বটে, আছে নানা গুণ ঘটে
আলতা কামান মোর কর্ম্ম।
করি নাই কোন পুণ্য তথাপি পাতক শূন্য
অতিথি না ফেরে এই ধর্ম্ম।
তৃষিত পথিক গণ এসে করে আকিঞ্চন
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।।"

তার একটিমাত্র সমস্যা, সেটি হল, পেট চালানোর দায়। তার অন্য কোনো আর্থিক উপায় নেই। তাই তার যৌবনই একমাত্র অবলম্বন। কুলীন কন্যার বিপরীতে এই নারীচরিত্র উল্লেখযোগ্য। তার নামটিও সুন্দর—'রসিকা'। তার মাধ্যমে নারীচরিত্রের সমস্যা এবং স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। তার ভালোবাসার লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সবাই আছে।

এই নাটকে আরও অনেক নারীচরিত্র আছে—মোহিনী, কামিনী, যমুনা, হেমলতা, চপলা, চঞ্চলা, সুলোচনা, ভামিনী, চন্দ্রমুখী, মাধবী, মহিলা, বিজয়া, যশোদা, ফুলকুমারী, সুমতি ইত্যাদি। এদের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন নারীর অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। চপলা দুঃখের সঙ্গে বিবাহের বরের পরিচয় দেয়—

"আহা মরি আই আই সখী একি শুনতে পাই
বর নাকি বায়াত্তুরে বুড়ো।
কপাল নিতান্ত পোড়া কোথা হতে এল মড়া
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো।।

তার উত্তরে সুলোচনা জানায়,

"........................... এ বর তোর মাথার মণি
মোর পতি দেখে বুক ফাটে
বয়স্ খতালে পর নাতি ভেবে আসে জ্বর।
কোল শোভা হয়ে রাত কাটে।।
এ পতি মাথার চুড়া বুড়ো তো রসের গুঁড়া
কাছে থাকে তবু শোভা হয়।
সে যে অতি শিশু ছেলে কেঁদে ওঠে ভয় পেলে
শান্ত করে রাখি তবে রয়।।"

এমনি করে নারীরা পরস্পরের পতির বর্ণনা করে। চন্দ্রমুখী বলে, নিজের দুঃখ লোকের কাছে প্রকাশ করতে পারলে কিছু হালকা হওয়া যায়। তার স্বামীর বহুবিবাহ। সে বিয়ে করে চলে গেছে—আর আসেনি। তার আশায় আশায় দিন কাটে। যমুনা বলে,

"আছে কাট শেষের উপায়।"

তার এক এক সময় মনে হয়, কুলে কালি লেপে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক শিব দুর্গা পূজা করেও তার কোনো বর জোটেনি। শিবপূজায় তাই সে বলে, "নুড়ো দি মুখে বল্লালের।" হেমলতারও একই অবস্থা। তার বিশ বছর বয়স হল কিন্তু তার বিয়ের প্রসঙ্গ নেই। তার ইচ্ছা হয় বিষ খেয়ে মরে যাবে অথবা কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে বল্লালি ধার শোধ করবে।

যশোদা বলে, সকলের কথা শুনে তার দুঃখে বুক ফাটে। বলে, "তোরা খাস ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।" সে বলে, তার কথা শুনলে সকলের দুঃখ দূর হবে। যশোদারা ছিল সাত বোন। সকলের একই দিনে বিয়ে হয় গেল এক ঘাটের মড়ার সঙ্গে। বিয়ের পরেই সে বর পঞ্চত্ব লাভ করে। বিয়ের আসরে পতির চরম গতি করে তাদের আর দুর্গতির শেষ রইল না।

ফুলকুমারীর দুঃখ আরও নির্মম। এই কৌলীন্যপ্রথার জ্বালায় সে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ষোড়শী ফুলকুমারী একদিন ঘাটে কাপড় কাচতে গিয়ে খবর পেল তার

স্বামী এসেছে। সে ভাবল তার মনে যত সাধ আছে সব সে পূর্ণ করে নেবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু তার সব কল্পনা, যৌবনদক্ষিণা দেবার সাধ সব ব্যর্থ হয়ে গেল। জামাই বাড়ি আসতেই সকলে শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে বসতে দিল। কিন্তু সে বলল, "ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবে এখানে।" দুঃখিনী জননী খাড়ু বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এল। কিন্তু দক্ষিণা কম হল বলে তার মন উঠল না। খাওয়ার সময় সে নানা দুর্ব্যবহার করে; কিছু খায়, কিছু ফেলে। ফুলকুমারী রাত্রে কপট নিদ্রার ভান করে শুয়ে আছে। এমন সময় সেই পাষণ্ড চামার এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বলল,

"শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।"

ফুলকুমারী "কত স্তব বিনয় করিয়া" তাকে অনুরোধ করতে লাগল। তারপর তার যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল সব এনে দিল। কিন্তু তাতে সেই অর্থগৃধ্নু র মন ওঠে না। আরও দাও বলে তাকে চাপ দিতে থাকে। অবশেষে রাগ করে সে শ্বশুরের টোলের বারান্দায় গিয়ে চাটায়ের উপর শুয়ে পড়ল এবং ভোরের আলো ফুটতেই চলে গেল। বেচারি ফুলকুমারী—

"একাকিনী বিরহিণী যামিণী জাগিয়া।
নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।"

বুকফাটা যন্ত্রণায় এমনি করে কুলকামিনীদের দিন কাটে। যশোদা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে,—

"হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল তো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধম্ম নেই? কম্ম নেই? আহা! আহা! কি দুঃখু কি দুঃখু..............!"

সত্যি ফুলকুমারীর দুঃখ ভাবা যায় না। তার স্বামী থেকেও নেই। অন্যদের তো স্বামী মরে সম্পর্ক চুকে গেছে—তাদের যন্ত্রণা অন্য যন্ত্রণা। ঘরে ঘরে এই তো ছিল তখনকার অবস্থা।

এসব কথাই উঠেছে কুলপালকের মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে। তিনি এতদিন সমযোগ্য কুলীন বর পাননি, আর কুলভঙ্গ হবার ভয়ে কন্যাদের বিবাহও দিতে পারেননি।

এই নাটকের ধর্ম চরিত্র বলে, "কুচযুগল মুকুলিত না হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি; কিন্তু যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে

গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হ্রদে কীটভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবে, —এই শাস্ত্র; কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুলগৌরব-সৌরভ-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কত শত পাতক না স্বীকার করিয়াছে?"
অবশ্য দক্ষিণা পেলে তাঁর অভিমত সিদ্ধ হয়। অতএব কুলীন ব্রাহ্মণের একটাই মোক্ষম গুণ তা হল অর্থলোভ। এই অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশ পরিণয়ে আবদ্ধ হলেও তার কোনো আলস্য নেই। এই নাটকের অধর্ম ঠিক কথাই বলেছে, "বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি। তাতে কি আলিস্যি আছে?" এটাই ছিল তখনকার অবস্থা। তাঁরা কুলীনের ছেলে। অনেকগুলো বিয়ে। সর্বত্র তো যাওয়া হয় না। অনেক সময় কোনো অঘটন ঘটলে লোকনিন্দার ভয়ে মেয়েদের বাড়ি থেকে এসে জামাইকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তারাও ঝোপ বুঝে কোপ মারে। ধর্মচরিত্র ঠিক কথাই বলে। "পূর্বে কুলীন শব্দে নয়গুণ (বিদ্যা, বিনয়, আচার, নিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান) বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইত। এক্ষণে আর তা নাই। কুকার্যে যে লীন তাকেই বলে কুলীন।" এই কুলীনেরা অনেক লেখা-পড়া জানত না এবং তখন এই কৌলীন্যের নামে অনেক ব্যভিচার হত।
অধর্ম বলল, সে নকুলপুর থেকে চিঠি পেয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে তার কন্যার অন্নপ্রাশন, সেজন্য তার সম্বন্ধী তাকে সেখানে যেতে লিখেছে, কিন্তু আশ্চর্য, সে তিন বছর সেখানে যায়নি; অথচ মেয়েটি হল। তা একজনে বলল, কুলীনের ছেলেদের এরকম হয়। আর একজন বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের দোহিত্র উত্তম মুখোপাধ্যায়। হঠাৎ পথে উত্তম মুখোপাধ্যায় বিবাহবণিককে প্রণাম করে বলল, সে তারই ছেলে। উত্তম যখন বলল, সে জন্মাবধি পিতৃদর্শন পায়নি। সে এখন কুড়ি বছরের ছেলে। তার উত্তরে বিবাহ বণিক বলেছিল, "তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখনও দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হোক।" এখানেই ঘটনার শেষ নয়। উত্তম তার পরে বলল, "মহাশয়! আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম, সে সংবাদ মিথ্যা, কিন্তু তাহাতেই আমার মাতা ঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন।" স্বামী কখনও স্ত্রীর বৈধব্য দশা দেখতে পায় না। কিন্তু তৎকালীন সমাজে তাও সম্ভব ছিল।
এছাড়াও নারীর কপালে ছিল শ্বশুর বাড়ির বিশেষ করে শাশুড়ি-বাঘিনি এবং

ননদিনির-নগিনির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা।

গর্ভবতী বলে,

"প্রতিবাসী যদি আসি কয় মোরে মিষ্টভাষী
অমনি সে সর্বনাশী প্রকাশিতে ছাড়ে না।
শাশুড়ী তা শুনতে পেলে ভূতছাড়া করে গেলে
দিতে এসে নুড়ো জ্বেলে বিবেচনা করে না।
পেলে অপরাধ তিল তালের সমান কীল
বুকে পিঠে লাগে খিল নাহি থাকে চেতনা।
ভাতারের মুখে ছাই তাহার মরণ নাই
তাহলে নিকূলে যাই ঘুচে সব যাতনা।।
মরি সদা মনস্তাপে কি দেখে দিয়েছে বাপে
খাকু তাকে কাল সাপে যে করেছে ঘটনা।"

অতএব শুধু কৌলীন্যপ্রথা নয় নারীর অবস্থা যে সংসারেও খুব করুণ ছিল আমরা এখানে তার পরিচয় পাই। আবার দেখা যায়, সংসারে কন্যাসন্তানই কাম্য হয়ে উঠেছে। গর্ভবতীর চারটি ছেলে; একটাও মেয়ে হয়নি। সেজন্য তার স্বামী সব সময় তাকে গঞ্জনা দেয়, বলে, "এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।" এবার যদি মেয়ে না হয়, তাহলে দূর করে দেবে বলে তাকে ভয় দেখিয়েছি। গর্ভবতী ধর্মের কাছে এসেছে স্বস্ত্যয়ন করতে। এর আসল কারণও গর্ভবতীর কথা থেকে জানা যায়। সে বলে, "আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাশুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরও এখনও দুটো আছে।" আর তার একটাও মেয়ে নেই। তাই তার দুর্দশা। শাস্ত্রে কন্যা বিক্রয়ে নরক গমনের কথা থাকলেও লৌকিক আচারে তখন কন্যা বিক্রয় করলে প্রভূত আয় করা যেত। তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ধর্ম বলেছে, কোনো ব্যক্তি রুগ্ন-ভুগ্ন, অন্ধ-বধির হয়েও ধন গৌরবে কোনো স্বরূপা কামিনীকে বিবাহ করে? আবার চরিত্রবান যুবকও নির্ধনতায় বিবাহ করতে অসমর্থ হচ্ছে। তবে এইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনাও দেখা দিয়েছে। রাজ্যে মনুষ্য বিক্রয় নিয়ম বিরুদ্ধ; এই হিসাবে কন্যা বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তাকে ভরণপোষণ করতে হবে এই নিয়ম প্রবর্তিত হলে বিবাহ-বাণিজ্য বন্ধ হতে পারে। ধর্মমতে ক্রয় করে বিবাহ করলেও বিবাহ সিদ্ধ নয়। ক্রীত বিবাহিতা স্ত্রী দাসীতুল্য, পত্নী নয়। আর তার পুত্র দাস-পুত্র বলে শাস্ত্রে খ্যাত আছে। আবার

বিক্রীত কন্যার পুত্র সকল ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। তাকে চণ্ডালতুল্য বলা আছে। রাজা যদি ক্রয় করে বিবাহ্ করেন সেই স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না। আর ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করে বিবাহ্ করে সে স্ত্রীর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না। এইসব নিয়ম থাকলেও কেউই সে নিয়ম পালন করে না। অতএব 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে তৎকালীন বল্লালি কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এই কৌলীন্যপ্রথার মূল বলি নারী হলেও তৎকালীন নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজ সংসারের নারীর যে কী অবস্থান তাও দেখতে পাই—সেটাই রামনারায়ণ তর্করত্ন এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের শেষে কুলপালকের মেয়ে শাম্ভবী যথার্থই প্রশ্ন তুলেছে, "এমন বে কি না দিলেও হয় না!" এবং তার বোন কামিনী বলেছে, "সেই বল্লালে বেটাই যত নষ্টের গোড়া।"

শাম্ভবী কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হয়নি। সে তার বাবাকে দোষী মনে করেছে। তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্য বরে তাদের বিবাহ্ দেন নি এমন সব উক্তির মধ্যে আমরা একদিকে যেমন দেখি তৎকালীন সমাজজীবনে নারীর অবস্থান, তেমনই অন্যদিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এই শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ, সমালোচনা এবং প্রতিবাদ।

আমরা দেখেছি রামনারায়ণ তর্করত্ন রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের বিজ্ঞাপনের সূত্রেই তার চিন্তাকে নাট্যরূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর এই চিন্তার মূলে আছে তৎকালীন সমাজচিন্তারই প্রতিফলন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারের দিকে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের দৈন্য প্রকটভাবে ধরা পড়ে। অন্ধ আচারের এবং অমানবিক নিষ্ঠুরতায় আমাদের সমাজ ক্রমশ অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়ে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সমাজজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নানা সংস্কার আন্দোলন দেখা যায়।

অবশ্য ভারতের সংস্কার আন্দোলনের প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করেছিলেন উইলিয়াম জোনস্, হেনরি কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা। তাঁরাও প্রাচীন শাস্ত্রের আলোকে এদেশীয় নানা ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বহু অসঙ্গতি ও অমানবিক আচারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামমোহন রায় এই পথেই তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। সেজন্য তাঁকেই আন্দোলনের জনক বলা হয়। তিনি এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পশ্চাদ্‌মুখী দৃষ্টি না দিয়ে সমাজ ও দেশকে নতুনযুগের উপযোগী করে তুলবার চেষ্টা করেন। এই কাজে তিনি

নতুন যুগের উপযোগী করে প্রাচীন শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ নতুন করে ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের শোচনীয়তা দূর করার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন। (দ্র. লর্ড আমহার্স্টকে ১১ ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে লেখা চিঠি—The English Works of Raja Ram Mohun Roy.)।

স্বাভাবিক ভাবেই উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাংলাদেশের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। "পাশ্চাত্যের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র শ্রেণীর, বিশেষত কলকারখানার শ্রমজীবী মানুষের দুরবস্থা মোচন করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীমুক্তি। বঙ্গদেশে সেকালে কোনো শিল্প বিপ্লব হয়নি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনীয় শ্রমজীবী বা প্রলেটারিয়েট এদেশে তখনও সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এদেশের সমাজ সংস্কারগণের লক্ষ্য হয় প্রধানত নারীমুক্তি। কারণ সেকালে এদেশের নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কেবল যে তাদের সামাজিক স্ট্যাটাসই ছিল অতীব নিম্নমানের তাই নয়, নানা ধর্মীয় আচারের নামে তাদের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার।" (সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটব — গোলাম মুরশিদ, পৃ. ২-৩)।

সেই সময় নারীজীবনের সব চেয়ে বর্বর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার ছিল 'সতীদাহ'। সতী হবার সংস্কার বা কুসংস্কার বহুদিন থেকে চলে আসলেও এই দুঃসহ ও নিষ্ঠুর প্রথাটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মিশনারি পাদরিগণ। ১৭৭২ সালে যে বছর রামমোহনের জন্ম সে বছরেই সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বিদেশির হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। "ঐ বছরেই দক্ষিণ ভারতের ত্রি-পল্লিতে ক্যাপ্টেন টমিন মৃত স্বামীর চিতা আরোহণে উদ্যত জনৈকা বিধবাকে উদ্ধার করে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।......ঐ বিদেশির হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে এক ক্রুদ্ধ জনতা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছিল।" (উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা—অজয়চন্দ্র সরকার। পৃ. ৪৪)।

এই তথ্য জানা যায়, এস. ডি. কলেটের রামমোহনের জীবনীগ্রন্থ থেকে। ঐ গ্রন্থেই জানা যায়—১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড কর্ণওয়ালিশকে লেখা একটি পত্রে 'সতীদাহে'র মতো এই বর্বর ঘটনার নিবারণ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এ প্রথা যে কী নিষ্ঠুর ছিল তা জানা যায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনায়। তখন লর্ড আমহার্স্ট-এর আমল। লেডি আমহার্স্ট-এর ডায়েরিতে ঘটনাটির বর্ণনা রয়েছে। কলেরায় এক যুবকের মৃত্যু

হবার পর তার স্ত্রী সহমরণে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সহমরণে যাবার জন্য যা করণীয় ও আচরণীয় সবই সে পালন করেছিল কিন্তু চিতায় যখন আগুন ধরানো হল, তখন বিধবা নারীটি ভীত হয়ে নিকটের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সে পালিয়েছে বুঝতে পারার পর—

"The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and showd off to the middle of the stream, when they forced her violently over board and she sank to rise no more." (দ্র. ড. অজয় চন্দ্র সরকারের 'উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা।' পৃ. ৫১)।

বেচারি সেদিন জলে ডুবে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার জ্বালা জুড়িয়েছিল। রামমোহনের বৌদি অলকমঞ্জরীর সহমরণের কথা সুবিদিত। এই সব কারণে রামমোহনই প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছিলেন এবং বেন্টিক-এর রাজত্বকালে এই সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও 'সতীদাহ-নিবারণ আইন' (১৮২৯) পাশ হয়েছিল।

এই আন্দোলনের সূচনাকাল ১৮১৫। এই বছর থেকে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সে সময়ে হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্যরা, যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত, তাঁরাও পাশ্চাত্য মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করায় জাতিভেদ প্রথা, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই সতীদাহপ্রথার সঙ্গে কৌলীন্যপ্রথার এবং বহুবিবাহের গভীর সম্পর্ক ছিল। কুলীন মেয়েরা বিবাহের পরেও সাধারণত পিতৃগৃহেই অবস্থান করত। তারপর বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটা সামাজিক দায়ভার দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু মৃত পতির যদি কোনো বিষয় সম্পত্তি থাকে তাহলে তার উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য রক্ষণশীল সমাজ সতীদাহ বিষয়ে অধিক উৎসাহী ছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন করলেও রামমোহন বা তাঁর 'আত্মীয় সভা'র সদস্যরা তাঁদের আলাপ আলোচনায় দেশের মানুষকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। "রামমোহন তাঁর গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহ বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন বহুবিবাহ বিরোধী মনোভাব গঠনে তারও গুরুত্ব অনেক।" (তদেব, পৃ. ৭০)।

সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়

বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৫০-এর দশকের শুরুতেই বিধবাবিবাহ আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। কৌলীন্যপ্রথা এবং নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনচিত্তে সচেতনতা দেখা দেয়। এই দশকেই যে সংস্কৃত কলেজ শিক্ষিত রক্ষণশীল কুলীন পরিবারের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণ ছাত্রদের কাছে অবারিত করে দেন। ব্রাহ্মণ সন্তান রামতনু লাহিড়ী সেই সময়ে উপবীত ত্যাগ করে জাতিভেদ অস্বীকার করেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়। প্রায় একই সময়ে হিন্দু কলেজের দ্বারও সকল ধর্মালম্বীদের জন্য উন্মুক্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্মের নামে ঐতিহ্যিক হিন্দু মূল্যবোধের ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। এই সময়েই বিজ্ঞাপন দিয়ে রংপুরের একজন গ্রাম্য জমিদার নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই সময়েই কলকাতার একজন ধনী শূদ্র নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের ৫০-এর দশকে সমাজ সংস্কারের এক প্রবল ঝড় নাগরিক হিন্দু সমাজকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এক পত্র প্রেরক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে গভর্মেন্টের কাছে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র গিয়েছিল। বহুবিবাহ ছিল সতীদাহের মত সমাজজীবনে একটা অভিশাপ। "বহু বিবাহ সমাজে নৈতিক শিথিলতা এনেছিল; এনেছিল আরও অনেক সমস্যা। কৌলীন্যের নাম ভাঙ্গিয়ে বহু বিবাহ করার ফলে কুলীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে তখন বিবাহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সব বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে সে সময়ের মানুষ রীতিমত চিন্তিত হয়েই উঠেছিল। এবং তার আশু সমাধানের পথ সন্ধান করেছিল। আর এই ভাবেই ধীরে ধীরে সংগঠিত (organised) আন্দোলনের পথও প্রস্তুত হয়েছিল।" (দ্র. তদেব পৃ. - ৭১৯)।

এই বহুবিবাহের বিরোধিতার ভূমিকা নিয়েছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। সামাজিক নানা বিষয়ে উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৫৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'। এই সমিতির পক্ষ থেকেই বহুবিবাহের

বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র পাঠান হয়। অবশ্য এর বিপক্ষেও অনেকে ছিলেন। এক দল মনে করত বহুবিবাহের প্রয়োজন আছে এবং তা শাস্ত্রসম্মত। অপর দল মনে করত ঐ বিবাহ অশাস্ত্রীয়; তার বিলোপই বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই বহুবিবাহ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকা প্রকাশিত করেন (আগস্ট, ১৮৭১, এপ্রিল ১৮৭৩)। এই পুস্তিকা নিয়েও নানা বিতর্ক হয়।

সেই সময়ে এই সংস্কার আন্দোলন নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক হলেও নাটকেই বোধ হয় সবচেয়ে এই সমস্যা ব্যাপক এবং সরাসরি ভাবেই ব্যক্ত হয়। এই সব নাটকও রচিত হয়েছিল সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'কন্যাপণ কী ভয়ানক' (১৮৬১ সাল), গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ হওয়া একি দায়, গঞ্জনাতে প্রাণ যায়' (১২৬৮), বটুবিহারী চক্রবর্তীর 'কলির কুলটা বা অদ্ভুত কাণ্ড' (১২৮৩) প্রভৃতি নাটকে নাট্যকারের কাহিনী পরিচালনায়, চরিত্র রূপায়ণে, পরিণতি অঙ্কনে সংস্কারের পক্ষেই মত প্রকাশিত হয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকও এই সমাজ সংস্কার প্রয়াসের ফল। সেজন্য এ নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বল্লালীয় কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার সুর শোনা যায়।

বল্লাল সেন সম্ভবত কৌলীন্যকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন। (দ্র. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু। পৃ. ১৩৪-৩৫)। কুলীনরা সমান মর্যাদার অংশীদার হতেন। কিন্তু কালক্রমে এই কৌলীন্য ব্যক্তিগত গুণের স্বীকৃতি না হয়ে পারিবারিক মর্যাদায় পরিণত হয় এবং কন্যা গ্রহণই যেন কৌলীন্যের একমাত্র মানদন্ড হয়ে দাঁড়ায়। (দ্র. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। পৃ. ৭১-৭২)।

স্থির হয় কুলীনেরাই কেবল কুলীন পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বিষয়ে আদান-প্রদান করতে পারবেন। গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ এবং গৌণকুলীনকে কন্যাদান উভয়েই কুলনাশক বলে বিবেচিত হয়। এভাবেই কুলীন শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিবারের বিবাহ করার ধারণা একীভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায় নির্দিষ্ট প্রজন্মের বিশেষ গাঁই ও গোত্রের কয়েকটি কন্যার জন্য বিধিমত নির্দিষ্ট বর কেবল একজনই আছেন। এমন অবস্থায় কৌলীন্য-মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ পাত্রের একাধিক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ত। এভাবে কৌলীন্যের সঙ্গে বহুবিবাহ যুক্ত হয়ে পড়ে। বহুবিবাহের এই রীতি দুষ্টক্ষতের

মতো ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষত নারীর জীবনে এর ফলে একদিকে যেমন দুঃখ-দুর্দশার সূচনা হয়,. অন্যদিকে নানা সামাজিক ব্যাধি ও ব্যভিচার দেখা যায়। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে এই ব্যাধি ও ব্যভিচারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কন্যা গ্রহণই যাদের একমাত্র বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, তারা কালে কালে বিদ্যাশূন্য, বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে। অনেক অকুলীন হীন অবস্থায় পতিত কুলীনপাত্রদের মোটা অর্থ দিয়ে ব্যাপকভাবে কিনতে আরম্ভ করল। আবার বিশেষ বিশেষ কুলীনও জাগতিক লাভের আশায় নিজেদের বংশ-মর্যাদা ত্যাগ করে অকুলীন কন্যাদের গ্রহণ করতে শুরু করে। কৌলীন্যের নিয়ম ভঙ্গকারীরা পরে অকুলীন বলে গণ্য হয়। এই ভঙ্গকুলীন পাত্ররাও কুল ভাঙার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এবং দারিদ্র্য মোচনের জন্য যতদূর সম্ভব বেশি অর্থের বিনিময়ে যথাসাধ্য বেশি সংখ্যক বিবাহ করতে আরম্ভ করল। এইভাবে বিবাহটা কুলীনের কাছে একটা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণীয় হয়।

ফলে বিবাহের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক থাকে তা এই কৌলীন্যপ্রথার মধ্যে আশা করা ছিল অসম্ভব। এই কুলীনেরা বিয়ে করার সময় এককালীন পণ এবং পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে অর্থলাভের আশাতে বিবাহ করত। কুল-মর্যাদা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ না করে এঁরা শ্বশুর বাড়িতে উপবেশন, স্নান ও আহার কিছুই করতেন না। এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতেন না। (দ্র. অবোধবন্ধু, ভাদ্র ১২৭৬)।

"দীর্ঘদিন পরে কুলীন জামাতা বেড়াতে এলে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাই তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। প্রথমে কুল-মর্যাদা স্বরূপ কিছু টাকা জামাতার হাতে তুলে দেওয়া হত। অর্থের পরিমাণ দেখে জামাতা কখনও খুশি হতেন, কখনও হতেন না। রাত্রে শোবার আগে জামাতা স্ত্রীর কাছে অর্থ চাইতেন। সমকালীন একজন মহিলার রচনা থেকে জানা যায়—'কুলীন স্ত্রীরা বছরের পর বছর চরকাকাটার টাকা জমা করে রাখত স্বামীর মন পাবার প্রত্যাশায়।' তবু অর্থের পরিমাণ দৃষ্টে স্বামীরা সাধারণত খুশি হতে পারতেন না।" (দ্র. গোলাম মুরশিদ—সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, পৃ.-৯৪)।

কুলীন স্বামী তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে কেবল যে ঘর করতেন না তা নয়, তাদের কারো কারো সঙ্গে বছরের পর বছর দেখাও করতেন না এবং আদৌ তাদের মানুষ বা

আত্মীয় বলে মনে করতেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিবাহ যখন জীবিকার উপায় বলে গণ্য হয় তখন ব্যবসায়ীর মতো সকল বিবেক বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে অন্যায় করাই সম্ভব। তখন যা সম্ভব হত এখন তা কল্পনাই করা যায় না। এখন কী আমরা ভাবতে পারি—"একটি বালক তার চেয়ে বয়সে বড় তিন সহোদরকে বিয়ে করে।" (দ্র. বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৩, পৃ. - ৯৯)। এই কন্যা তিনটির পিতার নাম ছিল গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স তখন আঠাশ (২৮) বছর। অন্য আর একটি বালক একই সঙ্গে তিনটি সহোদরা এবং তাদের এক পিসিকে বিয়ে করে। ফুলিয়া বেলঘরিয়ার এই বালক-বর এই বিয়ে চারটি করার জন্য ৬০০ টাকা পণ গ্রহণ করে। (দ্র. বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৬০-৬৯)।

আবার বহু-বিবাহিত কুলীন এক ঘাটের মড়া (মৃত্যুর) মাত্র সাতদিন আগে একটি বিয়ে করে। —এ ঘটনাটি বরানগরের। (দ্র. ঐ- কার্তিক ১২৭২, পৃ.-১৩৮)। হান্টারের মতে ১৮৭০-এর দশকে একজন কুলীন তাঁর প্রথম বিয়ের জন্য কন্যাপক্ষের কাছ থেকে দুশো পাউন্ড অর্থাৎ দুহাজার টাকা পর্যন্ত পেতেন। কিন্তু পণের পরিমাণ বিয়ের সংখ্যার সঙ্গে বিসমানানুপাতিক ভাবে কমে আসত। (দ্র. A Statistical Accounts of Bengal - Vol. 55)। শেষদিকে এই অর্থের পরিমাণ এত কমে আসত যে, তা দিয়ে হয়তো কেবল একটি বারোয়ারি পুজোর চাঁদা দেওয়া যেত। (দ্র.বহুবিবাহ....., পৃ. ৩৯৫)।

বিয়ের বাজার দর ক' পুরুষের ভঙ্গকুলীন তার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। বিক্রমপুর অঞ্চলের এক কুলীনের কথা উল্লেখ করে হান্টার সাহেব লিখেছেন, তিনি ১৮৭১ সালে জীবিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা তখন শতাধিক। অপরপক্ষে, তাঁর তিন পুত্র তখন পর্যন্ত যথাক্রমে পঞ্চাশ, পঁয়ত্রিশ ও ত্রিশটি করে বিয়ে করতে পেরেছিলেন। (দ্র. A Statistical Accounts of Bengal - Vol. 55)।

অর্থলোভে যে কুলীন কুলক্ষয় করতেন, যারা বেশি সংখ্যায় বিয়ে করার ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন, অকুলীন এবং ভঙ্গ-কুলীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরাও এঁদের সন্ধানে থাকতেন। ফলে বহুবিবাহের ব্যবসা খুবই স্ফূর্তি লাভ করেছিল উনিশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। (দ্র. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক— গোলাম মুরশিদ, পৃ. - ৯৫)

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ং বেঙ্গলদের 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায়' বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটি তালিকা এবং ১৮৭১ সালে প্রকাশিত বহুবিবাহ গ্রন্থে

বিদ্যাসাগরও এমন দুটি তালিকা প্রকাশ করেন। আর একটি তালিকার কথাও জানা যায়—১৮৬৮ সালে প্রকাশিত অন্য আর একটি প্রবন্ধ থেকে। (দ্র. K. M. Banerjee-Kulin Polygamy, P. 145)।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নিকটে বালিতে মারা যান এমন একজন কুলীনের কথা জানা যায়, যাঁর মৃত্যুতে একশ স্ত্রী বিধবা হন। (দ্র. সমাচার দর্পণ, ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯, পৃ. - ২৫৪)।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিয়ের কথা উল্লেখ করছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শুনেছেন এক ব্যক্তি ১৮০টি বিয়ে করেছিলেন। (দ্র. K. M. Banerjee-The Kulin Brahmins of Bengal, P.-22)।

উল্লিখিত প্রমাণাদি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এদেশে এক শ্রেণির কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ করার রেওয়াজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তৎকালে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কন্যা ঋতুমতী হওয়ার আগেই অর্থাৎ নবছর বয়সে বিবাহ হলে অভিভাবকের অনেক পুণ্য হয়। কিন্তু মনু বয়সের কথা উল্লেখ না করলেও ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে কন্যার বিবাহ দান শ্রেয় বলে নির্দেশ দিয়েছেন। (দ্র. S. Bandyopadhyay - Foreign Accounts of Marriage in Ancient India.PP. 23-33)।

পরাশর সংহিতায় বয়সের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—''আট বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে 'গৌরীদান', নবছর বয়সে দিলে 'রোহিনী দান' এবং দশ বছরে বিবাহ দিলে কন্যা দানের পুণ্য হয়। (দ্র. মনুসংহিতা ৯/৪, ৯/৮৮, ৯/৯৩, পৃ.—৫১৯-২০)।

বরের বাজারে ভঙ্গকুলীনদের এত বেশি চাহিদা ছিল যে, দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে এদের জামাতা হিসাবে লাভ করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু দেশাচার অনুসারে কুলীন ও ভঙ্গকুলীনদের কন্যা কুলীনদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল অবশ্য পালনীয়। মেলবন্ধনের রীতিকেও এরা অনেকেই ভাল মনে করতেন না। কিন্তু দেশাচার কাটিয়ে ওঠার সাহসও এদের ছিল না। ফলে এরা অনেক ক্ষেত্রে কন্যাকে অপাত্রে দান করতে বাধ্য হতেন। এই সামাজিক রীতি পালন করতে গিয়েই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেশাচার অনুযায়ী অভিভাবকেরা অকুলীন পাত্রে কন্যাদের বিবাহ দিতে পারতেন না। আবার সমকক্ষ কিংবা উচ্চতর বংশীয় কেউ চড়া পণ ছাড়া বিবাহও করে না। এদিকে কন্যাকে সারাজীবন

অবিবাহিতা রাখাও গুরুতর পাপ। ফলে কন্যার অভিভাবকগণ নিজেদের রীতিমত বিপন্ন বোধ করতেন এবং তাঁদের কাছে একটি পন্থাই শুধু অবশিষ্ট থাকত, তা হল অনেক বিবাহ করলেও কোনো কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁরা একাধিক কন্যাদেরও বিবাহ দিয়ে নিজের কুল, মান রক্ষা করার চেষ্টা করা। এই বর বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী হলেও কোনো আপত্তি ছিল না। অন্য দিকে হয়তো মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনও কন্যার পাণিগ্রহণ করে জীবনের শেষ পুণ্যকর্ম পালন করতেন। (দ্র. K. M. Banerjee 'The Kulin Brahmin of Bengal', P. 16; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ভাদ্র, ১৭৬৭ শকাব্দ (আগস্ট ১৮৪৫), পৃ. - ২০৫)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজে বর জোগাড় করতে বহু সাধ্যসাধনা এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া ভার ছিল। কুলীনদের বহুবিবাহ করার ফলে অকুলীন পাত্রদের জন্য কন্যার অভাব ঘটে। এই পরিস্থিতিকেই অকুলীন কোনো কোনো কন্যাদাতা লাভজনকভাবে নিজেদের কাজে লাগাতেন। এরা অর্থ ব্যয় করে কুলীনদের কাছে নিজেদের কন্যা বিয়ে না দিয়ে বরং উল্টে অর্থ গ্রহণ করে অকুলীনদের কাছে নিজেদের কন্যাদান করতে আরম্ভ করেন। বহুবিবাহের প্রাদুর্ভাব বশত কন্যার অভাব যত তীব্র হয়ে ওঠে, চাহিদা ও সরবরাহের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কন্যাপণও তত চড়তে থাকে। ফলে আর্থিক প্রলোভন বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের বহু পরিবারকেই কন্যা-বিক্রয়ী পরিবারে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে, কুলীনদের বহুবিবাহের মতোই কন্যাবিক্রয় প্রথা অকুলীনদের ব্যবসায় ও জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গণ্য হতে থাকে। (দ্র. মহাত্মা রাজা রামমোহনের জীবন চরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এ উদ্ধৃত, পৃ.-৩০৫)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই প্রথা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্ভবত কুলরীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত এই প্রথা তাদের স্ব স্ব এলাকায় নিষিদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং নাটোরের জমিদার রানি ভবানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত উনিশ শতকে এই প্রথার প্রার্দুভাব ঘটে। তার ফলে স্বামী থাকা সত্ত্বেও এরা সাধারণ বিধবার মত জীবন যাপন করত, অন্যদিকে অধিক বয়সী কুলীন কন্যার সঙ্গে শিশু বা বালকেরও বিবাহ হত; এবং এই জন্য অনেক কুলীন স্ত্রী মনদুঃখে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হত। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থে এই কুলীন বিবাহ নিয়ে নানা সংবাদ প্রকাশিত হত। এই জাতীয় বিবাহের বহু সংবাদ বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এইসব কারণে সমাজে যথেষ্ট ব্যভিচারও ঘটত। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের থাকমণির ঘটনা বহু পরিচিত। তার স্বামী কালেভদ্রে তার কাছে আসত। কিন্তু বয়স বাড়ার পরে একটি পাড়ার যুবকের সঙ্গে থাকমণির ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে ১৭৬৬-তে 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা'য় প্রকাশিত কলকাতার এক বারবনিতার চিঠিও উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম; শৈশবকাল বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের আরম্ভ হইলে, তথাপি পিতা-মাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না; ইহাতে একদিন আমি প্রতিবেশিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম যে, তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রমকালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, পরন্তু যখন আমার ষোড়শ বর্ষ বয়স, কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক একজন মনুষ্য আমাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচয় গ্রহণদ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এবম্প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল যে, আমি আর লোক-সমাজে মিশ্রিত হইবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাঁর কুৎসিৎ আকৃতি গলিত অঙ্গ এবং পক্বকেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানত তাঁহাকে বরণ করি নাই। কদাপি তাঁহার সহিত মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই। অথচ তিনি আমার পতি। আমার সুখের মূলাধার। কী আশ্চর্য তাঁর মূর্ত্তি যেমন কুৎসিৎ, রজনীতে তাঁর ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যা হোক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকট কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপূর্বক যে প্রস্থান করিলেন সেই পর্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোদ্যম তাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সংগঠন হওয়াতে যেরূপ যাতনাবোধ হইল বিশেষত জীবনের সুখ যে পতি-সম্ভোগ তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্থির হইল, তাহা কী বলিব। মাসাবধি দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্বক মেছোবাজার বাসিন্দা হইয়াছি।

আমি এস্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বামীর সহিত অনৈক্য ও বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আমার

বাল্যকালের বিংশতিজন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা আমার ন্যায় কলকাতার স্থানে স্থানে অধিবাস করিতেছেন।" (দ্র. শরৎ সাহিত্যে সমাজ চেতনা—ড. সরোজমোহন মিত্র, পৃ.-৫)।

ভুক্তভোগীর এই মর্মব্যথায় আমরা এতদিন পরেও প্রচন্ড বিচলিত বোধ করি। কিন্তু মনে হয় সেকালে এই সব ব্যভিচারকে সমাজ কলঙ্কজনক মনে করলেও তা নিবারণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে অবৈধ গর্ভসঞ্চার হলেও কুলীনদের মধ্যে সেটা কোনো বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিত না। গ্রামের এক শ্রেণির মহিলাদের দ্বারা ভ্রূণহত্যা বা গর্ভপাত ঘটানোর ব্যবস্থা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এমন কি গর্ভবতীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও জানা যায় কিংবা অর্থের বিনিময়ে জামাতা এসে এই অবৈধ গর্ভকে নিজের বলে স্বীকার করে নিতেন।

কৌলীন্যপ্রথার এই মর্মান্তিক অবস্থা তখনকার কুলপতিরা সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় তা থেকে ক্রমে ক্রমে এই ভয়ঙ্কর প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই আন্দোলন সংগঠিত হয়।

উনিশ শতকের বিশ-ত্রিশের দশকে শিক্ষা ও আত্মসচেতনতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ সম্পর্কে অল্পাকারে হলেও সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দেয়। বিধবাদের সহমরণ কুলীন বিবাহের সমস্যা এবং বালবিধবাদের সামাজিক যন্ত্রণা রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুসারী বন্ধুদের ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৮১৯ সালের 'আত্মীয় সভা'র এক বৈঠকে এই সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তার প্রমাণও পাওয়া যায় রামমোহনের গ্রন্থাবলিতে। কিন্তু তিনি সতীদাহ এবং অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, কুলীনদের এই বহুবিবাহ নিয়ে তিনি বেশি মনোযোগ বা সময় দিতে পারেননি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন যখন সতীদাহ বিরোধী আইনের বিপক্ষীয়দের মামলার বিরুদ্ধে নিজেই সওয়াল করতে বিলেত যাত্রা করেন তখন থেকে কুলীনদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন নানা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। এই ব্যাপারে 'ইয়ংবেঙ্গল'দের অবদানও অনেক। প্রাচীনপন্থীরা অবশ্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং অন্যান্য পত্রিকার মাধ্যমে এই বহুবিবাহের সপক্ষে প্রচার করলেও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা, 'বিদ্যাদর্শন', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর',

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, 'সংবাদ ভাস্কর' প্রভৃতি পত্রিকায় এবং 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সাধারণ পত্রিকা এই কৌলীন্য-ব্যবস্থা এবং বহুবিবাহের অনিষ্টকর বহুদিক সম্পর্কে আলোচনামুখর হয়ে ওঠে। অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে অবলম্বন করে অক্ষয়কুমার দত্ত বছরের পর বছর ধরে সমাজ সংশোধনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৮৪৪ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৫০-এ এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম নেতা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু কেবল আলোচনার দ্বারা এই সমাজের অচলায়তনকে নাড়া দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তাঁরা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের আবশ্যকতাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। এই ব্যাপারে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র স্থাপিত 'সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সভা'র সদস্যবৃন্দ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর সরকারের কাছে যে আবেদন করেন তাতে প্রায় সহস্রটি স্বাক্ষর ছিল। রক্ষণশীলেরা অবশ্য নিশ্চুপ ছিলেন না। তাঁরাও এদের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদনপত্র প্রেরণ করেন এবং নানা ভাবে সংস্কারকদের প্রতিকূলতা করতে শুরু করেন। ব্রাহ্ম যুবকেরাও এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ঢাকায় 'বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়েছিল। পরে এই সভার সভ্যগণই 'মহাপাতক বাল্যবিবাহ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সব কাজ করতে গিয়ে তাঁদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, "এক একটি বিধবা বা কুলীন কন্যাদিগকে উদ্ধার করতে গিয়া যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে লাগিলেন। একটি কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কলকাতায় প্রেরণ করাতে একজন যুবক, ঐ কন্যার অভিভাবকগণের প্রেরিত গুণ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। তথাপি তাঁহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না।.......

"আর একটি পলায়িতা ও আশ্রয়ার্থিনী কুলটা কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ বিচারপতির বিচারে ঐ কন্যার অভিভাবকতার ভার তাহার মাতার হস্ত হইতে

লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল।" (দ্র. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃ. ২৭৮)।

১৮৫৭ সালে 'ব্যবস্থাপক সভার' অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য জে. পি. গ্রান্ট রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতায় 'বহুবিবাহ নিরোধক কমিটি' খসড়া বিলও তৈরি করেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের জন্য এই আইন তখন পাশ করানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তৎকালীন গভর্নর সিসিল বিডনের কাছে কুড়ি হাজার আটশ একচল্লিশ জনের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পাঠানো হয়। তখন বাংলাদেশের প্রায় সব প্রভাবশালী ব্যক্তি এই আবেদন-পত্র সমর্থন করেছিলেন। পরে বঙ্গদেশে সরকার যে সাত জনের কমিটি তৈরি করেন তাঁরা কুলীনদের বহুবিবাহকে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যচরণ ঘোষাল বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু অন্যরা ভিন্ন মত পোষণ করায় শেষ পর্যন্ত তখন বহুবিবাহ নিরোধক আইন পাশ করানো সম্ভব হয়নি। আসলে সিপাহি বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ইংরেজ সরকার হয়তো ভারতের সমাজের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাননি।

যাই-ই হোক, এই কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে, এবং আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণের কারণেও, এই কৌলীন্যপ্রথা-বিরোধী মনোভাবই ক্রমশ কার্যকর হয়ে পড়েছিল। ১৮৭১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা লেখার সময় লক্ষ করেছিলেন ইংরেজি বিদ্যার চর্চার ফলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুবিবাহ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। এমনি করে দেখা যায় ১৮৭০-এর পূর্বেই কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৮৭১ সালে 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁদের কন্যাদের বিবাহ দেবেন বলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কুলীন বহুবিবাহের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেলেও একেবারে লুপ্ত হয়নি।

কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ-প্রথা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হলেও তার বিরুদ্ধে যে সচেতন এবং সোচ্চার শিক্ষিত মানুষের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তারই এক অনিবার্য প্রকাশ 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক। এর বিষয়বস্তু এবং এর প্রকাশভঙ্গি সবই

সংগ্রহ করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন তৎকালীন বাস্তব অবস্থা থেকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু বিস্তারে আমরা যে আলোচনা করেছি সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার সবই সত্য বলে প্রমাণিত। রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে রামনারায়ণ সফলতার সঙ্গে যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে এই নাটক কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে এক বড় প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকে যে জীবন্ত সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে তাতে রামনারায়ণ তর্করত্নের গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য এই নাটক তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর ছ-বছরের মধ্যেই 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক তিনবার মুদ্রিত হয় এবং কলকাতা ও বাইরে বহুবার অভিনীত হয়। অবশ্য রক্ষণশীলরা এই নাটক বা তার অভিনয়কে সমর্থন তো করেনই নি বরং প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা নাট্যকার রামনারায়ণের উপর মারমুখী হন এবং তাঁদের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত এই নাটকটি আর অভিনীত হতে পারেনি। (দ্র. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৪৬)।

রামনারায়ণ এই নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টই বলেছেন, বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় যে দুরবস্থা ঘটেছে তাকে তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে তাকে সফল এবং সার্থক করে তুলেছেন। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র—কুলপালক, কুলপালকের কন্যাগণ, ঘটক, পুরোহিত, ধর্ম, অধর্ম, কুলাচার্য, বিবাহ বণিক, বিবাহ প্রত্যক্ষকারী নানা নর-নারীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে, এমন কি নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলের মাধ্যমে সেই যুগের একটা বাস্তবচিত্র এবং চরিত্র জীবন্ত করে তুলেছেন। আমরা তৎকালীন সমাজচিত্রের মধ্যে এই কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ প্রথার যে ভয়ঙ্কর চিত্র ও চরিত্র লক্ষ করেছি রামনারায়ণ অত্যন্ত সততার সঙ্গে তাকে তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসম-বিবাহ, সমাজের ব্যভিচার, শাস্ত্র ও নারীদের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া সবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমরা সমাজ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে যখন নাটকের বিষয় ও চরিত্র পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই তৎকালে সমাজে নারীর কী দুরবস্থা ছিল। তারা এক কথায় সমাজের এবং শাস্ত্রীয় আচারের যূপকাষ্ঠের 'বলি' হিসাবে গণ্য হত। তাদের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। মতামত প্রকাশের

কোনো মূল্য ছিল না এবং এই সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জন্য বাধ্য হয়ে বা উপায়ান্তর না দেখে নানা ব্যভিচারের সঙ্গেও তারা জড়িত হয়ে পড়েছিল। অতএব সামাজিক বিচারে এবং তৎকালীন ইতিহাসপ্রেক্ষিতে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান বা অবলম্বন।

এই কথার সত্যতা আরও দেখা যাবে যে, এই নাটকের পরপরই কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহ নিয়ে বহু নাটকের প্রকাশ। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'কুলীন কন্যা ও কমলিনী' নাটক, রামনারায়ণের 'নবনাটক', তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী' নাটক, কস্মিন হিন্দু মহিলার 'বল্লালখাত' নাটক, বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'হিন্দু মহিলা' নাটক, মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটক প্রভৃতি বহু নাটকের যে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তার মূলেও আছে এই ভয়াবহ কুলীনদের বহুবিবাহের চিত্র।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল নারীর বিবিধ সমস্যা। যেমন— সতীদাহ, কুলীনবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি। তার প্রতি সংস্কার আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান দৃষ্টি যে পড়েছিল তারই প্রথম নিদর্শন 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সম্পর্কে সমকালীন স্ত্রী-পুরুষের মনোভাব কেমন ছিল, সমাজে মহিলাদের কী অবস্থান ছিল, সমাজে কুলীনস্ত্রীগণ বিবাহিত জীবনের সহস্র বিড়ম্বনার চেয়ে বৈধব্যকেও কেন শ্রেয়তর জ্ঞান করত, এইসব নানা ব্যাপারে এই নাটকের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এই নাটকের মধ্য দিয়েই নারীসমাজ প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। সমাজের অর্ধেক অংশ এই স্ত্রীজাতিকে অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ রেখে কোনো সমাজ অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। কুলপালকের স্ত্রী ব্রাহ্মণীও বহুবিবাহের ব্যবসা এবং কুলীনকন্যাদের ব্যাভিচার সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সমাজের যারা কুলপতি তারা এই সমস্যার প্রতি একেবারে উদাসীন। এই অব্যবস্থার পরিবর্তন যে একান্ত প্রয়োজন সে কথাও এই নাটকে প্রথম আলোচিত হয়েছে।

বিধবা-বিবাহ

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশে নারীর কী নির্মম অবস্থান ছিল আমরা তা লক্ষ করেছি। ঐ প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবেই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ফলে সমাজের মধ্যে যে দুর্নীতি ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার বিরুদ্ধে বহু বিষয়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল সেকথা আমরা উল্লেখ করেছি। ঐ আন্দোলনের ক্রমপরিণতিতেই ব্যাপকভাবে দেখা দেয় বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন। কৌলীন্যপ্রথার অনিবার্য পরিণামে যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ তার থেকে মুক্তি বা নারীর জীবনের একটা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলে অনিবার্য ভাবেই বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ আসে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকার উল্লেখ করেছি। এই পুস্তিকা রচনা করতেও বিদ্যাসাগর প্রথমে বাল্যবিবাহের দোষ এবং বিধবাবিবাহের অনিবার্য আবশ্যকতার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার প্রেক্ষিতেও অছে একটি ব্যাপক সমাজসংস্কার আন্দোলন। সে কথা আলোচনা করার পূর্বে আমরা এই বিষয়ে নাটকের কথাই প্রথম আলোচনা করব।

কারণ আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি সেযুগে নাটকের মধ্যেই তৎকালীন যুগসমস্যাকে গভীরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকের মধ্যেই আমরা তৎকালের নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তৎকালে বহু নাটক রচিত হয়েছিল। আমরা কেবল একটিমাত্র নাটককে প্রতিনিধি স্থানীয় হিসাবে গণ্য করে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের কথা আলোচনা করেছি। তেমনই এই পর্বেও বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বহু নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল আমরা এখানে তার একটিমাত্র নাটক—উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' অবলম্বনে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকটি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্যদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই নাটকের অবলম্বন রক্ষণশীল এক কুলীন কায়স্থ কীর্তিরাম ঘোষের পরিবার। তিনি তিনটি বিধবা কন্যার পিতা এবং এক বিধবা পুত্রবধূর শ্বশুর। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ

হওয়ার পর ইতিমধ্যেই দু-একটা বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে বিপক্ষদের বিরোধিতায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনও প্রকট হয়ে উঠেছে। তৎকালে তথা সর্বকালে পুরুষের স্ত্রীর মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাঁকা জায়গা পূরণ হয়ে যায়। তাতে কোনো দোষ নেই। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের স্বামী মারা গেলে তারা বিধবা হয় এবং বৈধব্যযন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তাদের ছকে বাঁধা শেষ পরিণতি ঘটে। তিল তিল করে তাদের কামনা বাসনার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। কীর্তিরাম বাবু এক এক স্ত্রীর মৃত্যুতে বিবাহের পর বিবাহ করে সংসার জীবন সুখে নির্বাহ করছেন। পিতার সম্পর্কে ছোট মেয়ে সুলোচনার উক্তি থেকে জানা যায়, —"নিজে একে একে ছটি বিয়ে করেছেন; সম্ভবত বর্তমান স্ত্রী মারা গেলে পুনরায় আর একটি বিয়ে করবেন।" এ হেন পিতার চোখের সামনে এতগুলো বালবিধবা, তবুও তাদের বৈধব্যযন্ত্রণা সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন নন। বিধবাবিবাহ বিষয় নিয়ে আলোচনায় সমাজ আজ মুখর; কিন্তু কীর্তিরাম বাবু বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী। তিনি মনে প্রাণে রক্ষণশীল। তার স্ত্রী পদ্মাবতীও স্বামীকেই অনুসরণ করেন। তিনিও রক্ষণশীলা। তিনি একদিন বিধবাবিবাহ বিষয় নিয়ে রসিকতাচ্ছলে স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে কীর্তিরাম বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে সাবধান করে দেন। কারণ কন্যারা বিধবা হয়ে অবধি তার আশ্রিতা। ঘরের মধ্যে যাদের এতগুলো বিধবা সেখানে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা তিনি অসঙ্গত বলে মনে করেন। বস্তুতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী এঁরা উভয়েই বিধবাবিবাহের বিপক্ষে। তারা কেউই বিধবাদের বিবাহ শ্রেয়তর বলে মনে করেন না। বরং মনে করেন, বিধবাদের পুনরায় বিবাহের চেয়ে ব্যভিচার শ্রেয়। কিন্তু বিধবারা সুখদুঃখ সম্পন্ন রক্তমাংসে গড়া মানুষ; সুতরাং তাঁর যুবতী বিধবা কন্যারা এবং পুত্রবধূও বিধবাবিবাহের কথায় ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। সমাজের প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে আর সকলে আত্মসংযম করলেও সর্বকনিষ্ঠা সুলোচনা নানা সূত্রে বিধবাবিবাহের সংবাদে আত্মহারা হয়। পাশের বাড়ির রামকান্ত বোসের সুন্দর যুবক ছেলে মন্মথর প্রতি সুলোচনার আসক্তি জন্মে।

এ গাঁয়ের নাপিতানি রসবতীর কামানোর ব্যবসা। কীর্তিরাম ঘোষের বাড়ির মতো রামকান্ত বোসের অন্তঃপুরেও রসবতীর অবাধ যাতায়াত। সে মন্মথকে জানে। কাজেই তার মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে পরিচয় সম্ভব হয়। রসবতীর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সেও বিধবা নারী। তাই বালবিধবা সুলোচনার যৌবন-যন্ত্রণা সে বোঝে। সুলোচনার প্রতি তার করুণার উদ্রেক হয়।

রসবতীর সহযোগিতায় সুলোচনা ও মন্মথর প্রেমের উৎকর্ষ বাড়ে এবং মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মিলন ঘটতে থাকে। ফলে প্রকৃতির নিয়মে যথাসময়ে সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হয়।

তৎকালে গ্রাম-গাঁয়ে চিকিৎসকের অভাবে অন্তঃপুরে গ্রহাচার্যদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কীর্তিরামের ষষ্ঠতম স্ত্রী পদ্মাবতী সদ্যঃপ্রসূতা। তাঁর পেটের পীড়ার কারণে গ্রহশান্তি করানোর নিমিত্ত অনুরোধপূর্বক কীর্তিরাম গ্রহাচার্যকে তাঁর অন্তঃপুর নিয়ে আসেন। তিনি যে কেবলমাত্র কুগ্রহের শান্তি বিধান করেন তা নয়—গর্ভ পরীক্ষাতেও তিনি দক্ষ। সন্তান পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি খনার বচন আওড়ান—"বানের পৃষ্ঠে দিয়ে বান, পেটের ছেলে টেনে আন।" গ্রহাচার্যের গণনায় পদ্মাবতী প্রমাদ গণলেন। এমন সময়ে সুলোচনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে গ্রহাচার্যের সামনে নিজের হাত মেলে দিয়ে করকোষ্ঠী বিচার করতে বলল। গ্রহাচার্য গণনা করে বললেন, মেয়েটি সবদিক থেকে সুলক্ষণা কিন্তু কুলক্ষণের মধ্যে একটিমাত্র সন্তান হবে, তাও শেষ রক্ষা হবে না।

পদ্মাবতী ভয় পেয়ে বললেন, "সেকি গো ঠাকুর, কি বল্লেন, সন্তান কী?"

গ্রহাচার্য আরও জানালেন, "সুলোচনার ফাঁড়া আছে।"

তৎকালে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের বাইরে বেরোনোর রেওয়াজ ছিল না। তাছাড়া যুবতী বিধবা কন্যাদের প্রতি পদ্মাবতীর সতর্ক দৃষ্টি থাকায় গ্রহাচার্যকে বললেন, "পোড়া কপাল আর কি! যেমন কাল পড়েছে তেমনি গণকও হয়েছে।"

অগত্যা এরপর গ্রহাচার্য বিদায় নিলেন।

পদ্মাবতী মা হয়েও বিধবা মেয়েদের অন্তর্জ্বালা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই তিনি গ্রহাচার্যের নির্ভুল গণনা কলঙ্কের ভয়ে বড় গলায় উড়িয়ে দিয়ে পরিত্রাণের পথ পেতে চাইলেন। কিন্তু সুলোচনা বালবিধবা হলেও আজ সে রক্তমাংসে গড়া যুবতী। তার জীবনের সাধ আহ্লাদ সে বিসর্জন দিতে চায় না। দেশের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাকেও দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। পিতামাতার অগোচরে সাহসের সঙ্গে সে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে।

গ্রামে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যা প্রসন্নর পুনরায় বিবাহ স্থির হয়েছে। এই বিবাহ নিয়ে গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা চলে। প্রকৃতপক্ষে, বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষ দল অপেক্ষা বিপক্ষ দলের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃহত্তর সমাজে অনেক বেশি প্রবল ছিল। তাই বিপক্ষদল বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার না করায় সামাজিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে সামাজিক

দণ্ডের ভয়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই বিধবাবিবাহে পৌরোহিত্য করতে সাহস করেন না। দারিদ্র্যবশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজ মেরুদণ্ডহীন। তাই দেখা যায় একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃত অর্থলোভে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করতে সম্মত হয়। সুতরাং এখানে বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো বাধা থাকেনি।

সুলোচনা রসবতীর সহায়তায় মাতাপিতার অজ্ঞাতে বান্ধবীর বিয়ে দেখতে এল। রসবতী জানে অদ্বৈত দত্ত মন্মথর মামা। বিয়ে বাড়িতে মন্মথ আসবেই। এই সূত্রে রসবতী সুলোচনা ও মন্মথ উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের একটা সুযোগ অবশ্যই করিয়ে দিতে পারবে। তাই সুলোচনা সাহসে বলীয়ান হয়ে বিয়ে বাড়িতে আসে।

বিয়ে বাড়িতে স্ত্রী-আচারের উদ্‌যোগে পাড়ার অনেক মেয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন পরে সবার সঙ্গে সুলোচনার দেখা সাক্ষাৎ হল। কুশলাদি বিনিময় হল। তাদের মধ্যে থাকমণি সুলোচনাকে বলে, "তোর মা যে বড় তোকে আসতে দিলে? তোকে একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হতে দেয় না, এই রাত্রে বিয়ে দেখতে কেমন করে বেরয়ে এলি?"

সুলোচনা তার উত্তরে হেসে বলে, "রেতে বেরয়ে এলাম তাই আশ্চর্য হলি, কত লোক যে দিনে বেরয়ে আসে, তার কি বল দেখি? আজকাল আবার বেরোবার ভাবনা।"

এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে জানা যায়, তখনকার সমাজ যা-ই বলুক না কেন বিধবা-বিবাহ প্রচলন না থাকার জন্য সমাজে প্রচুর ব্যভিচার ঘটেছিল। শাস্ত্রের আচার-আচরণ দিয়ে রক্তমাংসের জীবনকে সব সময় বেঁধে রাখা যায় না। যে বয়সের যে ধর্ম তা কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশ হয়েই পড়ে। তাই সুলোচনার রাত্রিবেলা বিধবাবিবাহ দেখতে আসার প্রশ্ন উঠলে সুলোচনার উত্তরের মাধ্যমে জানা যায় দিনের বেলায়ও এমন ব্যাপার তখন ঘটতো।

আসলে কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ প্রথার কারণে যে অসংখ্য যুবতী কন্যারা অকালবৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করছিল তারা বা তাদের কেউ কেউ সেই বয়ঃধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল। যুবতী বিধবা সুলোচনা যেমন পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে প্রতিবেশী রামকান্ত বোসের ছেলে মন্মথর সঙ্গে গোপন পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিল তেমন ঘটনা ঐ সময়ে নিশ্চয় বিরল ছিল না।

সুলোচনা 'বর' দেখে (স্বগত) বলেছিল, "আহা দিব্বি বরটি যে গো।" আবার

ছেলেটিকে দেখে দুঃখও পেয়েছিল। কারণ তার সংস্কারবোধে হয়ত এটা ছিল যে, দুর্ভাগ্য না হলে এত সুন্দর ছেলে কি বিধবাকে বিয়ে করতে পারে! তবে প্রসন্নর অদৃষ্টটা যে ভাল তা সুলোচনা স্বীকার করেছিল। কেননা বৈধব্য-যন্ত্রণার হাত থেকে প্রসন্ন বেঁচেছে। এখানে সুলোচনার উক্তি—"প্রসন্নর অদৃষ্টটা ভাল বলতে হয়। আমাদের মত চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মরতো—সর্বনাশী একাদশীরা ভার বইতো, সে সব দায় এড়াল। আমাদের মত আলোচাল খেতে হবে না—চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধর্ম ধর্ম করে মরতে হবে না।"

সুলোচনা ও প্রসন্ন সমবয়সী এবং দুজনেই বালবিধবা। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে প্রসন্নর পিতার সচেতনতার জন্য প্রসন্ন বৈধব্য-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হওয়ায় তার অদৃষ্ট ফিরে যায়। সুলোচনার মনে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে সচেতনতা এলেও রক্ষণশীল পিতা-মাতা সেখানে প্রাচীনপন্থী। এখানে সুলোচনা নিজের অদৃষ্টকেই শুধু দায়ী করে না; সেই সঙ্গে পিতা-মাতাকেও দায়ী করে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে গৌরমনির উক্তিতে এই সচতনতার পরিচয় পাওয়া যায়,—"আহা! দিদি, মা বাপ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তাহলে এতদিন বিধবাবিবাহ চলত।.... দেখ দিদি এসব (বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ, বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন ব্যবস্থা) পরমেশ্বর করেননি, মানুষে করেছে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত।" (দ্র. বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু মিত্র, পৃ.-২৪৫-২৪৬)।

সুলোচনা বরের পাশে মন্মথকে দেখতে পেয়ে মনে মনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। রসবতীকে খুঁজে বের করে মন্মথর উপস্থিতির কথা জানায়। রসবতীর কথায় জানা যায়,—সে বলে "এ বাড়ী যে মন্মথর মামা বাড়ী, এখানেই জল খেতে এলে তার সঙ্গে সুলোচনার নির্জনে দেখা হবে।" সুলোচনাকে আশ্বাস দিয়ে রসবতী বলে, "ভেবে দেখ দেখি, ভাই, সেদিন কেমন হবে, যেদিন ঐ বর আর এই কনের মনের সুখে এইরকম বে দেবো? তখন ভয় থাকবে না—ভাবনা থাকবে না, মনের মত মন্মথকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।"

সুলোচনা জানায়, "রসবতী, তুই আশায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস, তোর কথায় এতদিন বেঁচে আছি।" সুলোচনা আক্ষেপে রসবতীকে বলেছিল, "পোড়া দেশে কতকগুলিন লোক না মলে আর কতকগুলিন না হোলে, রাঁড়ের বে কি সর্বত্রে চলবে? এটা একটা বে হচ্ছে, দেখিস দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্তা বললেন, 'ওর বাড়িতে ভাত খাওয়া হবে না', আর এক কর্তা বললেন এ 'বের পুরুত, বরযাত্রীদের একঘরে করা উচিত। ভাই, এই সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা

আর একবার ভুলেও ভাবেন না যে, বিধবা হয়ে কত লোক কত কি করছে। যারা কিছু না করে ধর্মপথে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাবতে হয়, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল দেখি?''

সুলোচনার এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে বাইরের বিধবা-বিবাহ নিয়ে যে আলোড়ন চলছিল তার অনেক প্রভাব ফলেছে। তারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদের সুযোগ না পেলেও ভিতরে ভিতরে এই সমাজ নীতি সম্পর্কে সমালোচনা শুরু করেছে। এমনকি শান্তিপুরের তাঁতিরা সাড়ির পাড়ে বুনে দিত—বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে / সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে।'

আমরা 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে দেখেছি সেখানেও নারী-মহলে কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মতামতের কোন মূল্য না থাকায় ব্রাহ্মণ কুলপালকের চার মেয়েকেই একসঙ্গে বিবাহ আসরে উপস্থিত হতে হয়েছিল। এই নাটকে আমরা সেই কৌলীন্যপ্রথার ফলে নারীর জীবনে নানা ক্লেশ ও দুঃখের কথা যেমন পাই তেমনিই তাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধিতার সুযোগ না থাকায় ব্যভিচারের বা গোপন প্রণয়ের আশ্রয় নিতে দেখি। তবে এই নাটক বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরে রচিত বলে এখানে বিধবা-বিবাহের ঘটনা দেখানো হয়েছে। অবশ্য এই বিধবা-বিবাহের রীতি তখনও সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। এর প্রতি বিরূপতা বা বিরুদ্ধাচারণ ছিল যথেষ্ট।

এই নাটকে আমরা তৎকালীন বিবাহ-প্রথা, স্ত্রী-আচার, সমবয়স্কা সখীদের মধ্যে হাস্য-পরিহাসের কথাও জানতে পারি। 'বর'কে কেন্দ্র করে নারীদের মধ্যে এই হাস্য-পরিহাসে বর-বরণ এবং তাকে নিয়ে রাত জাগা, নাচ-গান করা প্রভৃতি হাস্য-পরিহাসের বিচিত্রতা জানতে পারি। তখন রামপ্রসাদী গান, সখীসংবাদ, রামমোহন রায়ের গীত, হরি সংকীর্তন, নিধু বাবুর টপ্‌পা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। বিয়ের আসরে বর নিধু বাবুর টপ্‌পা গান করে কন্যার সখীদের মনোরঞ্জন করত। তখন মেয়েদের নামগুলোও ছিল অদ্ভুত—রসময়ী, সুলোচনা, সুখময়ী, রসবতী, পদ্মাবতী, থাকমণি, প্রসন্ন প্রভৃতি।

তখন বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হলেও এবং সে আইন অনুযায়ী কিছু কিছু বিবাহের সংবাদ জানা গেলেও গ্রাম্য সমাজ তাকে সহৃদয় ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বিধবা-বিবাহের ঘটনা নিয়ে গ্রাম্য সমাজে নানা প্রকার কথাবার্তা চলতে

তার জন্য আর কিছু করবার উপায় নেই,—যাতে ভবিষ্যতে আর গ্রামে বিধবা-বিবাহ না হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা তৎকালীন সমাজচিত্র আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে আরও বিশদ উল্লেখ করতে পারব।

''কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের মূল অবলম্বন যেমন ব্রাহ্মণ কুলপালকের চার কন্যার বিবাহসমস্যা তেমনি এই নাটকের মূল অবলম্বন রক্ষণশীল পিতার যুবতী বিধবা কন্যা সুলোচনার বৈধব্য-যন্ত্রণা, তার অবৈধ প্রণয় ও আত্মক্ষয়ী পরিণাম। সুলোচনার মন্মথর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে প্রসবের সময় আসন্ন হলে একদিন বিষপান করল। মুমূর্ষু কন্যার পিতা কীর্তিরাম সব কথাই জানতে পেরেছিলেন; তবু রামকান্ত বোসের ছেলে মন্মথর সঙ্গে মেয়ের বিবাহের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তার মাতা পদ্মাবতী উদ্বেগে কন্যার জন্য কাতর হয়ে পড়লেও পিতৃ-হৃদয়ে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। পদ্মাবতী সুলোচনাকে বলেছেন, ''তিনি যদি মানুষ হতেন তবে তোর মার এমন দশা কেন হবে? বিধবার বে হলো, সর্বনাশ হলো বলে দলাদলি করে বেড়াচ্ছেন, এমন করে সর্বনাশ হয়ে গেল।''

কীর্তিরাম কিন্তু এর জন্য অধর্মে পতিতা কন্যা সুলোচনাকেই দায়ী করেছিলেন। বলেছিলেন, ''কন্যার মৃত্যু আপন কর্মদোষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম।'' এছাড়াও তিনি মুমূর্ষু কন্যাকে তাঁর নির্মল কুলে কলঙ্ক লেপনের জন্য ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, ''হা, অভাগিনী! তোমার ইহকালে ক্ষমা নাই; তোমার পরকালে ক্ষমা নাই।'' তার উত্তরে সুলোচনা বলেছিল, ''বিবেচনা কর দেখি বাল্যকালাবধি আমি কোন্ দিবস সুখী হইয়াছি? পিতা, আমার মত অভাগিনী এ জগতে কে আছে?'' শুধু তাই নয়, সে আরও বলেছিল, ''পিতা সকলের কি সমান প্রবৃত্তি? সকলের কি সমান সহ্যগুণ? যাদের স্বাভাবিক সু-প্রকৃতি তারা ধর্মপথে আছে, যাদের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায়! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, তা হলে কি আমি এইরূপ কুকর্মে রত হতেম? তা হলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো, তা হলে তোমাকে কি কলঙ্ক—লোকলজ্জা ভোগ করতে হতো?''

সুলোচনার এই উক্তি পড়তে পড়তে আমাদের মধ্যযুগের ইতালীয় নবজাগরণ-এর বিখ্যাত গ্রন্থ বোকাচ্চিয়োর ডেকামেরনের ফায়ামেটার গল্প মনে পড়ে। ঐ গল্পে বিধবা রাজকন্যা ফায়ামেটা যখন তার অবৈধ প্রণয়ের জন্য রাজ-শাস্তির কথা জানতে পারল, তখন সে পিতাকে একই প্রশ্ন করেছিল। ''আমি বিবাহিত

জীবনে যে সুখভোগে অভ্যস্ত হঠাৎ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি আর কি করতে পারতাম?" তাই সুলোচনার প্রশ্নও তার একার নয়। এই উক্তি সমস্ত বিধবা যুবতীকন্যার। আর তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কেবল তার পিতা নয়, সমগ্র সমাজ। সুখের কথা, কীর্তিরাম শেষ পর্যন্ত এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মুমূর্ষুকন্যার পাশে বসে আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম তা হলে এই বিপদ কদাচ ঘটিত না,.....হা! আমি বিধবা-বিবাহের কত বিপক্ষাচারণ করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে এই স্ত্রী হত্যা পাতকের অংশী হইতে হইল।.......এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক আমি তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না হইয়া তোর বিবাহ দিতাম, তা হইলে তোর এইরূপ মৃত্যু কদাচ হইত না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। হা! স্বামী আশ্রয় পাইলে তোর মত অভাগিনী এইরূপ বিপদে পতিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত।"

সুলোচনার মৃত্যু হল। কিন্তু বিধবার যন্ত্রণার বা দুর্ভোগের সমাপ্তি ঘটেনি। সুলোচনা তৎকালীন অসংখ্য নিগৃহীতা বিধবাদের একজন। তবে উমেশচন্দ্র এই নাটকে কেবলমাত্র সুলোচনার যন্ত্রণা এবং মৃত্যুই বর্ণনা করেন নি; তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার প্রেমের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। সুলোচনার সঙ্গে যার অবৈধ প্রেম হয়েছিল সেই রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ সত্যই সুলোচনাকে ভালোবাসত। সুলোচনার মৃত্যুতে মন্মথ উন্মাদ হয়ে উন্মাদাগারে স্থান লাভ করেছিল। এই ঘটনায় কেবলমাত্র কীর্তিরামের সংসারেই দুঃখের আবহ রচিত হয়নি, রামকান্ত বসুর জীবনেও এই সর্বনাশ দেখা দিয়েছিল। মন্মথর উন্মাদ রোগের ফলে একটি প্রেমময় যুবক-যুবতীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখানো হয়েছিল। ফলে এই নাটক যথার্থই একটি মৌলিক বিয়োগান্ত নাটক, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি। নারীজীবনের বহু বিয়োগান্তক ঘটনার একটি সার্থক প্রকাশ। তৎকালীন সমাজজীবনে নারীর অবস্থান যে কীরূপ করুণ ছিল সুলোচনার কাহিনীর মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলার সমাজজীবনে নারীচরিত্রের এই বিষময় পরিণাম পরবর্তীকালেও দেখা দিয়েছিল। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সুলোচনা বাংলা সাহিত্যে রোহিনী, কুন্দনন্দিনী, হিরণ্ময়ীর অগ্রজা।"

তখন বিধবা-বিবাহের যে আন্দোলন চলছিল সমাজের অন্দরমহলেও তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জননী পদ্মাবতী একদিন সুলোচনার নামে স্বামী

কীর্তিরামের নিকট অভিযোগ করে বলেছিলেন, "কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা একেবারে নেচে উট্‌লো। বয়সকালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়।"

আসলে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়েছে শুনে সুলোচনার মন একেবারে নেচে উঠেছিল। এর গভীর তাৎপর্য জনক-জননী বুঝতে না পারলেও যুবতী বিধবাদের মনে কী আন্তরিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায়। অবাঞ্ছিত কঠোর বৈধব্যজীবন থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে এদের জীবনে রঙ্গ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। দেহে ও মনে তারই উল্লাস যেন বান ডেকে এনেছিল। অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার বিবাহ আসরে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা এই যৌবনতরঙ্গের উদ্ভাস লক্ষ্য করেছি। সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের বেড়াজালে প্রাণপূর্ণ সজীব কত বিধবার জীবনে সুলোচনার মতো নিষ্ঠুর নিয়তি ঘনিয়ে এসেছিল, এই নাটকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুভূতি কেবলমাত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের নহে, আমরা জানতে পারি এই নাটকে পদ্মাবতী এবং পরে কীর্তিরামও অনুভব করেছিলেন যে, এই নির্মম মৃত্যু অপেক্ষা বিধবা কন্যার বিবাহ দিলেই ভাল হত। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষক সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী তার কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়েও এভাবেই বলেছিল যে, এই করুণ মৃত্যুর চেয়ে তার কন্যার সাহেবের সঙ্গে থাকাই ভাল ছিল। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক তৎকালীন অকালবৈধব্য যন্ত্রণার একটি সার্থক দলিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে সমাজ সংস্কার নিয়ে যে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল সেই ঢেউ বাংলার সমাজের সর্বস্তরে একটা জাগরণ এনেছিল। কৌলীন্যপ্রথা যে কী নিষ্ঠুর সামাজিক ব্যাধি, এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে সেই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের চিত্র আমরা দেখেছি। সমসময়ে কৌলীন্যপ্রথার অনিবার্য পরিণতিতে বালবিধবার প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং তাদের মর্মন্তুদ জীবনের দুর্দশা মোচনের জন্য বাংলার শিক্ষিত জনমানস জাগ্রত হয়। ১৮৫০ সনে 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় হিন্দুবালিকা বিধবাদের দুর্দশা এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৭৭৬ শক, ১৩৯ সংখ্যায় 'বিধবাবিবাহ উচিত কিনা' শীর্ষক বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হলে সমাজে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার

সমাজ চিত্র', দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪১-৫৩)।

তবে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে সম্ভবত অনুসিদ্ধান্তের মতই বিধবাদের অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধন শিক্ষিত সমাজসংস্কারকদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। বিধবাদের বিশেষ করে বালবিধবাদের জীবনের দুঃখ মোচনের সহজতম উপায় হিসাবেই তাদের পুনর্বিবাহের কথা 'ইয়ংবেঙ্গল' সহ স্বল্প কয়েকজন সমাজকর্মীর স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৩৩-৩৪ সনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 'ইয়ংবেঙ্গল' পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লেখা হয়। এঁরা বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য এ সময়ে কলকাতায় একটি সভাও স্থাপন করেন বলে জানা যায়। (দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খন্ড,—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ.—২৬৩-৬৪)। এছাড়াও 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুরের এক বিধবাও সরকারের কাছে বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়নের দাবি জানান। (রামদুলাল বসু—বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ; কলকাতা ১৯৭২, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. IV)।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যে সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব প্রকাশিত হয় তার পরবর্তী সংখ্যায় (চৈত্র ১৭৭৬ শক, ১৪০ সংখ্যা) অক্ষয়কুমার দত্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব সমর্থন করেন। (দ্র. সাময়িক পত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৫৩-১৬২)। "নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথ আশ্রয়" করে তিনি বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে নয়-দফা যুক্তি প্রদর্শন করেন। এতে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। তবে একথা ঠিক বিধবাবিবাহের সপক্ষে আন্দোলন এই শতকেই প্রথম নয়, এর আগেও বালবিধবাদের কৃচ্ছ্রসাধন ও দুর্দশা কোনো কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই ব্যথিত ও সহমর্মী করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঢাকার বড় জমিদার রাজা রাজবল্লভের আট বছরের বিধবা কন্যা অভয়া দেবীর বৈধব্যযন্ত্রণা দেখে তিনি এত বিচলিত হন যে, ১৭৫৫ সনে পন্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করে পুনর্বার বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন। সেই উপলক্ষে তিনি দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলের পন্ডিতগণের মতামত গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ পন্ডিতের প্রতিকূলতায় কন্যাকে পুনর্বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক উপবাস থেকেও তাকে বাঁচাতে পারেন নি। (দ্র. 'রানীভবানী', অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৪ (১৮৯৪) পৃ. ৬৬৮)।

ফলে দেখা যায় বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ কোনো

মহাশূন্যলব্ধ প্রেরণাবশে আরম্ভ করেন নি। সমাজ সংস্কারের কোনো আন্দোলনই হঠাৎ কোনো দৈবঘটনা বা ভাববিহ্বল সংস্কারের ইচ্ছায় আরম্ভ হয় না। তার জন্য সমাজে এমন একটা বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে সচেতন যুগদর্শী মানুষদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি দেখা দেয়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে বালবৈধব্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। পরে রামমোহনের উদ্যোগে 'সতীদাহ নিবারণ' আইন পাশ হওয়ার পর এই সমস্যাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই লোক চক্ষুর সামনে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় ঐ পত্রিকায় এ বিষয়ে পর পর নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাসাগরের যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে প্রায় একক সংগ্রামের দ্বারা সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, এই পত্রিকায় বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে নানা ঘটনা প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক বিধবা-বিবাহ আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলা নাটকে তার কোনও প্রতিফলন ঘটেনি। আসলে সামাজিক নানা ভয়-ভীতির জন্যই এই সব ঘটনা নিয়ে কোনো নাট্যকার নাটক লিখতে সাহস করেন নি। কিন্তু এ আইন পাস হওয়ার পরে বিধবা-বিবাহ অবলম্বনে বহু নাটক রচিত হয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় যে সকল ঘটনার কথা জানা যায় সেগুলো বহু নাটকীয় উপাদানের বিষয়। যেমন—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, ''গত ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৭৭৮ শক) রবিবাসরে দেশ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত, পটলডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল, ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃপরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভকর্ম সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশপ্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত

পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করে।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ১৯৬)।

এরপর আর একটি ঘটনাও ঐ পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। "ইহার পর দিবস পাণিহাটী গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থকুলীন বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যাকে ইহার পিতাই সম্প্রদান করেন। ইহাও কায়স্থবর্গের নির্দিষ্ট কুলাচারানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. - ১৯৬)

১৭২ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়ও অনুরূপ সংবাদের কথা জানা যায়। "গত ২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্তমান। তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বর। শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী কন্যা। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত, বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। কন্যাটি অতি বালিকা, বয়ক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যেই তিনি বিবাহ সংস্কারলাভ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বিবাহ ও আড়াই বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। এরূপ অল্প বয়সে বিধবা হইলে ঐ বিবাহ প্রকৃত বিবাহসংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কিনা, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহসংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নামমাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশী বিধবা কন্যাকেও যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.-২০১)।

এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা এ বিষয়ে নানা শাস্ত্রমত উল্লেখ করে বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত দিয়ে বলেছিলেন, "বিধবা-বিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোন ক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।" এর প্রসঙ্গেই তিনি সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করে লিখেছিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য বৈধব্য

যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা যাঁহাদিগের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শতশত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। আর যাবৎ এই শুভঙ্করী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, ততদিন ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.-১৫৩)।

হিন্দুশাস্ত্রের এই অপব্যাখ্যা এবং হিন্দুসমাজের নানা দুরবস্থার ফলে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম-ধর্মানুযায়ী বিবাহের প্রথা প্রচলিত হয়। তৎকালীন সময়ে প্রথম ব্রাহ্মবিবাহের সংবাদও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১২ শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক। "শুক্রবার ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রামরাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.-১৫৩)।

এই বিবাহবিধি খুব সরল। শাস্ত্র বা ব্রাহ্মণের কোনো উপদ্রব নেই। বিবাহের সভায় পাত্র অভ্যর্থনার পরে ব্রহ্মনামের মঙ্গলধ্বনি, তারপর কন্যাদান। কন্যাদানের কাজ সম্পন্ন হলে আচার্য নবদম্পতিকে উদ্দেশ্য করে আশীর্বচন এবং বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও কর্তব্যকর্মের প্রতি আদেশ দেন। তখন ব্রাহ্মসমাজের খুবই প্রভাব ছিল এবং ব্রাহ্ম-মতে বিবাহেরও প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

আসলে কোনো সমাজের আচার, ব্যবহার এবং রীতিনীতি চিরকাল একভাবে থাকে না। কালক্রমে মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আচার ব্যবহারেরও পরিবর্তন হতে থাকে। তা না হলে মানব সমাজে অশেষ দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়। তিন হাজার বৎসর আগে হিন্দুসমাজের যে অবস্থা ছিল এখন আর তা নেই। আগে সতী, নরবলি ইত্যাদি প্রথা ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তাহা নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব কালে কালে নিয়ম নীতির পরিবর্তন ঘটে। সমাজের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন আবশ্যক

হয়ে ওঠে। এই আবশ্যকতার প্রয়োজনেই নানা সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিধবা-বিবাহ নাটক একদিকে যেমন বালবিধবাদের দুর্দশা মোচনের নাটক তেমনই নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার নাটক। বালবিধবাদের একদিকে সমাজের অত্যাচার সহ্য করতে হত এবং কঠোর আচারাদি পালনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। এ কাজ খুবই কঠিন ছিল। তাছাড়া বালবিধবারা যখন ধীরে ধীরে যৌবন লাভ করত তখন অন্যান্য মানব-মানবীর মতই তাদের মধ্যে যৌনকামনা জেগে উঠত। তাকে সব সময় সংযত করতে অসমর্থ হয়ে বহু বিধবাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সতীত্ব বিসর্জন দিত। উনিশ শতকে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় ঐ সব বিধবাদের পক্ষে দুটি পথ খোলা ছিল—গর্ভপাত অথবা আত্মহত্যা। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকে সুলোচনাকে এই দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করতে হয়েছিল; এবং তখন কলকাতার রাস্তায় অনেক সদ্যোজাত পরিত্যক্ত সন্তানের সন্ধান পাওয়া যেত। তাছাড়া আর একটি পথ খোলা ছিল, সেটা হল বেশ্যাবৃত্তি। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এরকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিধবা গর্ভবতী হওয়া এবং ভ্রূণহত্যা করা বিষয়টি সেকালের সমাজে এমন বহুল প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত ছিল যে, শিক্ষিত, ভদ্র সমাজও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য কুপথগামিনী বিধবা রমণীকে ভ্রূণহত্যা করতে উৎসাহ দেওয়া অন্যায় বলে মনে করত না। (শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে)।

যারা এই গর্ভপাত করাতে বা আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হত, তারা পালিয়ে গিয়ে সরাসরি বেশ্যা হত। সেকালে বেশ্যাবৃত্তি বিধবাদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, একই বাংলা শব্দ 'রাঁড়' বললে বিধবা এবং বেশ্যা উভয়কেই বোঝাত। বহু নাটকে বেশির ভাগ বেশ্যাই যে বিধবা ছিল তার প্রমাণ আছে। শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকায় (১১ মার্চ, ১৮৬৯) বলা হয়েছে, হিন্দুবেশ্যাদের শতকরা ৯০ ভাগই ছিল বিধবা। এ ছাড়াও আর একটি পথ ছিল, তা হল ধর্মান্তর গ্রহণ। বিধবাদের জীবনের ব্যর্থতা, শোচনীয়তা এবং ব্যাভিচার ছাড়াও বৈধব্য হেতু আরও একটি সমস্যা হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল। বৈধব্যের দারুণ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো কোনো বিধবা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন। এ রকম একটি ধর্মান্তরের কথা প্রথম উল্লিখিত হয় ১৮৬১ সালে 'অগত্যা স্বীকার প্রকরণ' নাটকে। এ নাটকের নায়ক মন্মথ বিধবা যুবতী রাসবিহারিণীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তর গ্রহণ

করাবার জন্য এক খ্রিস্টান ধর্মযাজকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বাস্তবে এরূপ একটি সাড়া জাগানো ধর্মান্তর ঘটে ১৮৭০ সালে। গণেশসুন্দরী নামক একটি যুবতী বৈধব্য-যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার আশায় মার্থা নামক এক দেশীয় খ্রিস্টান মহিলার প্ররোচনায় খ্রিস্টান হন।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রচেষ্টায় গণেশসুন্দরী খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বিধবাদের মধ্যে এই ধরনের ধর্মান্তরের ঘটনা যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সমসময়ে তার প্রমাণ আছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় বলা হয়, ক্রমশ অধিক সংখ্যক হিন্দুবিধবা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করছে। (দ্র. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, গোলাম মুরশিদ, পৃ.-১৭-১৮)।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়—সেই সময়ে বিধবা-বিবাহ অবলম্বনে বা বিধবাদের সমস্যা নিয়ে বহু নাটক রচিত হয়েছে। বস্তুত এই সমস্যা সেই সময়ে এত প্রবল ছিল যে, সচেতন মানুষ মাত্রেই এ বিষয়ে আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' এই পর্যায়ের প্রথম নাটক। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন নারীর অবস্থানের সর্বাঙ্গীণ না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা জানতে পারি। সেজন্য এই নাটককে আমরা বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের একটি প্রতীকী নাটক বলে গণ্য করেছি। এই নাটকের মধ্য দিয়েই তৎকালীন নারীজাতির অবস্থান ও দুর্দশা, ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং স্বীকৃতির পরিচয় পাই।

একেই কি বলে সভ্যতা?

পূর্ববর্তী নাটকে আমরা নারীর অবস্থানের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তার অন্যতম কারণ হল এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন। উনিশ শতকের প্রারম্ভকালে এদেশ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে একটা জাগরণের সৃষ্টি হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে রামমোহন রায় যে উদ্যোগ নেন, তারই প্রভাবে দেশীয় যুবকদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য এদেশীয় উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিতজনের উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭)। এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কবি হেন্‌রি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এই কলেজে যে-সব যুবক শিক্ষা লাভ করেন প্রধানত ডিরোজিও'র শিক্ষাগুণে তাঁরা একদিকে যেমন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় এবং সমাজ সেবায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন, অপরদিকে তেমনই হন যুক্তিবাদী। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর এই শিষ্যরাই সাধারণ ভাবে 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে আখ্যাত হতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হয়ে পড়েন। অনেকে আবার হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা নির্বিচারে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার-সংস্কার গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। এবং এই অন্ধ আচার-বিচারের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদী হন। অনেক সময় এই প্রতিবাদ উগ্র হয়ে পড়ে এবং তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন; এবং তাঁদের যুক্তি-তর্ক যে সর্বদা সুপ্রযুক্ত হত তা নয়। এর ফলে নাগরিক সমাজে যে বিষময়তা এবং আচার-আচরণে যে বৈপরীত্য ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল তারই একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র হাস্যরসের আঙ্গিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' শীর্ষক প্রহসনে।

প্রহসন সম্পর্কে সাধারণের ধারণা—এটি লঘু আয়তনের, লঘু মেজাজের হাস্যরসাত্মক একটি পুস্তিকা। প্রহসনের মূল উদ্দেশ্য মূলত তাই। প্রকৃষ্টরূপে হাস্যরসের সৃষ্টি করাই তার ধর্ম। নাটক কিন্তু প্রহসন নয়। নাটকের মধ্যে একটা গুরুগম্ভীর বাস্তব সমস্যা বর্তমান থাকে। উনিশ শতকের সামাজিক অবস্থার কারণই হল এই প্রহসনের জন্ম। তখন যে-সব নাটক এবং সাহিত্য ইত্যাদি রচিত হত তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। সেইজন্য তাঁরা সচেতনভাবেই নানা সামাজিক রীতিনীতিকে আঘাত করেছিলেন। এই প্রবণতা আমরা 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' এবং 'বিধবা-বিবাহ' নাটকেও প্রত্যক্ষ করেছি। ড. আশুতোষ

ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন, "সামাজিক কুপ্রথা ইংরেজি সভ্যতার অনুকরণে মোহ, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সমাজের অগ্রগতির পথ সেদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই ইহাদের অবসানের জন্য সেদিন যেমন আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন নিছক শিল্প সৃষ্টির জন্য তেমন উৎসাহশীল হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাই ছিল সেদিনকার প্রহসনগুলির স্বক্ষেত্র।" (ভূমিকা - সামাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন।)

তৎকালে সামাজিক কুসংস্কার নাগরিক জীবনের চেয়ে পল্লিসমাজেই বেশি প্রকট ছিল। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলো উৎপাটনের জন্য সেদিন সমাজসংস্কারকেরা কঠোর আঘাত করতে আরম্ভ করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন সেদিন সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে না পৌঁছলেও তার প্রভাব সমগ্র সমাজমানসে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঐ উদ্দেশ্যেই তাঁর এই বিখ্যাত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' রচনা করেছিলেন। তিনি এই প্রহসনের মধ্যে সভ্যতার অনাচার, তার গতিবিধি উপস্থাপন করেছেন। এই প্রহসনের কর্তামশাই পরমবৈষ্ণব, তিনি প্রায়ই বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে থাকেন। তাঁর ছেলে নববাবু কলকাতার কলেজে পড়া শেষ করে কলকাতাতেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়। নববাবু বিবাহিত, এবং তাঁর স্ত্রী হরকামিনী বর্তমান। এই হরকামিনীর মধ্য দিয়েই আমরা সেই সময়ের নারীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করতে পারি।

নববাবু পড়াশুনো শেষ করে তাঁর কয়েকজন ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামে এক সভা স্থাপন করেছেন। সভার প্রধান উপকরণ ছিল মদ ও মেয়েমানুষ। শিক্ষার যে মহৎ উদ্দেশ্য নববাবু এবং তার বন্ধুদের কাছ থেকে তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। নববাবুর বন্ধু কালীবাবু মিথ্যা কথা বলে নববাবুর পিতার সুনজরে পড়ার জন্য নিজেকে বৈষ্ণব বংশের সন্তান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আশ্চর্য নববাবু নানাভাবে শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দের নাম মনে রাখতে পারে না। বই দুটোর নাম ভুলে গিয়ে সে বলে শ্রীমতি ভগবতীর গীত, বোপদেবের বিন্দাদূতী।

নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী ঠাকুরঝিদের নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাস খেলে। নববাবুর মা এই তাস-টাস খেলা পছন্দ করেন না। তাস খেলতে খেলতেই হরকামিনী নববাবুর মদ খাবার কথা বলে। একদিন নাকি নবকুমার মদ খেয়ে এসে সামনে বোনকে পেয়ে তাকে ধরে তার গালে একটা চুমু খেয়েছিল। নববাবু বলে, "এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই

কি দোষ হয়?" বাড়িতে পিতা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে 'ব্রান্ডি ল্যাও' বলে চিৎকার করে। হরকামিনীকে দেখে 'পয়োধরি' বলে সম্বোধন ক'রে অশ্রাব্য কথা বলতে শুরু করে দেয়।

আমরা এ নাটকে বেশ্যাচরিত্রের পরিচয় পাই। সমাজে বেশ্যাবৃত্তির কথা আমরা 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' ও 'বিধবা-বিবাহ' নাটকেও পেয়েছি। তবে এই প্রহসনে তারা প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থিত। বামা, পদী, থাকি প্রভৃতি বারবিলাসিনী—এদের চরিত্রে কোনো জড়তা নেই। এদের হারাবার কিছু নেই। তাই অচেনা বাবাজির সঙ্গেও তারা সহজে রঙ্গরসিকতা করতে পারে।

নববাবু মাতাল হলেও তার মুখ দিয়ে সেই সময়ের সমাজচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বলে, "জেন্টেলম্যেন আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিস্টিসনের শিক্‌লি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে, এখন প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে আমার এ দেশের সোসিয়েল রিফারমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।"

সে আরও বলে, "তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দেও, জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও, তা হলে—এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, নচেৎ নয়।"—তার এই উক্তির মধ্যেই আমরা সেই যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, নারীশিক্ষার প্রচলন এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে মনোভাবের পরিচয় পাই।

ঠাকুরঝিদের নিয়ে হরকামিনীর তাস খেলা প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাড়ির পুরুষেরা যখন সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং মদ্যপান নিয়ে ব্যস্ত তখন বাড়ির মেয়েরা—প্রসন্নময়ী, নিত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী অন্দরমহলে তাস খেলে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মনেও মেলা ক্ষোভ আছে। তারাও দিনকালের খবর রাখে। যে গৃহিনী বাড়ির মেয়েদেরও পছন্দ করেন না তিনিও রামমোহন রায়ের সভার খবর রাখেন। তবে মেয়েদের মধ্যে সেকালের সংস্কার বড় দৃঢ় হয়। নবদের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভারও খোঁজ তারা রাখে। বাড়ির পুরুষের কী আচরণ তাও জানা যায় হরকামিনীর কথায়। হরকামিনী বলেই ফেলল, "না ভাই আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ সমস্ত রাতটি মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো্য বেরোবে এখন, আর এমন নাকডাকুনী—বোধ করি মরা

মানুষও শুনলে জেগে ওঠে! ছি!" তারা এত বেশ্যাসক্ত যে নিজের স্ত্রীকেও বারবিলাসিনী ভেবে সম্বোধন করে।

নববাবুর বোন প্রসন্নময়ী বহুবিবাহিত কুলীনস্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রী। পিতার আশ্রিতা। কৌলিন্যপ্রথার বলি। বড় দাদার এই কুৎসিত আচরণের জন্য সে তাকে ভয় এবং সংকোচের দৃষ্টিতে দেখে। তার সংসর্গ হতে দূরে থাকে। এমন কি অন্যান্য অবিবাহিতা বোনেরাও নববাবুকে এড়িয়ে চলে কিন্তু লুকিয়ে তার মাতলামি দেখে তারা মজা পায়।

নবর জননী কিন্তু ছেলের এই মাতলামিতেও বিব্রত হন না। তাঁর কাছে মাতাল নবও দুধের বাছা। এ জননী কখনও সন্তানের অনিষ্ট কামনা করতে পারেন না। নবর মাতলামি দেখে তাঁর মনে হয় তাঁর ছেলেকে ভুতে-টুতে পেয়েছে।

হরকামিনীর উক্তির মধ্যেই তৎকালীন নারীর অবস্থান সঠিক ভাবে জানা যায়। হরকামিনী তার ঠাকুরঝিকে বলে, "এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই।" সে আরও বলে, "এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি? ঠাকুর ঝি তোকে বল্‌তে কি ভাই, সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছা করে যে গলায় দড়ি দে মরি!" তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সংস্কারকামী পুরুষদের চরিত্রের এই নৈতিক স্খলন নারীজীবনে অশেষ বিড়ম্বনা এবং যন্ত্রণার কারণ হয়।

তাই নামে প্রহসন হলেও 'একেই কি বলে সভ্যতা?'—এর মধ্যে তৎকালীন নারীজীবনের যে দুঃখ ও অশেষ ক্লেশভোগের চিত্র আছে তা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। বরং গভীর উদ্বেগের কারণ। এর থেকে আমরা শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও বিচ্যুতির নিদর্শন লাভ করি, এবং তাদের পরিবারের অন্দরমহলেরও নারীজীবনের যে দুর্দশা এবং অসহায় অবস্থা তা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

"একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটক রচিত হয় ১৮৬০ সালে। এই নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার সমাজ জীবনের নানা আলোড়নের কথা জানতে পাই। নববাবু স্ত্রীশিক্ষার কথা বলেছেন, নারীস্বাধীনতার কথা বলেছেন, জাতিভেদ দূর করার কথা বলেছেন, আর বলেছেন, বিধবাবিবাহ দেওয়ার কথা। তার ধারণা তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি পাশ্চাত্যের সভ্য দেশের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারবে।

আমরা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ ও আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই বিধবা-বিবাহ গ্রন্থ রচনারও আগে ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়

তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন কার্যে নিজেদের দৃঢ় মন-প্রাণ সমর্পন করেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী থেকে আমরা তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের নব নিযুক্ত ডিরেক্টর মিস্টার গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘোরতর বিবাদের কথা জানতে পারি। এই বিবাদের মূল কারণই ছিল জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হয়ে নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইয়ং সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্টের অর্থ ব্যয় করতে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠানো বিল সই করেননি; এবং এই বিবাদের ফলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়। এই নাটকে স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখ সেজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি, তখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টা হয়েছিল। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বেথুন সাহেবের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার নানাভাবে বেথুন সাহেবকে সাহায্য করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারই ছিল বেথুন সাহেবের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেথুন বিদ্যালয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমাজের প্রবল বিরোধিতার মুখেও এ বিদ্যালয় ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অনেক নির্ভীক ব্যক্তি তাঁদের বাড়ির মেয়েদের এ বিদ্যালয়ে ছাত্রী হিসাবে পাঠাতে সাহায্য করেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। তবে একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঐ শতকের ৭০-এর দশকে এমন কি ৮০'র দশকেও স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাব সমাজের কোনো কোনো অংশে রীতিমত প্রবল ছিল। এমন কি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করায় উদ্যোগী যুবকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা থেকে আরম্ভ করে নানা রকম অত্যাচার করা হত। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায়—"বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করলে ১৮৬০, ১৮৭০ দশকে সমাজ কন্যার অভিভাবকের উপর রীতিমত অত্যাচার করত।" (দ্র. শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম)।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ফলেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহলে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের

উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "অন্ধকারে অন্ধ থাকো, কাজ নাই আলো।" (দ্র. সংবাদ প্রভাকর, ২২ এপ্রিল ১৮৫১/বাংলা সাময়িক পত্র-১)। এই প্রতিকূলতার প্রধান কারণই ছিল রক্ষণশীলতা। প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটলে সমাজে অমঙ্গল ঘটতে পারে—এই অমূলক আশঙ্কাই স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয়তা দেয়নি। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এমন উক্তি করেছেন যে—"বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের সংসর্গ অপেক্ষা নরকবাস বরং ভালো"। (দ্র. 'বিড়ম্বনা' —জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮০, পৃ.-১৯০।)

রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম জীবনীকার মেরি কার্পেন্টার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এই বাধা দেখে খুব হতাশ হন। স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণের অন্যতম বাধা ছিল বাল্যবিবাহ। অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে ঘর করাই ছিল সেকালের প্রচলন। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র সকলের জীবনেই এই বিড়ম্বনা ঘটেছিল। আমরা পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল বসুর নাটকেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতার পরিচয় পাব।

এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'বেথুন সোসাইটি', 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা', 'বামাবোধিনী সভা', 'ভারতসংস্কারক সভা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এইসব সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য এবং নগরায়নের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এক শ্রেণির উদ্যোগী পুরুষ কলকাতায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অনেকে গ্রামের বাড়িতে পরিবারকে রেখে একলা কলকাতায় এসে বসবাস করেন। এইসব কারণে এবং পরিবেশের প্রভাবে তখন বেশ্যাগমন এবং মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইংরেজদের মদ্যপান রীতির অনুসরণ করতে গিয়ে এবং বেশ্যাসক্তির সহচর হিসাবে মদ্যপান বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে 'বাবু' এবং 'ভদ্রলোকদের' মধ্যে এই মদ্যপান বহুলভাবে প্রচলিত হয়। তারা মদের সঙ্গে গাজা, চরস, আফিম ইত্যাদিও সেবন করতেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' প্রভৃতি গ্রন্থে এই বাবুদের মদ্যপান

ও বেশ্যাগমনের চিত্র পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করতেন মদ্যপান এবং মুসলমানিখানা খাওয়া সুসংস্কৃত মনের পরিচায়ক। তাঁরা আরও মনে করতেন "এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের ওপর জয়লাভ করা"। (দ্র. সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃ.-২৭)।

মদ্যপানের প্রতি এইরূপ মনোভাবের জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই পানাসক্ত হয়ে পড়ত। বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের মুখে একদিকে সেক্সপিয়ার, বায়রন, ডেকন ইত্যাদির কথা যেমন থাকত তেমনি তাদের হাতে মদের বোতলও থাকত। মদ্যপানকে তখন তাঁরা নির্দোষ বলে গণ্য করতেন। কিন্তু এর বাড়াবাড়িতে সমাজে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'একেই কি বলে সভ্যতা'? প্রহসনের মধ্যেই তারই চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। আসলে শিক্ষিত সমাজে একদিকে যেমন মদ্যপান এবং বেশ্যাগমন একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি এই শিক্ষিত সমাজই সচেতন হতে আরম্ভ করেছিলেন। এই সবের প্রাদুর্ভাবে কতকগুলি সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছিল। "বাড়তি ব্যবসা-বাণিজ্য, নবলব্ধ ইংরেজি বিদ্যা, চাকুরি প্রভৃতির সাহায্যে বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার কতগুলো পরিবার এবং সমষ্টিগত ভাবে কলকাতার সমাজ একটি ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনীতি, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এ সমাজে নতুন মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাচ্ছিল। কিন্তু পানাসক্তির ফলে উন্নতিশীল পরিবারসমূহের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্থল—যুবকগণ পরিবারের নিকট একটি সমস্যায় পরিণত হয়। এই সব যুবকদের মধ্যে পরিবার তথা সমাজ যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিল, অপরিমিত পানাসক্তির ফলে তা নিশ্চিত বিনষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মদ্যপানের প্রাদুর্ভাববশত পরিবারসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচলিত হয় এবং পরিবারের সমষ্টি অর্থাৎ সমাজও একই কারণে শঙ্কিত হয়। মদ্যপায়ীরা অশোভন ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা একটি স্থিতিশীল সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন, তা-ও এই আশঙ্কার অন্যতম কারণ।" (দ্র. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক ১৮৫৪-১৮৭৬—গোলাম মুরশিদ, পৃ.-৩৪৬-৪৭)। আলোচ্য প্রহসনে সে আশঙ্কাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিরা জননী, স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সময় আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী

ছিলেন। তাঁর পরিবারের অনেকেই অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করেছিলেন যে, এই মদ্যপানের জন্য কত সৎ ও বিদ্বান এবং দেশহিতৈষী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মদ্যপানের ফলে লাম্পট্যও যথেষ্ট উৎসাহিত হয়। আমরা এই নাটকে কয়েকজন বারবিলাসিনী এবং কয়েকটি পুরুষ চরিত্রের উক্তির মধ্যে তার প্রমাণ পাই। মোটকথা পানাসক্তি সমাজদেহকে জীর্ণ ও কলুষিত করেছিল তার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগে একটা সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। অক্ষয় কুমার দত্ত বার বার উল্লেখ করেছেন, পানাসক্তি ইংরেজ অনুকরণেরই কুফল।

বিধবাবিবাহ এবং জাতিভেদের সম্পর্কে আমরা পূর্বের নাটকগুলির আলোচনার সময়ে বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি। দেশে ইংরেজি শিক্ষা এবং নানা সংস্কার আন্দোলনের ফলে আমরা অনুভব করি আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথাও অমাদের অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। তখন উদার এবং শিক্ষিত সমাজ এই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই নাটক যখন রচিত হয় তখন দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) ব্যর্থতায় পর্যবসিত কিন্তু তার যে প্রবল ধাক্কা সর্বস্তরে লেগেছিল তা কিন্তু প্রশমিত হয়নি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রমীলা চরিত্রে আমরা তার স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই।

তৎকালে অভিজাত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং প্রাচীন গোঁড়া সনাতনপন্থী রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা' উভয়ই দেশের কল্যাণের জন্য স্থাপিত হয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল সে দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের মধ্যভাগেও প্রশমিত হয়নি। মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটকে এই দুই সমাজের দ্বন্দ্ব চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই দ্বন্দ্ব অবশ্য বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রথম প্রকটতা লাভ করেছিল রামমোহন রায়ের সময়েই। তিনি চেয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনে ও অন্ধ কুসংস্কার দূরীকরণের দ্বারা সমাজের একটা প্রকৃষ্ট অগ্রগতি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন, ইংরেজ এদেশে আসার ফলে তাদের শিক্ষা ও সভ্যতার কল্যাণকর দিক আত্মস্থ করে আমাদের শুধু বাঙালি সমাজ নয়, ভারতীয় সমাজকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তায়-চেতনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সমতুল করে গড়ে তুলতে। সেইজন্যই তিনি প্রথমে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ও পরে

'ব্রাহ্মসমাজ' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন গোঁড়া হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে যে বিষোদ্গার দেখা দিয়েছিল রামমোহনের চিন্তা-চেতনা এমনকি তাঁর নামকে পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। তাঁরাও ধর্মের নামে একাজ করেছিলেন। সে সভার নাম 'ধর্মসভা'। এই নাটক রচনার কালে রামমোহন রায় প্রয়াত তা আগেই উল্লেখ করেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে ব্রাহ্ম আন্দোলন চললেও, ক্রমে ক্রমে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে এবং হিন্দুধর্মের প্রবল বিরূপতায় তা স্তিমিতও হয়েছিল। রামমোহনের সময়ে আর একজন মানুষ রামমোহনের মতো ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কলকাতার যুবচিত্তে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি হলেন পূর্বে উল্লিখিত হেনরি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর প্রভাবে হিন্দুকলেজে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ হচ্ছিল। এই স্বাধীন চিন্তার অঙ্গ হিসাবেই তখন যুবকদের মধ্যে সুরাপানের প্রবণতা বেড়ে উঠেছিল। সেই সময়ে সংস্কারপথে অগ্রসর ব্যক্তিরা সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখতেন না। কারণ তাঁদের কাছে একটাই ঘৃণার বস্তু ছিল সেটা হল হিন্দুধর্ম। Athenium পত্রিকায় মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখেছিলেন,—"If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism." (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৮৭)। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তাঁহারা ইহাকে (মদ্যপান) কুসংস্কার-ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে করিতেন।" ঐ ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই ভাবে একে (মদ্যপানকে) অবলম্বন করেন। কিন্তু ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে এই নব্য যুবকেরাও এই আদর্শকে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁরা অনেকে হিন্দুদের কুসংস্কারকে অবলম্বন না করলেও মদ্যপান নিয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

এই নাটকে আমরা যে সমাজকে প্রত্যক্ষ করি তা হল একদিকে এই নব্য-শিক্ষিত সুরাসক্ত যুবসমাজ এবং অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দুসমাজ। ঐ হিন্দুসমাজের সারথি হয়ে রাধাকান্ত দেব রামমোহনের সময়ে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেছিলেন। তাঁরাও ধর্মের নামে যুক্তিহীন অভ্যাস ও সংস্কারকে আঁকড়ে রাখবার জন্য বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন। এই প্রহসনে তারও পরিচয় আছে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার নাম করে কালীবাবু, নববাবুদের যেমন এখানে প্রহসিত করা হয়েছে, তেমনই অধিকাংশ সময়ে বৃন্দাবনবাসী পরম বৈষ্ণব কর্তামশায় এবং তাঁর প্রতিনিধি উৎকোচাসক্ত বৈরাগীও এখানে প্রহসিত। তখন সমাজে দুই

প্রকার বিকৃতি বিরাজ করছিল। এই প্রহসনে কিছু বিকারগ্রস্ত ধর্মভীরু এবং সংস্কার অনাসক্ত কিছু নব্য-যুবকদের মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির আধিক্য দেখানো হয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারে প্রবল আলোড়ন ঘটলেও সমাজে অন্দরমহলে তা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজা রামমোহনের মাতা রামমোহনকে তাঁর গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। রামমোহনের স্ত্রী এতবড় একজন মানুষের সহধর্মিণী হলেও স্বামীকে তিনি কখনও অনুসরণ করতে পারেননি। অথচ রামমোহনের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে হিন্দুসমাজ তাঁর শ্রাদ্ধে প্রচন্ড বাধা দান করেছিলেন। ফলে বাইরের জগতে পুরুষেরা চিন্তা ও চেতনায়, কর্মে ও সংস্কারে অগ্রগামী হলেও নারীজীবনের বিড়ম্বনা যেন একরূপই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। নারীসমাজ যেন প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো নিজ নিজ স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' এই যেন তাদের বিচার। তবে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলে কিংবা বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে একেবারেই কোনো সাড়া পড়েনি এমন কথা বলা ঠিক নয়। এ বিষয়ে নারীসমাজের মধ্যেও একটা চেতনা এবং আলোড়ন সীমাবদ্ধ হলেও ছিল। অন্তত তার খবর পৌঁছে গিয়েছিল বহুদূরব্যাপী। সেজন্য আমরা দেখি নারীরা নিজেদের মধ্যে হলেও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। তবে একথা ঠিক যে, তখন তাদের মধ্যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টা ছিল ক্ষীণ।

আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে আমরা যে কয়টি নারীচরিত্রের উপস্থিতি পাই তাদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণির নারীদের অবস্থান দেখি গৃহের অভ্যন্তরে। কোনো রকমের মত প্রকাশের অধিকার তাঁদের নেই। তৎকালের পুরুষশাসিত সমাজে এটাই ছিল নিয়ম। তবে এ নাটকেও নববাবুর জননী গৃহিণী স্বামীকেই অনুসরণ করেন। তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই। ফলে পুত্র যতই অন্যায় করুক না কেন তাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবন।

কিন্তু এ যুগের শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রীদের অবস্থান অত্যন্ত করুণ। নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী, সংসারে তাঁর কিছুই করবার নেই। মাতাল ও বেশ্যাসক্ত স্বামীর স্ত্রী এবং রক্ষণশীল পরিবারের কুলবধূ হরকামিনীর একমাত্র অবলম্বন আত্মগ্লানি। সমাজে নারীর যে কী নিগ্রহ হরকামিনী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সংসারে তাঁর নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। শুধু দাসত্ব করাই তাঁর জীবনের পরিণাম। নববাবুর বোন

প্রসন্নময়ী বহুবিবাহিত কুলীন স্বামীর পরিত্যক্তা বঞ্চিতা নারী। সমাজের বহুবিবাহের বলি। কৌলীন্যপ্রথার এক বিভীষিকা। বহুবিত্তের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রক্ষণশীল বৈষ্ণব পরিবারের মেয়েরা বয়সের তুলনায় অবিবাহিতা, লেখা-পড়া না জানা দুই মেয়ে—তারা পাকা খেলোয়াড় এবং কৌতূহলী। এরাও পরাধীন।

এদের তুলনায় নিম্নশ্রেণির নারী যারা দেহব্যবসা করে তারা অনেক স্বাধীন। জীবিকার স্বাধীনতা থাকলেও সমাজে তাদের সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই। এদের মধ্যে যারা নাচে-গানে দক্ষ, তাদের একটা পৃথক ভূমিকা আছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে তারাও বারবণিতা সম্প্রদায়ভুক্ত। রস ও রসিকতা করেই তারা তাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সমাজের চোখে এরা হচ্ছে পণ্যানারী। মানুষ হিসাবে তাদের অবস্থান হেয় প্রতিপন্ন হয়। এইসব চরিত্রের মধ্যেও তৎকালীন সময়ের অবক্ষয়ের দিক পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের কী অবস্থায়, কোন পরিপ্রেক্ষিতে নারী এই পণ্যজীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল তার কোনও পরিচয় আমরা এ নাটকে পাই না। এখানে তাদের পরিচয় কেবল মাত্র রসিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মাইকেল তাঁর এই নাটককে প্রহসন বলেই অভিহিত করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এই নাটকের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতাকে সেভাবে পাই না। তবুও মধুসূদন এই নাটকে যে কয়টি নারী ও পুরুষ চরিত্র উপস্থাপন করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিত্বমূলক। এই নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন, "ইয়ংবেঙ্গল" অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্‌ঘাটনই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে,......ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদয়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নববাবুদিগের দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' এখানে প্রহসন রচিত হইয়াছে তৎকালীন জীবন চরিত্র নিয়ে এবং সেটাও একটা শিক্ষিত নব্য যুবসমাজকে কেন্দ্র করে। তবে যুগ বিচারে এই সমাজ অনেক এগিয়ে এসেছে।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সিপাহি বিদ্রোহের তিন বছর পরে মধুসূদনের নাগরিক শিক্ষিত সমাজের অবস্থান নিয়ে লেখা 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মতো গ্রামীণ সমাজের অবস্থা নিয়েও তাঁর আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ১৮৬০ সালে রচিত হয়। এই প্রহসনের মধ্যে এক দিকে প্রবল প্রতাপশালী জমিদার শ্রেণির শোষণ, অত্যাচার, অবিচার এবং ধর্মের নামে ব্যভিচার এবং অন্যদিকে অত্যাচারিত দুর্বল প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইংরেজ সরকার ক্ষমতা লাভের পর ভূমি-রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করবার জন্য 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। তার ফলে গ্রাম বাংলায় এক শ্রেণির নতুন ভূস্বামীর আর্বিভাব ঘটে। এই আইনে জমিদার ও তালুকদারেরা জমির মালিক বলে ঘোষিত হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে (সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত) সরকারি খাজনা মিটিয়ে দেবার বাধ্য-বাধকতা ছাড়া এদের ওপর সরকারের বড় বেশি নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

রাজস্ব সংগ্রহার্থে—"অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদায় শস্য শুষ্ক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছন্নে যাউক, রাজস্বদানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই হইবে।" (দ্র. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১১৭)।

নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করে সরকারি রাজস্ব জমা দেবার জন্য ভূস্বামীরা নানাভাবে রায়তদের শোষণ করে বহু বিত্তের এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতেন। অত্যাচার ও পীড়নের দ্বারা গরিব চাষিদের থেকে পাওনা কড়ায়গন্ডায় তাঁরা উশুল করে নিতেন। খাজনা আদায় ছাড়াও নানা অজুহাতে বাড়তি টাকা আদায় করা হত। প্রজাদের থেকে কিভাবে ভূস্বামীরা খাজনা আদায় করতেন সরকার তা দেখেও দেখতেন না। থানা-পুলিশ, আইন-আদালত বস্তুত জমিদারের সহায়ক ছিল এই অপ্রতিহত ক্ষমতা তাঁদের যেমন করেছিল নিষ্ঠুর, নির্মম, প্রজাপীড়ক তেমনই করেছিল লোভী ও লম্পট।

এই রকম একটি ভূস্বামী চরিত্রকে কেন্দ্র করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক অপূর্ব প্রহসনখানি রচিত হয়েছে। মধুসূদন

গ্রামবাংলার জমিদার পরিবারের মানুষ। এই প্রহসনে বর্ণিত ঘটনাবলি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলা যায়। ফলে এটি তৎকালীন পল্লীবাংলার বাস্তব চিত্র বলে মান্য।

পল্লীসমাজে প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। গরিব প্রজারা সময় মতো খাজনা দিতে না পারলে চোদ্দ পুরুষের জোত-জমি, ভিটে-মাটি, ঘর-সংসার থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হত। সাধারণত দুর্বল প্রজারা নতজানু হয়ে জমিদারের করুণা ভিক্ষা করত। কিন্তু জমিদারের করুণার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং নিরাশ্রয় হবার ভয়ে তারা জমিদারের অন্যায় দাবি ও পীড়ন বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে বাধ্য হত। অন্যদিকে দুষ্ট চরিত্রের স্বার্থপর মানুষ আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে অথবা সামান্য সুবিধার বিনিময়ে ভূস্বামীদের অনাচার ও ভ্রষ্টাচারের সহায়ক হত।

আলোচ্য প্রহসনে গাঁয়ের প্রবীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদ। প্রভূত অর্থবল, জনবল এবং প্রচ্ছন্ন সরকারি সহায়তাপুষ্ট জমিদাররা যেমন ছিলেন অত্যাচারী, তেমনই ছিলে ব্যভিচারী। এদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র এই ভক্তপ্রসাদ। আচার-ব্যবহারের বহিরাবরণে ধার্মিক মানুষের মতো। জপ-তপ, ফোঁটা-তিলক, গায়ে নামাবলি, মুখে হরি হরি রব; এটা ছিল তাঁর বাইরের আবরণ, ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন অর্থগৃধ্নু, পরস্ত্রীতে আসক্ত, কামুক। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল দ্বিচারিতা। তিনি নিজে জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঊর্ধ্বে পাপকার্যে লিপ্ত অথচ পুত্রের ধর্মানুমোদিত জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হিন্দুয়ানা রক্ষা করতে উচ্চশিক্ষা সংকুচিত করতে প্রস্তুত। এই ঘটনার মধ্যে তৎকালের গড়পড়তা মানুষের চিন্তা, চরিত্র এবং সামাজিক অবস্থার আভাস মেলে।

জমিদার ভক্তপ্রসাদের দরিদ্র রায়ত হানিফ গাজি, অজন্মার দরুন পুরো খাজনা পরিশোধ করতে অপারগ হওয়ায় সে জমিদারের নিকট আংশিক খাজনা মকুবের জন্য প্রার্থনা জানায়। হানিফের শত কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও জমিদার খাজনা মকুব করতে অস্বীকার করেন। পরন্তু তিনি হানিফকে জমিদারের জিম্মায় আটক করার জন্য অনুচর গদাধরকে হুকুম দিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে গদাধরের নিকট হতে ভক্তপ্রসাদ জানতে পারলেন যে, হানিফের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে অসাধু উপায়ে ভোগ করবার সুযোগ আছে তখনই লম্পট জমিদার হানিফের বাকি খাজনা মকুব করে দেন।

জেল-হাজতের সমূহ বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ান্তর না দেখে গরিব হানিফ গদাধরকে ধরে-পড়ে পীড়াপীড়ি করলে গদাধরও চট জলদি যেন

একটা সুযোগ পেয়ে গেল। যেহেতু ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যগিরির সহায়ক গদাধর সে জন্য তাঁর দুর্বলতার কথা গদাধরের অজানা নয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গদাধরও ভক্তপ্রসাদের কাছে সেই অব্যর্থ টোপটি ফেলেছিল, এবং সেটা কাজে লাগিয়ে হানিফও সে যাত্রা হাজতবাস থেকে রেহাই পেল। তৎকালে গদাধরের মতো চাটুকার হীনচরিত্রের লোকের অভাব পল্লিগ্রামে ছিল না।

অন্যদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অন্ধ-কুসংস্কার দূরীকরণের দ্বারা বাঙালিসমাজেও ঘটছিল একটি প্রকৃষ্ট অগ্রগতি। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬) আইন সিদ্ধ হলেও পল্লীগ্রামে সনাতন রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়িতে হিন্দুসমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকার জন্য তা মান্য ছিল না। এই সমাজে কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন থাকায় বালবিধবাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। অসহায়া বিধবাদের মূলত ভরণ-পোষণের অভাব হেতু অনেকে পুঁটি (কুট্টিনী) হয়ে যেতে বাধ্য হত। অতিক্রান্ত যৌবনে এরাই জীবিকার প্রয়োজনে উৎকোচের বিনিময়ে লম্পটদের কুট্টিনীর কাজে বহাল হত। আলোচ্য প্রহসনে পুঁটি (কুট্টিনী) গদাধরের পিসি। ভাইপোর সহায়তায় পুঁটি এতটা বয়সেও ভক্তপ্রসাদের কুট্টিনীর কাজ করে খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

গদাধর জানে হানিফ গাজির বিবি ফতেমাকে হাত করা তার পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। তার পিসি পুঁটি ভক্তপ্রসাদের কুট্টিনীর কাজ করে চুল পাকিয়েছে। এ কাজ যদি কেউ পারে তবে সে তার পিসি পুঁটি। এই পুঁটি চরিত্রের উদাহরণ থেকে পল্লীবাংলার সমাজের বিচিত্র জীবন যাত্রার চিত্র পাওয়া যায়।

পল্লীগ্রামে কৃষিজীবী মুসলিম সমাজের নারীদের অবস্থান স্বতন্ত্র। হিন্দুনারীর মত রক্ষণশীলতার বন্ধনে তারা আবদ্ধ নয়। তাদের পৃথক একটা সমাজ আছে যা ধর্মীয় আচরণে আচ্ছন্ন। তবে হিন্দুনারীর তুলনায় তারা অনেকটাই স্বতন্ত্র। সমাজবন্ধন শিথিল থাকায় তাদের মধ্যে হিন্দুনারীর মতো সংস্কার ছিল না। পদস্খলন ঘটলেও সমাজে কুলটা হবার ভয় তাদের নেই। বিধবা হলে তারা আবার 'নিকা' করে। স্বামীর 'তিন তালাকনামা'য় মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীন ভাবে ঘর-সংসার নির্বাহ করে। ঘরে বাইরে খেটে খায়। প্রয়োজনে স্বামীর সঙ্গে মাঠেঘাটে কাজ করে। এতে তাদের অসম্মানের কিছু নেই। কাজেই হিন্দুনারীদের মতো তারা ঘরকুনো নয় এবং নিজেকে অতটা অসহায়ও মনে করে না। হিন্দু-নারীর ক্ষেত্রে স্বামী যেমন চরিত্রেরই হোক না কেন, দেবতার আসনে বসিয়ে

নারী তার হৃদয়ের ধর্ম দ্বারা তাঁকে মান্য করে। কিন্তু মুসলিম নারীরা পুরুষের যোগ্যতানুসারে স্বামীকে মান্য করে। ব্যবহারিক জীবনে এই রকম যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের উপর তারা আস্থা রাখে। এই আস্থার বলেই আলোচ্য নাটকের নায়িকা ফতেমা ভক্তপ্রসাদের কুট্টিনীর কুপ্রস্তাবে রাজি হয়নি। পরন্তু তার বলিষ্ঠ যুবক স্বামীকে লম্পট জমিদারের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিয়েছিল। ফতেমা দরিদ্র হানিফ গাজির বিবি হতে পারে, কিন্তু সে যথার্থই তার স্বামীকে ভালোবাসে। লোভের বশীভূত হয়ে সে তার দাম্পত্য সুখের নীড় নষ্ট করতে রাজি নয়। আর লোভী নয় বলেই সে তার নারীধর্মকে রক্ষা করা শ্রেয়তর মনে করেছে।

সিপাহি বিদ্রোহ এবং সমসময়ের নীল বিদ্রোহের ঢেউ বাংলায় এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক জনমানসে এর কিছু প্রভাব পড়েছিল। নারীসমাজে চিন্তা-চেতনা বিকাশ লাভ করেছিল, সামগ্রিকভাবে গ্রাম্যসমাজকে প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখা যায় দুশ্চরিত্র ভক্তপ্রসাদকে সমুচিত শিক্ষা দেবার প্রয়াসে নিরাশ্রয় বাচস্পতির সহায়তায় স্বামীর ফাঁদ পাতবার কাজে ফতেমা সাহসের সঙ্গে সেই কঠিন কাজের সামিল হয়েছিল। সে জানে স্বামী তাকে প্রচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করছে তবুও নারী হিসাবে অন্তরে তার যে ভয় সেটা তার ইজ্জৎ হারানোর ভয়। গভীর রাত্রের নির্জন জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এক লম্পটের মুখোমুখি হয়ে নিজের নারীধর্মকে রক্ষা করার জন্য সে কুট্টিনীকে বলেছিল, "ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে......। ......না ভাই, মুই তোর কড়িপাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।"—ফতেমার এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তার এই যে সংগ্রাম এটা তাকে বলিষ্ঠ প্রতিবাদীচরিত্রে উন্নীত করেছে। এটাই ফতেমাচরিত্রে গতিশীলতা এনেছে।

পল্লিবাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস। মুসলমান চাষি সম্প্রদায় দরিদ্রতর। এদের সমাজও রক্ষণশীল। কিন্তু বন্ধন শিথিল বলে জাতিভেদ, বাধা-নিষেধ অনেক কম থাকায় হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের প্রতিবাদী হওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল। বাচস্পতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দেনার দায়ে ভক্তপ্রসাদ তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। মাতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পালন করার সঙ্গতিও তাঁর নেই। এই দুঃসময়ে জমিদারের কাছে কৃপা ভিক্ষা করায় কৃপার পরিবর্তে

ব্রাহ্মণ হয়েছেন লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত। দারিদ্র্য হেতু জমিদারের অত্যাচার, অবিচার তাঁকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ভক্তপ্রসাদের কুপ্রস্তাবের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রতর যুবক হানিফ তার শিথিল সমাজব্যবস্থার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিকারে অগ্রসর হতে পেরেছে। বঞ্চিত বাচস্পতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। যথাস্থানে যথাসময়ে ব্রাহ্মণের পরিকল্পনা মতো কাজ করে তারা ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যগিরির উপযুক্ত শিক্ষা তাকে দিতে পেরেছে। উপায়ন্তর না দেখে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য প্রবীণ জমিদার উৎকোচের বিনিময়ে বাচস্পতি ও হানিফের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে বেইজ্জতি থেকে সে যাত্রা রেহাই পেতে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে।

ইংরেজ সরকার পল্লীবাংলার কুটির শিল্প ধ্বংস করে দিলে তাঁতি শ্রমিকরাও চাষীদের মত গরিব ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তেলি প্রভৃতি জাতির অবস্থা খারাপ ছিল না। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে মোটামুটি সংগতিসম্পন্ন ছিল। আলোচ্য নাটকে পীতাম্বর তেলির স্ত্রী ভোগীর কথোপকথন থেকে জানা যায়— তার মেয়ে পঞ্চীর বিয়ে হয়েছে, "খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী। ......জামাইটি দেখতে বড় ভাল, আর কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শেখে।" সুতরাং ভোগীরা বহুবিত্তের অধিকারী না হলেও খেয়ে পরে সুখে আছে। কিন্তু বকধার্মিক ভক্তপ্রসাদের লালচ-দৃষ্টি থেকে অনেক সময় পঞ্চীদের নিরাপত্তা বিনষ্ট হত। ভক্তপ্রসাদ গ্রামসুবাদে পঞ্চীর জ্যাঠামশাই। মায়ের কথায় সে জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে। পঞ্চী বলে, (স্বাগত) "ওমা! এ বুড়ো মিনষে ত কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি? ও মা! ও কি গো! এ.যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্!"

পঞ্চীর এই উক্তি থেকে সেই সময়ের নারীর অবস্থান কিছুটা বোঝা যায়। নারী তখন ভোগ্যবস্তু হিসাবেই বেশি গণ্য হত। পুরুষের চোখে নারীর শরীরটাই ছিল আসল। পঞ্চী ভক্তপ্রসাদের গ্রামেরই মেয়ে এবং স্নেহাস্পদও বটে! কিন্তু তার প্রতিও ভক্ত প্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। "ছুঁড়ির নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে, এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি, তবে আর কিসে পারবো?" তেলি ভোগীর মেয়ে পঞ্চী বাপের বাড়িতে একমাস থাকবে। তাই ভক্তপ্রসাদ তার সম্পর্কে নানা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে পঞ্চীর পিতা পীতাম্বর নুনের জন্য কেশবপুরের হাটে গিয়েছে।

কাজেই পীতাম্বর ফিরে না আসতেই তিনি তাঁর নিজের মতলব সিদ্ধ করার চিন্তা করেছেন। ভক্তপ্রসাদের এই চরিত্র নতুন নয়। ভটচায্যিদের মেয়েকেও তিনি এমনি করে নষ্ট করেছিলেন। তারপরে সে বাধ্য হয়ে 'বাজারে' হয়ে পড়েছিল। ভক্তপ্রসাদ অশিক্ষিত গ্রাম্যজমিদার নন। কুলযুবতী দেখলে তার মনে বৈষ্ণব কবিতা 'মরালগমিনী'র কথা মনে পড়ে। তিনি নিজেই অনেক কবিতার ছত্র আবৃত্তি করেন।

তার অনুচর গদাধর যখন হানিফের বাকি খাজনা মুকুবের জন্য মনিবকে পীড়াপীড়ি করছিল, তখন সেই-ই হানিফের নিঃসন্তান বছর উনিশ বয়সের সুন্দরী রূপবতী বিবি ফতেমার কথা উল্লেখ করেছিল। তখন গ্রামে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা ভেদ বর্তমান ছিল। ভক্তপ্রসাদ ফতেমার কথা শুনেই বললেন, "সে তো মুসলমান, যবন, ম্লেচ্ছ",?—শেষকালে কি তিনি তাঁর পরকালটা নষ্ট করবেন। তাছাড়া তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্লেন, "মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্-ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি আসে।"

গদাধর ভক্তপ্রসাদের চরিত্র জানে। তাই সে বলে, "মহাশয় মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি আমাকে কতবার বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।"

ভক্তপ্রসাদের কাছে নারীই লক্ষ্য। সেখানে জাত, ধর্ম, উঁচু-নিচু কোন বিচার নেই। ভক্তপ্রসাদ বলেন, "স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও পাওয়া যাচ্ছে। .....টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।" গদাধর বলে, "কত্তাটি এমনি খেপে উঠলেই তো আমরা বাঁচি—গো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।"

শেষ পর্যন্ত হানিফের বিবি ফতেমার প্রতি ভক্তপ্রসাদ আসক্ত হয়ে পড়লেন। এই কাজে তিনি পুঁটিকে কাজে লাগিয়েছেন। পুঁটির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সে 'কুট্টিনী মাগী' বলে গ্রামে পরিচিত। সে ভক্তবাবুর আদেশ পালন করে থাকে। এছাড়া অবশ্য তার কোনো গতিও নেই। সে নিজেই বলে, "ভক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে? এত যে বুড়ো, তবু আজো যেন রস উৎলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কম্ম কচ্যি, এতে যে কত কুলের ঝি-বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি, তার কিছু ঠিকানা নাই।" অথচ এদিকে ভক্তপ্রসাদ পরম বৈষ্ণব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান, ফি সোমবার

হবিষ্যি করেন। এ সবই তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। হানিফ ঠিকই বলে, "এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইয়ৎ বেচারিগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে লিয়ে তার পর এই করে।"

এঁরা ধর্মকেও একটা বাইরের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে। ভক্তপ্রসাদের ইচ্ছা মতোই পুঁটি ফতেমাকে নিয়ে পুকুরের ধারে ভাঙা শিবের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেদিন ভক্তপ্রসাদের সাজসজ্জার খুব পরিপাট্য ছিল। শান্তিপুরের ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো, মাথায় তাজ, আতরের ভুর্ ভুর্ গন্ধ। ফতেমাকে দেখে ভক্তপ্রসাদের মনে হল, "এ যেন তার মনোমোহিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এ যে আঁস্তাকুঁড়ে সোনার চাঙ্গড়। যবনী হল তা বয়েক গেল।" শিবমন্দিরে প্রবেশ করতে তাঁর সংস্কারবশত একটু ইতস্তত ভাব। কিন্তু পরক্ষণেই বলেন, "ভগ্নশিবের তো শিবত্ব নেই। তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করাই বা কোন ছার।"

তবে এই নাটকে কেবল নারীর ইজ্জৎহানির বর্ণনাই নেই; তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের কথাও আছে। সে প্রতিকার এসেছে হানিফের মাধ্যমে। ভক্তপ্রসাদ হানিফের হাতের মুষ্ঠাঘাতে ধরাশায়ী এবং তার কাছে নাকে-কানে খত্ দিয়ে এই জঘন্য কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অঙ্গীকার করে লাম্পট্যগিরি থেকে রেহাই পায়। নাট্যকারের কাছে এই প্রতিকার বড় হল। আমাদের কাছে এই নাটক প্রহসন হলেও কিছু বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এর মধ্যে গ্রাম্যজীবনের অবস্থা এবং সেখানে নারীর অবস্থানের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এই কারণে এই নাটক আমাদের কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকের মধ্যে তৎকালীন সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় সেটা আমরা উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত তৎকালীন সমাজ সংস্কারের কথাও এই নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। ভক্তপ্রসাদের একটি ছেলে ছিল। তার নাম অম্বিকা। অম্বিকা কলকাতায় থেকে হিন্দু কলেজে পড়ে। এই গ্রামে আনন্দ নামে একটি ছেলেও কলকাতায় পড়ে। ভক্তপ্রসাদের ধারণা, তাঁর ছেলে অম্বিকা কোনো অর্ধম আচরণ করতে পারে না। ভক্তপ্রসাদের এই সব কথাতেই তখনকার শিক্ষিতসমাজের অবস্থার কথা জানা যায়। এই শিক্ষিতসমাজ তথাকথিত জাতিভেদ মানে না। তখন কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোনার বেনে, কপালী, তাঁতি, জোলা, তেলি, কুলু সকলেই একত্রে ওঠে বসে খাওয়া দাওয়া করে।

কলকাতায় বড় বড় হিন্দু সকলেই মুসলমান বাবুর্চি রাখেন। অর্থাৎ হিন্দু হয়েও

মুসলমানদের ভাত খেতে এদের কোনো আপত্তি নেই। এ সবই ইংরেজি শিক্ষার ফল। পীতাম্বর তেলির মেয়ে পঞ্চীর বিবাহ হয়েছে তৎকালীন কলকাতাবাসী এক ছেলের সঙ্গে। সেখানে থেকে তার বর লেখাপড়া শেখে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটক আলোচনা করার সময় আমরা তৎকালীন সমাজে এই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আসলে উনিশ শতকের ৬০-এর দশকের শেষভাগে কলকাতার সমাজের আত্মগৌরবমূলক একটি জাতীয়তাবাদী সচেতনতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এরা নিজেদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল একটি প্রতিবিম্ব রচনা করতে গিয়ে ধর্ম, দেশাচার ইত্যাদি বহু বিষয়ে আত্মসমালোচনা শুরু করেন। ফলে এই সময়ে সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও দেশপ্রেমমূলক শত শত নাটক এবং প্রহসন রচিত হয়।

এই নাটকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তখন সমাজের মধ্যে যে একটা চেতনা দেখা দিয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ আন্দোলনের মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ। অবশ্য জাতিভেদ বিষয়ে সংঘবদ্ধ আলাপ আলোচনা প্রথম রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'তেই দেখা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন জাতিভেদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি মানুষ মাত্রকেই মনে করতেন ব্রহ্মের সন্তান। জাতিভেদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য রামমোহন মৃত্যুঞ্জয় আচার্যের 'বজ্রসূচীর' বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রাস্ট ডিড রচনা করেন তাতেও জাতিভেদ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মসমাজেও জাতিভেদ সংস্কার পূর্ণমাত্রায় দূর হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদের সংস্কার দূর করবার জন্য কেশবচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহ এবং উপবীত বর্জন কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।

এই নাটকেও আমরা দেখি জাতিভেদ প্রথা অনেক শিথিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভক্তপ্রসাদ মুসলমান রমণী ফতেমার প্রতি আসক্ত। আবার ভক্তপ্রসাদের বিরুদ্ধে হানিফ এবং বাচস্পতি মিলিত ভাবেই জমিদারের অন্যায়ের প্রতিকারের করতেই উদ্যত হয়েছিল। কিছু কিছু সংস্কার বর্তমান থাকলেও তা তেমন তীব্র ছিল না। আর একটা দিক এ নাটকে প্রতিবাদী চরিত্র পুঁটির কথায় জানা যায়;—ভক্তপ্রসাদ তিরিশ বছর ধরে নারীদের তাঁর ভোগের কাজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাঁর অবসান হল হানিফ এবং বাচস্পতির হাতে প্রকাশ্য লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে।

আর একটি কথা—তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। ভক্তপ্রসাদের মত গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষও তাঁর পুত্রকে কলকাতার 'হিন্দু কলেজে' পড়াতে বাধ্য হয়েছে। তবে ভক্তপ্রসাদ মনে-প্রাণে তাঁর পুরনো সংস্কারকে আঁকড়ে থাকতে চায়। তাঁর বিশ্বাস 'ইংরেজি শিক্ষা' সকল অনর্থের মূল। সেইজন্য সে অম্বিকাপ্রসাদকে কলেজ ছাড়িয়ে দিতে চায়। এই নাটকে দুই বিপরীতমুখী আদর্শের সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীরা বিত্তবানদের লালসার শিকার হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের এবং সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চী এবং ফতেমার উক্তির মধ্যে তার পরিচয় আছে। এমনকি কুট্টিনী কার্যে রত পুঁটিও স্বীকার করেছে, "এছাড়া তার অন্য উপায় নেই।" এর মধ্যে নারীর অসহায়বোধও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আবার একই সময় সমাজের মধ্যে যে নতুন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, সমাজ সংসস্কারের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছে তা এই প্রসহন রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন বৃদ্ধের লালসাকে প্রচণ্ড কৌতুকবহ করে তুলেছেন। তাঁর আসল লক্ষ্যই ছিল ফরাসি নাট্যকার মলিয়রের মতো ভণ্ডামির আবরণ উন্মোচিত করা। এই প্রহসনে তৎকালীন সমাজপতিদের ভণ্ডামি এবং নারীচরিত্রের সংলাপের মধ্যে নারীসমাজের অবস্থানের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

নীলদর্পণ

'একেই কি বলে সভ্যতা? এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' মধুসূদনের এই দুখানি প্রহসনের সঙ্গে একই সালে (১৮৬০) রচিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নাটকের পটভূমিকায় আছে নীল-চাষিদের বিদ্রোহ। সিপাহি বিদ্রোহের পরে ভারত শাসনের ভার যখন 'ঈষ্ট-ইন্ডিয়া' কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে যায় তখন এই নাটক রচিত হলেও যে সময়টাতে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন একটা জাতীয় বিদ্রোহের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল, ঠিক সেই সময় ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ।

'নীলদর্পণ' দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের মধ্যে আমরা যে সমাজের চিত্র দেখতে পাই তা হল একদিকে নীলকর সাহেবদের নৃশংস অত্যাচারে জর্জরিত পল্লিবাংলার কৃষক সমাজের দুর্দশার চিত্র; অপরদিকে ইংরেজ সরকার পুষ্ট মুনাফালোভী শোষক বিদেশি নীলকর গোষ্ঠী। একদিকে নীলকরদের অমানুষিক শোষণ ও নিপীড়ন অন্যদিকে শোষিত বঞ্চিত সর্বহারা চাষিদের ব্যথা বেদনার করুণ চিত্র নাটকখানিতে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শতকের প্রথমদিকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত ইংল্যান্ডের কাঁচা মালের উৎপাদনের ক্ষেত্র ও শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের বাজাররূপে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে। আর সেই জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কাঁচামাল লুণ্ঠনের জন্য ধীরে ধীরে ভারতকে তাদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করে। আর এই উপনিবেশ ব্যবস্থায় ইংরেজ অতিমুনাফা তথা শোষণের উপায় স্বরূপ নীলচাষের পত্তন করে। ইংরেজ ও বাঙালি জমিদার গোষ্ঠীদ্বয় আর নীলকর চাষিদের লাল রক্ত শুষে নীল করে দিল; আর এই নীল থেকে একচেটিয়া মুনাফার পাহাড় তুলল। নীলকর সাহেবরা মোটা টাকা দিয়ে জমিদারদের নিকট হতে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমি লিজ নিয়ে নীলের চাষ আরম্ভ করল। অগ্রিম কিছু দাদন দিয়ে চাষিদের বাধ্য করল ক্রীতদাস হতে। এইসব জঘন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে যদি কোনো চাষি আপত্তি জানাত তবে তাকে শায়েস্তা করার জন্য ছিল লাঠি, চাবুক, বরকন্দাজ, বন্দুক আর জেল। এই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল না দিতে পারলে তাদের উপর চালানো হত অমানুষিক নির্যাতন, জরিমানা আর আজীবন দাসত্ব। এরপর ছিল কৃষক-কন্যা

এবং চাষি-বৌদের জবরদস্তি ধরে কুঠিতে তুলে নিয়ে বিনা বাধায় ধর্মভ্রষ্ট করার অজস্র ঘটনা।

নীলকরদের হাতে ছিল পাইক, বরকন্দাজ, কয়েদখানা নানা প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা। যে সব চাষিরা এই জুলুমবাজির বিরোধিতা করত, নির্দ্ধিধায় নীলকরদের বন্দুকের গুলিতে তাদের প্রাণনাশ হত। নীলকর দস্যুরাই ছিল তখন বাংলার আসল শাসক ও মালিক। এইভাবে গ্রামবাংলার নিরীহ চাষিদের উপর চলতে লাগল নীলকর সাহেব তথা সামন্ত-প্রভুদের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা। নীলকরদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে সোনার বাংলা ছারখার হয়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট আদালতে বিচারের নামে প্রহসন হয়, বিচার হয় না। এমতবস্থায় বৃথা সময় নষ্ট না করে নীলকরদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নীলচাষিরা একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'নীলদর্পণ' এই রকম একটা সময়ের চিত্র যা দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্কিত করেছেন। তৎকালীন ইতিহাস থেকে এই নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, "নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন; বলপূর্বক তাহাদিগের আদেশানুসারে কার্য করিতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া বসিয়া অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন (পৃ. ২২১)। নীলকররা কেবল চাষিদের উপরে জুলুম করে ক্ষান্ত হতেন না। জমিদারদেরও তারা ছেড়ে দিতেন না। নদিয়া ও যশোরের জমিদার লতাফত হোসেন তার একটি সুন্দর উদাহরণ। কাঁচিকাটা ও সিন্দুরিয়া কুঠির নীলকররা অনেকদিন থেকে তার বড় ভাইদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেবার চেষ্টা করছিল। তার ভাইরা যখন মারা যান তখন লতাফত বালক ছিলেন—এই সুযোগে কাঁচিকাটার নীলকর লতাফতের বড় ভাই তাকে জমি ইজারা দিয়ে গেছে এই দাবি জানিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নালিশ করল। আদালতে নীলকরের পাট্টা জাল বলে প্রমাণিত হল। আদালতে হেরে গিয়ে নীলকর ৩০০ লাঠিয়াল নিয়ে লতাফতের কাছারি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দিল। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নীলকরদের কয়েকজন লোকের সামান্য শাস্তি হল। অনবরত দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে থাকল। ১৮৪৬ সালে নীলকরদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালরা লতাফতকে আক্রমণ করে তাঁর তিনজন লোককে খুন করল। জখম করল আরও অনেককে। আদালতে আবার নীলকরদের কয়েকজন লোকের সামান্য শাস্তি

হল। এর কিছুদিন পর ৭২৫ বিঘা, ৫৫০ বিঘা ও ৩৫০ বিঘা জমি দাবি করে আদালতে নীলকর আবার হাজির হল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নীলকররা ৩৯০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে লতাফতের বিরুদ্ধে আরও একটা মামলা আনল। (দ্র. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ—প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, পৃ. ৫৬-৫৭)।

নীলকরদের এসব জুলুমের পিছনে একটা বল ছিল। সরকার তাদের সহায়। মফঃস্বলের ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রায় সকলেই তাঁদের বন্ধু ছিলেন। সরকার অনেক নীলকর সাহেবকেই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিয়েছিলেন। এমনি করে নীলকররা নানাভাবে জমিদার ও নীলচাষিদের উপর নানা রকম জোরজুলুম ও অত্যাচার করত। 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে এইসব অত্যাচারের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তখন রায়ত এবং জমিদারের সঙ্গে নীলকরদের দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই থাকত। এইসব কারণে ১৮৬০ সালে ব্যাপকভাবে নীলচাষিদের বিদ্রোহ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে বহু জমিদারও নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছেন। অনেক জমিদার নীলকরদের কাছে মাথা নত করেননি। যশোর জেলার নড়াইলের রামরতন রায় ছিলেন এমন একজন উল্লেখযোগ্য জমিদার। কৃষ্ণনগরের নিকট চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। বিষ্ণুচরণ ছিলেন একজন ছোট জোতদার এবং দিগম্বর একজন ছোট মহাজন। তাঁরা দুজনেই কিছুকাল বিভিন্ন কুঠিতে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচারের ফলে আত্মসম্মান বজায় রেখে বেশিদিন সে কাজ করতে পারেন নি। ক্রমশ তাঁরা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তাদের সংঘবদ্ধ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এই নীলবিদ্রোহ সেই সময়ে কেবলমাত্র কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষিত বাঙালিকেও তা বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই আলোড়নের অন্যতম ফল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলপদর্পণ' নাটক।

দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগে কাজ করতেন এবং কাজের জন্যই তাঁকে নদীয়া ও যশোরের শহরে ও গ্রামে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষকদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। আবার পোস্ট অফিসের কাজে তাঁকে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে আসতে হয়। এই নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন, সাধারণ নর-নারীকে আন্তরিক

শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়ে নাটকে স্থান করে দিয়েছেন। আমরা এই নাটকে প্রথম গ্রামবাসীদের আন্তরিক পরিচয় লাভ করি।

এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য যদিও নীলকরদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, শোষণ, তাদের দৌরাত্ম্য, ব্যভিচার ও লাম্পট্যের দুঃসহ কাহিনী বর্ণনা করা তবু তার মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজচিত্র এবং নারীর অবস্থানও জানতে পারি। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নীলকরের আমিন সাধুচরণের মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখে বলেছে, "এই ছুড়ি তো মন্দ নয়, ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেশকারী পেলাম। তা একে দিয়ে পাব.......।"

এতে দেখা যায় দেশের মানুষরাই—কুঠিয়ালের কর্মচারীরাই উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়ালদের লালসার মূলে ইন্ধন যোগাত। আমিন এ কাজে নতুন ব্রতী নয় কিংবা সে একাও নয়। এরা ধর্মাধর্ম বর্জিত সম্পূর্ণরূপে আত্মমর্যাদাশূন্য। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা নিজেদের বোনকে পর্যন্ত প্রভুদের হাতে তুলে দিতে ইতস্তত বোধ করত না। এরা তথাকথিত মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত। এরা ছিল বণিকদের ঘৃণ্য কেনা গোলাম; ক্রীতদাসের চেয়েও অধম। নীলকররা জোর করে কৃষকদের ভূমিদাস করে ফেলেছিল। তার বিরুদ্ধে তারা প্রাণপণ লড়াই-এ ব্যস্ত কিন্তু এই মধ্যবিত্তরা স্বেচ্ছায় টাকার লোভে গোলামি করত। বিদেশির লুণ্ঠন কার্যে, নিজের দেশের লোকের উপর অত্যাচারে বিদেশিদের সাহায্য করত। এই প্রকার নানা দুষ্কর্ম করে টাকা ও সম্পত্তি আয়ত্ত করত।

'নীলদর্পণে'র অন্যান্য নাট্যকাহিনীর মত ক্ষেত্রমণির কাহিনী একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই ঘটনার বৃত্তান্ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণিকে নীলকর আর্চিবল্ড হিলের লোকেরা হরণ করে নিয়ে যায়। ৯ মার্চ তারিখে মাথুর বিশ্বাস নদিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, আর্চিবল্ড হিলস, বিমান সিং, মধু সিং, জুড়ন সিং, আদিত্য বিশ্বাস, সুকুর মহম্মদ, কুতুবদ্দী তাকিদগীর ইত্যাদি ৩০ জন লোক তাঁর পুত্রবধূ যখন জল আনতে যাচ্ছিল তখন তাকে জোর করে কাঁচিকাটা কুঠিতে তুলে নিয়ে যায়। হিলস ঘোড়ায় চড়ে সব সময় তাদের সঙ্গে ছিল। হিলস তাকে রাত্র সাড়ে বারটা পর্যন্ত তার ঘরে রেখেছিল; তারপর পূর্ব দিকের একটা গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি; একজন নাপিতের বাড়িতেও ওঠা হল না। তখন তাকে গোঁসাই দুর্গাপুর কুঠির আমিন মাথুর বিশ্বাসেরই একজন আত্মীয় স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে নিয়ে

যাওয়া হল। ১০ মার্চ হরমণিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হল। দারোগা ১৩ মার্চ রিপোর্ট করলেন যে, হরমণিকে হরণ করার রিপোর্ট সত্য। যেসব পুলিশ তাকে মুক্ত করবার জন্য গিয়েছিল তারা হরমণিকে কুঠিতে নিয়ে যেতে দেখেছিল। কিন্তু সেখানে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য তারা খবর পাঠায়। কিন্তু বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাথুর বিশ্বাসের সব অভিযোগই নাকচ করে দিয়েছিলেন। এমনই ছিল তখন বিচার ব্যবস্থা। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রমণি র অবস্থা হরমণির মত হয়নি। নাটকে তোরাপ গিয়ে লাঠির জোরে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে এনেছিলেল। ক্ষেত্রমণি ছাড়াও এই নাটকে আরও ছয়টি নারীচরিত্র আছে। তাদের মধ্যে তিনজন হলেন গোলকচন্দ্র বসুর স্ত্রী এবং দুই পুত্রবধূ। অন্য চরিত্রগুলো হল রায়ত সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী, গোলক বসুর বাড়ির ঝি আদুরী এবং কুট্টিনী পদী ময়রানি।

এই নারীচরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজ ও সংসারে নারীর যে অবস্থান লক্ষ্য করি তা হল,—তখন আমাদের দেশ ছিল পরাধীন, ইংরেজ নীলকররা এই দেশে এসে নীল চাষ করছে, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সব ওদের সহযোগী। আর গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরাও চাষের ওপর নির্ভরশীল। 'নীলদর্পণ' নাটকটা মূলত একটি পরিবারকেন্দ্রিক নাটক। গোলকচন্দ্র বসু স্বরপুর গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত বিত্তবান ব্যক্তি। জমিজমাই তার প্রধান সম্বল। তার জমিতে যে ধান জন্মায় তাতে তার সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে এবং পুজোর ব্যয় নির্বাহ হয়। এই চাষ থেকে যে সরষে তিনি পান তাতে নিজের পরিবারের তেলের সংস্থান হয়েও উদ্বৃত্ত টাকা হাতে আসে। গোলক বসু বলেন, "আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ কোন কিছুর অভাব নাই।" রায়ত সাধুচরণ ও রাইচরণ তাঁর প্রতিবেশী। তারাও কৃষক। চাষবাসই তাদের একমাত্র ভরসা। এই নাটকের সমস্যা রায়তদের মান বাঁচানোর সমস্যা। এখানে নারীদের কোনো পৃথক সমস্যা নেই। গোলক বসুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী। তাঁর বড় পুত্রবধূ সৈরিন্ধ্রী এবং ছোট পুত্রবধূ সরলতা এবং সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী এরা সকলেই পুরুষ চরিত্রগুলির ছায়া মাত্র। স্বামীদের কল্যাণেই নিজেদের কল্যাণ। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়েই এঁদের জীবন। কিন্তু তাবলে এঁরা নিছক নিজ নিজ পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। এঁদের একটা সামাজিক সত্তা আছে।

তৎকালে সমাজে জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল। তা সত্ত্বেও

পরস্পরের মধ্যে একটা সরল আত্মীয়তার সম্বন্ধ ক্রিয়াশীল ছিল। তৎকালে পল্লিনারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তবে লোকশিক্ষার ধারাটা তখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। তাই তারা লিখতে পড়তে না জানলেও ধর্ম কী, সত্য কী, সেবা কী ইত্যাদি জানত এবং এই সব মানবিকগুণের আধারে সমাজ ও সংসারকে বুক দিয়ে বেঁধে রাখতে জানত। প্রতিবেশীদের আপদে বিপদে প্রতিকার করতে তাঁরা দ্বিধা করত না। আলোচ্য নাটকে প্রতিবেশী চাষীদের বিপদের সময় বসুপরিবার নিজেদের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সাধুচরণের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোলক বসুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী সাধুচরণের স্ত্রী রেবতীর কাছে যখন জানতে পারলেন যে, তাদের মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের লোকেরা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছে, তখন সাবিত্রীদেবী তাঁর ছেলে নবীনমাধবকে বলেছিলেন, ‘‘যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।’’ তিনি নিজের বিপদের কথা চিন্তা না করে অসহায়া ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের কথাই বড় করে দেখেছিলেন।

তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের নারীদের উত্তম বসন, উত্তম অলংকারেই আমোদ ছিল। স্বামী পুত্র নিয়েই নারীর সংসার। নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রীর কথায় আমরা তৎকালের নারীর অবস্থানের একটি সুন্দর চিত্র পাই। এই সৈরিন্ধ্রীর পিতাকেও নীলকরেরা তাদের নীলকুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আর ফেরেননি। সৈরিন্ধ্রী মামার বাড়িতেই মানুষ। তাঁর জননীরও পতিশোকে সেখানেই মৃত্যু হয়। এই সৈরিন্ধ্রী বলেছেন, ‘‘আমি বালিকাকালে সেঁজুতির ব্রত করিয়াছিলাম, আল্পনায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, ‘যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই....।’ নারীর জীবনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কাম্য। সেইজন্য তাঁরা নানা ব্রত ইত্যাদি পালন করতেন। এর অন্তর্নিহিত শক্তিতে তারা অগোচরে এবং অনায়াসে বিবিধ মানবিক শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে উঠতেন।

নীলকর এবং ইংরেজদের জন্যে গ্রামে নিরাপত্তাবোধ তেমন ছিল না। নীলকুঠিয়ালের আমিন, পেয়াদা, লাঠিয়ালরা যুবতী নারী দেখলেই তাদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যেত। আমরা ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনে দেখেছি গ্রামের এক শ্রেণির মানুষ প্রয়োজনে নিজেদের সহোদরাকেও ঘুষ দিয়ে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির পথ বেছে নিতে দ্বিধা করত না—এ কথা এর আগেও উল্লেখ করেছি। ‘‘এই ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল

পেলে লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেশকারী পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব........" ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে এদের মানসম্ভ্রমহীন দাস মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর আত্মরক্ষার জন্যে কেবল ভাগ্যকে দোষ দেওয়া এবং অন্যকে গালমন্দ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। গরিব ঘরের মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আদুরী বলে, "মোগোর কপালের দোষ, গরিব লোকের মেয়ে যদি বুড়ো হল, আর দাঁত পড়ল, তবেই সে 'ডান' হয়ে উঠল।" কিন্তু তাদেরও ধর্মবোধ প্রবল। পদী সাধুচরণের স্ত্রী রেবতীকে বলেছিল, ছোট সাহেব ক্ষেত্রকে দেখে পাগল হয়েছে, এবং তাকে একবার তার কুঠির কামরায় যেতে বলেছে। বিনিময়ে সে টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম করে দেবে।" তার উত্তরে রেবতী বলেছিল, "ধর্ম কি বেচবার জিনিস, না এর দাম আছে।" অর্থাৎ ওদের কাছে এই সতীধর্মই ছিল প্রধান। নারীদের স্বামীই একমাত্র ভরসা। তাদের মধ্যে লেখাপড়ার চল না থাকলেও বিদ্যাসাগরের বেতালের গল্প শোনার চল ছিল। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের সংবাদ গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের যে দুটো দল হয়েছিল সেই সংবাদও সেখানে প্রচলিত ছিল। গোলক বসুর বাড়ির দাসী আদুরীও এই বিবাদের কথা জানত। তবে তখনও গ্রামের সমাজে রক্ষণশীলতা ছিল প্রধান। বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হলেও সমাজে তা মান্য হয়ে ওঠেনি। তাই আদুরী বলে, সে রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে।

এই গ্রামেগঞ্জেও পদী ময়রাণির মতো নারীচরিত্রের অভাব ছিল না। আমিনের কথা থেকে জানা যায় যে, সে তার বোনকে দিয়ে নীলকরদের পেশকারি পেয়েছিল। এই বোনেরা পরে নিশ্চয়ই পদী ময়রানির মত কুট্টিনী হয়ে পড়েছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে আমরা এই কুট্টিনী চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। 'নীলদর্পণ' নাটকও সমকালে রচিত। ফলে এই নাটকেও পল্লীবাংলার নারীর অবস্থান প্রায় একই রূপ দেখতে পাই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তখন ছিল ইংরেজের শাসন। সাধারণের ধারণা ছিল ইংরেজ রাজত্বে আইন শৃঙ্খলা আছে। মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। গোলক বসুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী যখন রেবতীর কাছে জানতে পারলেন নীলকর লাঠিয়াল দিয়ে ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিয়ে যাবে তখন তিনি বলেছিলেন, "মগের মুলুক আর কি?—ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?" তার উত্তরে রেবতী বলেছিল, "চাষার ঘরে সব মেয়েলোক ধরে,

মরদদের কয়েদ করে, নীলদাদনে এ কত্তি পারে, নজোর ধল্লি ও-কত্তি পারে না?'' উদাহরণ স্বরূপ সে বলেছিল, ''মা, জানো না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাইনি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।''

তৎকালে পড়াশুনোর চল ছিল; তবে সেটা শহরাঞ্চলেই বেশি। বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতা লেখাপড়া শিখেছিল। বিন্দুমাধব নিজে শিক্ষিত মানুষ। তাই সে লেখাপড়ার মর্ম বোঝে। সরলতাকে এক পত্রে সে লিখেছিল, ''লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি।'' কিন্তু গ্রামজীবনে এই লেখাপড়াকে ভালো চোখে দেখা হত না, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে। সেজন্য সরলতার শাশুড়ি তাকে চিঠি লিখতে আপত্তি করতেন।

সরলতার কথায় তৎকালীন নারীদের অবস্থানের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সরলতা বলেছিল, ''প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগরভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গল-সূচক সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই—ব্রাহ্ম সমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ, আমাদের একমাত্র অবলম্বন;—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন।''

যখন এই ধনের কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়, যেমন, নাটকে দেখা দিয়েছে নীলকরদের অত্যাচারে গোটা সংসারে মহা বিপর্যয়, তখন নারীদের সাধারণত আত্মবিসর্জন বা পাগল হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এই নাটকেও আমরা দেখেছি গোলক বসুর এবং নবীনমাধবের মৃত্যুতে সাবিত্রীদেবী প্রথমে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরে উন্মাদিনী অবস্থায় ছোট পুত্রবধূ সরলতাকে পদপিষ্ঠে হত্যা করে ফেললেন এবং যে মুহূর্তে বিন্দুমাধবের কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন এবং জানতে পারলেন আদরের সরলতাকে তিনিই হত্যা করেছেন সেই মুহূর্তে ভূতলে পতিত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মনে হয় তখনও সহমরণের প্রথা বর্তমান ছিল। রাজা রামমোহনের উদ্যোগে সতীদাহ আইন বিরুদ্ধ হলেও সামাজিক জীবনে হয়তো তা প্রচলিত ছিল। সেই জন্যে বোধ হয় নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্দ্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে বিন্ধুমাধবকে বলেছিলেন, ''ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না।'' এমন করে 'নীলদর্পণে'র বিভিন্ন স্ত্রীচরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজে নারীজীবনের অবস্থানের পরিচয় লাভ করি।

সধবার একাদশী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "একেই কি বলে সভ্যতা?" (১৮৬০) প্রহসনের ছ'বছর পরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকখানি প্রকাশিত হয়। সময়ের ব্যবধান ছ'বছর হলেও মূল বক্তব্যে বিশেষ ভিন্নতা নেই। সমাজব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন এলেও এ নাটকের নারীর অবস্থানে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকে আমরা দেখেছি নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের অন্তঃপুরের নারীজীবনে দেখা দিয়েছিল অসহায়তা—তাঁরা ছিল অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। মূলত যে সকল কারণে তৎকালে নারীসমাজ এই দুর্দশা ভোগ করত, যেমন—পুরুষশাসিত সমাজ, প্রতিকূল আচার-বিচার, নারীর শিক্ষার অভাব, উপার্জনহীনতা, শারীরিক শক্তির ন্যূনতা, সামাজিক ও পারিবারিক লাঞ্ছনা ইত্যাদির বিশেষ হেরফের ঘটেনি 'সধবার একাদশী'র সময়ে।

উনিশ শতকের পূর্বেও এদেশে মাদকদ্রব্য—সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, ভাঙ, ধূমপান, মদ প্রভৃতি সেবনের প্রচলন ছিল। সমাজে মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল বলে লোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে পান করত। হিন্দু কলেজের স্বনামধন্য ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁর ছাত্রদের যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল তাঁদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশলাভ হয়; এবং সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে মদ্যপান অপরিহার্য বিবেচিত হত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—স্বদেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের এক ভাগনেয় সুশিক্ষিত হয়েও প্রচলিত মদ্যপান থেকে বিরত ছিলেন। যে জন্য রামগোপাল তাঁর ভাগনেয়কে বলেছিলেন, "তুই মদ খেতে শিখিলি না, তোকে আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া?" (ললিতচন্দ্র মিত্রের 'সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)। তৎকালে আতিথেয়তার আসরে সুরাপান আভিজাত্যের নামান্তর হয়ে উঠেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তাহারা ইহাকে কুসংস্কারভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রবল উপায় মনে করতেন।" ঐযুগে শিক্ষিত যুবকেরা মদ্যপানে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর প্রকাশ্যে মদ্যপানে আর বাধা রইল না। 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর একাংশ এত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল যে, মাত্রাধিক্য সুরাসক্তি ও বারবনিতার আসক্তি থেকে তারা নানা রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শোচনীয় পরিণতিতে উপনীত হয়। এর ফলে সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়ে সমাজ সংসারে দুঃসহ দুর্গতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, অন্তঃপুরস্থ

নারীজীবনে ঘোর দুর্দিন ও বিপর্যয় উপস্থিত হয়। ঘোরতর পাপাচারে ও ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে সমাজ বিষক্ষতে পরিণত হয়।

তৎকালে সমাজের কুসংস্কার দূর করার জন্য নব্যশিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানেরা অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধান অমান্য করে একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রকৃতির নিয়মে তাদেরই একটা অংশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অনাচারী হয়। অন্যদিকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ একাধারে নানা সভা, সমিতি, সাহিত্য প্রচেষ্টা ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করে সামাজিক নিয়মনীতির, এবং আচারগুলির যুগোপযোগী সংস্কার করতে সচেষ্ট হন। তৎকালীন সমাজের প্রাচীন ও নবীন এই দুটি ধারাই প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু কালক্রমে সংস্কার প্রয়াস, সাহিত্য, সেবা, শিক্ষার বিকাশ প্রবলতর হয়ে পুরাতনের সবকিছু নির্বিচারের বর্জন করে নতুনের প্রতিষ্ঠাদানের উদ্যম ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। এ কথা সত্য যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসে নতুন সাহিত্য সমাজকে সুসংস্কৃত, সুস্থ ও আধুনিকতার পথে অগ্রসর করে দেয়। আমাদের আলোচ্য নাটক 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) এই রকম সাধু প্রচেষ্টার একটা উৎকৃষ্ট নির্দশন।

'সধবার একাদশী' কথাটার মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা আছে। দেশাচার অনুসারে সধবারা একদশী করেন না; একাদশী করেন বিধবারা। তৎকালীন নারীসমাজের অবস্থাটা এর মধ্যে প্রকটিত। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বাইরের পুরুষ-সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে এ কথা ঠিক, কিন্তু পাশ্চাত্য অনুকরণে অধিকাংশ স্বামীরা বাইরের জগতে নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, ঘরে স্ত্রীকে দেখেন না, অবহেলা করেন—তাই সেই সব স্ত্রীরা বিধবা নারীর মতো দুঃখ, দুর্দশাগ্রস্ত; সবদিক থেকে তারা বঞ্চিতা। এটাই ছিল ঐ সময়কার সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থা। নারীর ছিল না কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। বিশেষ করে, কুলবধূদের পরনির্ভরশীল জীবন যাপন ছিল অনিবার্য। লেখাপড়ার সুযোগ ছিল সামান্যই বলা যায়। ঘরের বাইরে যাবার অধিকার তাঁদের ছিল না। সংসারকে কেন্দ্র করে স্বামী-পুত্র নিয়েই তাদের পৃথিবী। তৎকালে পরিবারই ছিল সমাজের সর্বনিম্ন সংস্থা। সেটাই তখন ভেঙে পড়েছে। পূর্ববর্তী নাটক 'নীলদর্পণে'র সরলতার উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালের নারীর যে অবস্থান আমরা দেখেছি, এ নাটকের সময়কালের নারীর অবস্থানে তার থেকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে না পেলেও পরিবর্তনের ক্ষীণতম আভাস পাওয়া যায়।

'সধবার একাদশী' নাটকে মোট চারটি স্ত্রীচরিত্র আছে। এর মধ্যে আছে অটলবিহারীর মাতা, তিনি অটলের পিতা জীবনচন্দ্রের স্ত্রী। আর আছে অটলের স্ত্রী কুমুদিনী, অটলের ভগিনী সৌদামিনী এবং বেশ্যাচরিত্র কাঞ্চন। তৎকালে সুরাসক্তি এবং বারবনিতা গমন আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। অবশ্য তখন 'সুরাপান নিবারণী সভা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিরোজিয়ানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রথম উন্মাদনায় বিয়ার ও বিফ (সুরা ও গোমাংস) দিয়ে আধুনিক সভ্যতাকে স্বাগত করতে চেয়েছিল। পাদরি ডাফ ও ডিয়ালট্রির খ্রিস্টান শিষ্যরাও খ্রিস্টধর্ম ও সুরাপানের সঙ্গে সভ্যতাকে এক বলে ভেবেছিল। হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিক্ষার নামে এই সভ্যতার নকলনবিসিকে ঠেকাতে পারেনি। ফলে ইংরেজিওয়ালাদের মধ্যে প্রবাহিত হতো উদ্দাম মদের স্রোত। অবশ্য এই মাতলামি ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল। প্যারীচরণ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেনর 'টেম্পারেন্স' আন্দোলন এবং 'ধর্মসমাজ'-এর চেষ্টা বাঙালি ভদ্রসমাজে মদ্যপানকে একটা লজ্জার বিষয় করে তুলেছিল। এ নাটকে অটলবিহারী, নিমচাঁদ তৎকালীন ইংরেজিয়ানার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই নাটকে তৎকালীন তথাকথিত এই ইংরেজি অনুকরণে অভ্যস্ত সমাজের চিত্র দীনবন্ধুর প্রহসনের মাধ্যমে চমৎকার ফুটে উঠেছে। সেইজন্য 'সধবার একদশী'কেই দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য করা হয়।

অনেকে তখন 'সুরাপান নিবারণী সভা'য় নাম লিখিয়ে মদ্যপান ত্যাগ করতেন। আবার অনেকে এই সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেও মদ দেখলে আর আত্মসম্বরণ করতে পারত না। উকিল নকুলেশ্বরেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। এই অভ্যাস পুরুষদের মধ্যেই বেশি সক্রিয় ছিল; নারীদের মধ্যে নয়। সুরাপানের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত ছিল বেশ্যাসক্তি। সমাজে বারবনিতাদের অবস্থিতি প্রায় প্রত্যেক নাটকেই দেখা যায়। এই প্রবণতা আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকেও প্রত্যক্ষ করেছি। এই নাটকে কাঞ্চন তেমনই একটি চরিত্র। সে অর্থের বিনিময়ে বড়লোকি ছেলেদের কাছে মাসোহারায় থাকে; এবং বড়লোকের ছেলেরাই এই মদ্যপানে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

নিমচাঁদের কথায় জানা যায়, "এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।" অটলের পিতা জীবনচন্দ্র ধনবান ব্যক্তি এবং পরধার্মিক। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা করেন। কিন্তু তাঁর ছেলে বেশ্যামাগীকে বনিতা করে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বেড়ায়। অথচ ছেলেকে শাসন করলে তার

মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। আসলে জননীর কাছে সন্তানস্নেহই প্রধান। সন্তানের অমঙ্গল হবে বলে বা সন্তান আত্মহত্যা করবে ভেবে তিনি সব অন্যায় ও আবদার সহ্য করে যান। ফলে অটলবিহারী মদ খায়, বেশ্যাবাড়িতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মেলামেশা করে।

পুরুষদের এরকম ব্যবহারে নারীদের জীবনেও অশেষ বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। অটলবিহারী স্ত্রী কুমুদিনী যথার্থই বলে, "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল— আমি ভাই আর সইতে পারি না, আমি গলায় দড়ি দে মরব।" অটলের ভগিনী সৌদামিনীর সঙ্গে কুমুদিনী যে আলাপ করে তার থেকে এই নারীজীবনের বিড়ম্বনার কথা জানা যায়। কুমুদিনী সৌদামিনীকে বলেছে, "আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি, এক দিন তাকে ঘরে দেখতে পেলাম না। এক মরে যায়—জানলুম আপদ গেল, চোখের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাতদিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।" সৌদামিনী তাকে 'কলেজে' পড়ার দোষ বললে কুমুদিনী বলল, "তোর ভাই আবার কোন্ কালে কালেজে পড়লে? আদরের ঢেঁকি, কালেজে নিলে না, তাই গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাত উলটিচ্‌লো, আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কতক পড়েচ্‌লো।" অতএব এগুলো আসলে ইংরেজিশিক্ষার দোষ নয়। তখনকার সংসর্গের দোষ। সৌদামিনীও তার ভাই-এর এই আচরণের কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। সে কুমুদিনীকে বলে, "তোর এ ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই শুঁটকো মাগীকে নিয়ে থাকে—"। এ থেকেই তখনকার অবস্থা বোঝা যায়। অটলবিহারীর কোনো লজ্জাবোধও নেই। এক একদিন কাঞ্চনকে গাড়িতে করে বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। কাঞ্চনের গলা ধরে বারান্দায় নাচতে শুরু করে। এদের লোক লজ্জায়ও কোন শঙ্কা নেই। অটলের বাবা জীবনচন্দ্র রাগ করে অটলকে লাথি মেরে বাইরে চলে যান। কিন্তু জননী সন্তানের এই দুরবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে অটলের বাবাকে গালাগালি দেন। তখন বাধ্য হয়ে জীবনচন্দ্র কাঞ্চনকে ডাকিয়ে এনে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিলেন। —আসলে তখন লোকের কাছে বাহাদুরি আদায় করাই ছিল লক্ষ। "কিসে লোকে বাবু বলবে কেবল তাই দেখে।" এরা মাতাল হলে এদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কাঞ্চন বলে, "প্রিয়শঙ্কর যখন আমায় রাখলে তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তারপর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী করলেন।"

তখনকার দিনে "মেয়ে মানুষ রাখা বড়লোকের একটা ফ্যাসান ছিল।" অটলের কথায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। সব জননী অটলের মায়ের মতো ছিল না।

মাতাল নিমচাঁদের কথা থেকে জানা যায়,—"তার জননী তাকে দেখলে নিজেকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন। আর শাশুড়ী তাকে দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন।"

এই নাটকে হিজড়েচরিত্রও পাওয়া যায়। এরা মদ্যপান করে এবং নানা অপকর্মে সাহায্য করে। অটল এই রকম হিজড়ে চরিত্রকে তার গোপন মতলব হাসিল করতে কাজে লাগিয়েছিল। গোকুলের স্ত্রীকে ধরে আনতে অটল তাকে গয়না, শাড়ির লোভ দেখিয়েছিল।

আবার নারীদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তারও পরিচয় এ নাটকে পাওয়া যায়। গোকুলবাবুর স্ত্রী খুব লেখাপড়া জানত এবং একটু একটু ইংরেজিও জানে। তৎকালে নারীমুক্তির কথাও সমাজে আলোচ্য বিষয় ছিল। মাতাল নিমচাঁদ বলে, "Female emancipation is not a bad thing among gentlemen."

অতএব এই নাটকে আমরা যেমন একদিকে অবরোধবাসিনী নারীজীবনের বিড়ম্বনার কথা জানতে পারি তেমনই অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের কথাও জানতে পারি। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'তে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা নিয়েও আলোচনা হত। ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন নারীর শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। রাধাকান্ত দেবও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার বিরোধী হলেও অন্দরমহলে নারীদের শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই ঐ সময়ে মেয়েদের অর্জিত শিক্ষার, পরীক্ষা দিতে হত। তাঁর বাড়িতেই Female Juvenile Society প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রিস্টান মিশনারিরাও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের জন্য অনেকে কাজ করেছিলেন। কুমারী কুকের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় ও তাঁর শিক্ষাদান সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকায় একসময় খুব আলোচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ার এবং ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'সমাজ উন্নতি বিধায়নী সুহৃদ সমিতি'ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তৎপর হয়েছিল। এ সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকর্মে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা'ও এগিয়ে এসেছিল। মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষিকা তৈরির বিষয়ও সেই সময়ে আলোচনা হয়েছিল। এ ব্যাপারে মিস কার্পেন্টারের ভূমিকাও উল্লেখ করবার মত। শিক্ষায়িত্রী তৈরির জন্য তিনি নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরকম নানা আলাপ-আলোচনার-আন্দোলন

হলেও সরকারি নিশ্চেষ্টতার জন্য মেয়েদের কোনো সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

এই নাটকে যে সুরাপান নিবারণীর সভার উল্লেখ আছে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে। অবশ্য মদ্যপানের বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচার অভিযান ঘটেছিল প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। বাংলাদেশে মাদক নিবারণী আন্দোলনে মিশনারি পাদরিদলের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনে প্যারীচরণ সরকারের ভূমিকার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ', প্যারীচরণ ছিলেন ঐ সমাজের সম্পাদক। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথমে প্যারীচরণ প্রমুখের সঙ্গেই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে তিনি আশালতা দল 'ব্যাণ্ড অফ্ হোপ' নামে একটি দলও গঠন করে তার মাধ্যমে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন।

'সধবার একাদশী' নাটকে আমরা এই সব আন্দোলনেরই পরিচয় পাই। সেদিক থেকে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে 'সধবার একাদশী'ও একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে বিবেচনার যোগ্য।

এই অধ্যায়ে আমরা ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত মোট ছয়টি নাটকের আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি এই সময়ে দেশীয় সমাজে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন এবং নানা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে এই পরিবর্তন আসে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের চেষ্টায় মধ্যযুগীয় নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রচলিত হিন্দু সমাজে সংস্কারবিরোধী নানা ক্রিয়া কলাপ সমাজের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এইসব আন্দোলন ও আলোড়নের ফলে সমাজজীবনে নারীর অবস্থানের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফলে সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে বিধবা-বিবাহ স্বীকৃত না হলেও এর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে।

আমরা এইসব নাটকে বিভিন্ন নারীচরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নানা প্রকার নারীর অবস্থান লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি অসহায় বিবাহযোগ্যা কুলীন বালিকাদের অবস্থা। আমরা দেখেছি প্রতিকারহীন নারীর দুর্বহ চোখের জলে

সামাজিক অনুশাসনকে মান্য বলে গ্রহণ করতে। আমরা জেনেছি কী যন্ত্রণায় বিধবা বিবাহ প্রচলন না থাকায় নারীর আত্মহত্যার কথা। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সমাজে পুরুষদের অতিরিক্ত পানাসক্তি এবং বারবনিতা-প্রিয়তার জন্য স্ত্রীদের অশেষ সামাজিক যন্ত্রণা ও ক্লেশ। জেনেছি সমাজে বারবনিতা এবং কুট্টিনী নারীদের ভূমিকা। দেখেছি একদিকে বহুবিবাহ অন্যদিকে নারীর আত্মগ্লানি এবং দাসত্বজীবন।

আমাদের দেশ ছিল তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধের আন্দোলনও প্রকট হয়ে উঠেছিল। 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজ নীলকরের বিরুদ্ধে অসহায় বিত্তবান এবং বিত্তহীন দেশবাসীর বিদ্রোহ চিত্রিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অসহায় দর্শক এবং ভোগ্যপণ্যের মতো। তবে আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যে আমরা নারীর এই অসহায় অবস্থানের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারকদের আন্দোলনের ফলে নারীদের মধ্যে সচেতনার বিকাশ লক্ষ করি। নারীরা ক্রমশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন। সামাজিক নানা অবস্থা এবং অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে একটা চেতনার সঞ্চার হয়েছে। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার শুরু হয়েছে। ফলে সমাজ পরিবর্তনে নারীরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-বঙ্গভঙ্গ ও বাংলা নাটক
কিঞ্চিৎ জলযোগ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্বে যে মৌলিক নাটকগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছি তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ বিবর্তন ও নারীর অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। আমরা লক্ষ করেছি উনিশ শতকে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নারীজীবনের উন্নতিসাধন। কারণ নারীর উন্নতি না হলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই কাজে রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বিধাবাবিবাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে বিধৃত নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

একই সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে বাঙালি জনমানসে যে জাতীয়চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল সেটাও আমরা উল্লেখ করেছি। এমন কি ঐ নাটকেও নারীর কী অবস্থান ছিল তারও উল্লেখ করেছি।

দীনবন্ধু মিত্রের এই 'নীলদর্পণ' নাটককে অবলম্বন করেই আমাদের দেশে প্রথম জাতীয় নাট্যশালা বা 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৭২)। পূর্বে নাটক অভিনীত হত রাজ-রাজড়ার আনুকূল্যে এবং তাঁদের নির্বাচিত স্থানে। সে নাটকের দর্শকও ছিল নির্বাচিত। জনসাধারণের সেখানে কোনো প্রবেশ অধিকার ছিল না। জাতীয় নাট্যশালা বা ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা নাটক জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। এই পর্বে সমাজচেতনাও সম্প্রসারিত হল। জাতীয়তার ক্ষেত্রে জাতির নবজাগরণের উদ্দেশ্যেই নাটকে এল ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং পৌরাণিক চিত্র-চরিত্র। সমাজজীবনও তখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আমরা সেই সব নাটকেরও বিচার বিশ্লেষণ করব। এই পর্বে আমাদের আলোচনা অবশ্য সমাজজীবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নানা প্রহসনেরও আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি

এই সামাজিক প্রহসনগুলির মধ্যেও সুগভীর জীবনবোধ ও ব্যাপক সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান অধ্যায়েও আমরা একটি প্রহসন দিয়েই শুরু করছি। এই প্রহসনের নাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', এর নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নাটকের স্বরূপ প্রহসন হলেও এর মধ্যে একটি গভীর আদর্শবাদের পরিচয় আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর পূর্বেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত সুপ্রসিদ্ধ 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয়মেলা'র অনুষ্ঠান হয়েছিল (১৮৬৭)। নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, ''হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।'' (দ্র. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

পূর্ববর্তী যুগের প্রহসন রচনার ধারা অনুসরণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়েকখানি প্রহসন রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর রচনায় গভীর জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পোবোধ না থাকলেও তাঁর প্রহসনের মধ্যে তাঁর আদর্শবোধই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেই যুগে সুরাসক্তি এবং বেশ্যাগমনের যে প্রবণতা ছিল তাকেই অবলম্বন করে তিনি একটি সুস্থ পারিবারিক আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন। 'কিঞ্চিৎ জলোযোগ' (১৮৭২) তাঁর রচিত প্রথম প্রহসন। আঙ্গিকের দিক থেকে এর মধ্যে দীনবন্ধুর প্রভাব থাকলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্বতাও কিছু কম নেই। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। এর মধ্যে আছে—একটি পারিবারিক চিত্র—ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী বিধুমুখীর সুস্থ দাম্পত্যজীবনের আদর্শ স্থাপন। পূর্ণ ডাক্তার শ্যামবাজারের এক বারবনিতা কামিনীর প্রতি আসক্ত। বিধুমুখী শিক্ষিতা নারী হয়েও তাঁর স্বামীর এই পরনারীর প্রতি আসক্তিকে কিছুতেই দূর করতে পারছিলেন না। অবশেষে এক অদ্ভুত নাটকীয় কৌশলে বিধুমুখী পূর্বোক্ত বারবনিতাকে অন্যের আশ্রিতা প্রমাণ করে তাঁর ডাক্তার স্বামীর মদ্যাসক্তি এবং বারবনিতার প্রতি আসক্তি দূর করিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক এবং মধুর মিলন সম্ভব করেছিলেন। প্রহসন হিসাবে তৎকালে এটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

আলোচ্য নাটকে একটিই মাত্র নারীচরিত্র আছে—ডাক্তার পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রী বিধুমুখী। বিধুমুখী শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা। নাটকের মধ্যেই এ কথা উক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মউপাসনা মন্দিরে তাঁর অবাধ যাতায়াত। এর থেকে বোঝা যায় বিধুমুখী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। রাজা রামমোহন রায় এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষকে একই সমাজভুক্ত করেছিলেন। তিনি এই সমাজের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ, জাতীয়তার জাগরণ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত, নবযুক্তিবাদের আরম্ভ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পত্তন প্রভৃতি করেছিলেন। যাঁরা এই সমাজভুক্ত হতেন, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের অগ্রসর মানুষ বলেই গণ্য হতেন। আমরা বিধুমুখীর মধ্যে সেই অগ্রসর চিন্তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। এই ব্রাহ্ম আন্দোলন তৎকালে শুধু শিক্ষিত বাঙালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রামমোহনের জীবিতকালেই এই আন্দোলন নগর ছেড়ে গ্রাম গাঁয়েও প্রবেশ করেছিল। কালীকচ্চের জমিদার আনন্দচন্দ্র নন্দী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার পর নিজগ্রামের মধ্যে থেকে তাঁর প্রজাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে গিয়েছিলেন। এ রকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। (রাজা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—যোগানন্দ দাস)।

বিধুমুখী ছিলেন নারীস্বাধীনতাকামী মহিলা। তিনি নিজ ইচ্ছামত তাঁর গন্তব্যস্থানে যেতে পারতেন। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই বিধুমুখী সেকালের মহিলাদের মতো অন্দরমহলের বন্দিনী নন এবং স্বামীর হাতের খেলার পুতুলও নন। তাঁর স্বকীয় একটা ব্যক্তিত্ব আছে। কতকগুলো ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বামীর নিকট হতে অধিকার আদায় করে নিয়েছেন। —"তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো ; বললে, রবসনের ওখানে চা খাব, ভালো তাই খাও। বললে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুশি উড়ব—ভালো তাই ওড় গিয়ে।" অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র বিধুমুখীর স্বাধীনতায় বাধা দেন না। বিধুমুখীকে এই নাটকে ব্রাহ্মিকা বলা হয়েছে। এই ব্রাহ্মিকার কথা থেকে আমরা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মিকাসমাজের কথা স্মরণ করতে পারি। স্ত্রীশিক্ষার জন্য যেমন পুরুষ ও নারীতে মিলে 'বামাবোধিনী সভা' (১৮৬৩) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনই কেশবচন্দ্র ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মিকাসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য বিবরণী থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মনারীদের কর্মশিক্ষার উন্নতির জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার বাইরেও মফঃসলের

নানা স্থানে এই ব্রাহ্মিকাসমাজ ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বক্তৃতা থেকে জানা যায় কলকাতার পূর্বে বরিশাল প্রভৃতি মফঃস্বলে ব্রহ্মিকাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। (দ্র. রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন—যোগানন্দ দাস, পৃ.-২১৫)।

ব্রাহ্মিকাসমাজের সঙ্গে একই সময় 'Bengal Ladies Association' বা 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকে প্রসূত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই নারীদের স্বাধীনভাবে মিলিত হবার জন্য গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মহিলা সমিতি। এই মহিলা সমিতির নানা কাজ ছিল। তাঁরা দরিদ্র নারীদের সাহায্য করতেন। ব্রাহ্ম পরিবারদের পরিদর্শন করতেন, রোগীর শুশ্রূষা এবং ঘরের মধ্যে যারা লেখাপড়ায় অল্প অগ্রসর তাদের শিক্ষাদান করতেন। বিধুমুখী ব্রাহ্মিকা—এ বিশেষণের মধ্য দিয়েই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিধুমুখীর বাড়ির পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা বিধুমুখীকে বলে, "গিন্নিডি য্যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কত্তাকে ওঠ্ বল্লি ওঠেন, বোস্ বললি বসেন!" বিধুমুখী সত্যই তৎকালীন সমাজের এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। পুরুষ-প্রধান সমাজে যেখানে নারী পুরুষের লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহ্য করেও চোখের জলে নাকের জলে দিনাতিপাত করে সেখানে ব্রাহ্মিকা বিধুমুখী তাঁর স্বাতন্ত্র্যে নিয়ে পূর্ণচন্দ্রের সংসার করেন। বিধুমুখীর স্বামী মদ্যাসক্ত, বেশ্যাসক্ত কিন্তু এটা তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতিও বটে। আমরা এই মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির বিশদ আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে, সুরাসক্তির বিরুদ্ধে তখন একটা আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। বিধুমুখী এ আন্দোলনেরও যেন একটা নিদর্শন। তিনি তাঁর স্বামীকে মদ্যপান থেকে বিরত করার চেষ্টায় ছিলেন। সেজন্য পূর্ণচন্দ্র যখন মদ্যপান করে গৃহে আসেন তখন বিধুমুখী বলেছিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে অঙ্গীকার করেছিলে যে, আর কখনো মদ্যপান করবে না—আবার ফের মাতাল হয়েছো?" বিধুমুখী তৎকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই এক নারীচরিত্র। তিনি অন্যদের মত গৃহবন্দি নারী নন। নারীর যে স্বাধীনতা প্রয়োজন সেটা তাঁর স্বামী পূর্ণচন্দ্রও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই নারী-চরিত্র ভৃত্য ভোলার কাছেও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। সে বলে, "আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধূলা পালে, ম্যায়েগুলো বর্তায়ে য্যাত! এর কি আস্পর্ধা! জগদম্বার মতো মূর্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন, দ্যাহ না!" সত্যি বিধুমুখী আর সেকেলে নারীদের মত

গৃহবন্দি দাসী নন। পূর্ণচন্দ্রের সংসারে সে যথার্থই কর্ত্রী। তাঁর কাছে পূর্ণচন্দ্র নিজের অপরাধের জন্য (সুরাশক্তি ও বেশ্যাসক্তি) কুণ্ঠা বোধ করে। বিধুমুখী নিয়মিত মন্দিরে উপাসনায় যোগদান করেন। মন্দির অর্থাৎ ব্রাহ্ম উপাসনামন্দির। ব্রাহ্মদের উপাসনায় বিধুমুখী নিয়মিত যোগদান করেন। যে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা, স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বী হওয়া বিধুমুখী সেই আদর্শে দীক্ষিত। সেজন্য তিনি অনায়াসে তাঁর স্বামী পূর্ণচন্দ্রকে ভয়ানক মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করতে পারেন। কারণ পূর্ণচন্দ্র শ্যামবাজারের কামিনীর উপর গভীর আসক্তি সত্ত্বেও বিধুমুখীকে বলে, ''আমি তোমা ভিন্ন আর কাকেও ভালবাসি নে।''

এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্যই হল বেশ্যাসক্ত পূর্ণ ডাক্তারকে ঐ বদ আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনা। বিধুমুখী অভিযোগ করে অনেক কাকুতি মিনতি করেও যখন পূর্ণচন্দ্রকে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না. তখন তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেন। অবশেষে কামিনীর প্রতি অন্য পুরুষের আসক্তির প্রমাণ উপস্থিত করে পূর্ণচন্দ্রকে কামিনীর মোহ থেকে মুক্ত করে আনেন। আসলে বিধুমুখী ব্রাহ্ম এবং শিক্ষিতা মহিলা বলে তাঁর ঘরে পালিয়ে আসা পেরুরামের সাহায্যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তখন বিবাহ বিচ্ছেদের আইনও প্রচলিত হয়েছে (১৮৬৯)। ইতিপূর্বে আমরা এই আইনের কথা কোথাও উল্লিখিত দেখিনি। এই নাটকে বিধুমুখী এবং পূর্ণচন্দ্র বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রশ্ন তুলেছেন। বিধুমুখী বলেছেন, তিনি পূর্ণচন্দ্রকে ত্যাগ করে বাপেরবাড়ি চলে যাবেন। আর সেখানে যদি বাপ-মায়ে না নেয়, তাহলে ''ভারতাশ্রম'' হোটেলে গিয়ে উঠবেন। এই 'ভারতাশ্রম' উল্লেখের মধ্যে আমরা তৎকালের ব্রাহ্মদের উদ্যোগে গঠিত নানা আশ্রমের কথা জানতে পারি। প্রসঙ্গত দাসাশ্রমের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইংরেজি ১৮৯১ সালের ২৭ জুন তারিখে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামের প্রাণহরি দাস মহাশয়ের বাটিতে দাসাশ্রম স্থাপিত হয়। ''ভগবানের পুত্র-কন্যাদের সেবা করিলে প্রকৃত ভগবানের সেবা হয়।'' —অর্থাৎ মানবসেবাই এই আশ্রমের প্রত্যেকের প্রধান ব্রত ছিল। বিধুমুখীর 'ভারতাশ্রম' এই রকম একটি আশ্রম বলে অনুমিত হয়। অন্যদিকে পূর্ণচন্দ্রও বলেন, ''আমিও কাল থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে

থাকব।" এই ডাইভোর্সপ্রথা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। তখন ব্রাহ্মমতবাদ খুবই সক্রিয় ছিল। বিধুমুখী পরেও বলেছেন, "আর আমার এ বাড়িতে থাকা হয় না। আমি এক্ষণি ভারতাশ্রমে যাব।" স্ত্রী গৃহত্যাগিনী হচ্ছে দেখে পূর্ণচন্দ্র তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন। পূর্ণচন্দ্র মদ্যপান এবং শ্যামবাজারের কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে বিধুমুখীর প্রণয়ী হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। পূর্ণচন্দ্রের চরিত্রের এই পরিবর্তনই এই প্রহসনের মূল লক্ষ। আর এই কাজে ব্রাহ্মিকা বিধুমুখীর ভূমিকা অনবদ্য।

প্রহসনের উদ্দেশ্য সমকালীন ঘটনার বা চরিত্রের অসঙ্গতি দেখিয়ে দর্শকের হাস্যরস পরিবেশন করা। এই নাটকে পেরুরাম চরিত্রের উপস্থাপনের দ্বারা পূর্ণ ডাক্তার এবং বিধুমুখীর জীবনে যে অভাবিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তাকে কৌতুকময়তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন। প্রহসন কোনো সিরিয়াস নাটক না হলেও আমরা এই প্রহসনগুলির মধ্যে তৎকালীন জীবনের বাস্তব অবস্থার নানা পরিচয় লাভ করি।

আমাদের আলোচিত প্রথম নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' একটি প্রহসন। তার পরেও আমরা বহু প্রহসন নাটকের মধ্য দিয়ে নারীর তৎকালীন অবস্থানের প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে বিধুমুখী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা নারীদের যে অবস্থানের উন্নতি হয়েছিল, তা আমরা জানতে পারি। বিধুমুখী শিক্ষিতা এবং ব্রাহ্মিকা। তাঁর চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। স্বামীর প্রতি তাঁর আনুগত্য সত্ত্বেও তিনি স্বামীর বিচ্যুতিকে সমর্থন করতে পারেননি। বরং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর বিচ্যুতি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া এই নাটকে প্রথম ডাইভোর্সের কথা উঠেছে। আর পেরুরামের উক্তি থেকে বেকার জীবনের দুর্ভোগের কথা জানতে পারি। বিধুমুখীর প্রস্তাবের উত্তরে পেরু বলেছিল, "মাসে আড়াই টাকা, আবার খাওয়া পরা। আমার এই ঢের! আজকালের বাজারে এই বা পায় কে? কত বি. এ., এম. এ কাজের জন্য হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।" বিধুমুখী সংগীতও করতে পারতেন। তিনি পেরুরামকে ব্রাহ্মসংগীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে আমরা নারীজীবনের যে অসহায় অবস্থার কথা এবং নারীজীবনের যে দুর্ভোগ-যন্ত্রণার কথা জানতে পারি বিধুমুখীর অবস্থান

তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা লক্ষ করি নারীর অবস্থানের কত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটক এই বিচারেই একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। ব্রাহ্মসমাজ নিঃসন্দেহে সেকালের একটি শিক্ষিত ও অগ্রসর সমাজ। সাধারণ হিন্দুসমাজের থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু বৃহত্তর ভাবে নারীর কথা আলোচনা করতে গেলে এই সমাজভুক্ত নারীদের কথাও উল্লেখযোগ্য। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকেই আমরা প্রথম এই সমাজের কথা জানতে পারি। সেইজন্য বাংলা নাটকের ধারায় এই নাটক একটি ব্যতিক্রমী নাটক। নানা সামাজিক আন্দোলনের ফলে নারীজীবনের যে অগ্রগতি ঘটেছিল অনিবার্যভাবেই তা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। বিধুমুখীচরিত্র তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বিধুমুখীচরিত্র নাট্যকারের কোনো বিচ্ছিন্ন কল্পনা নয়। আমরা তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস থেকে জানতে পারি এই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মহিলারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে সফলকাম হয়েছিলেন এই সামাজিক ইতিহাসের কিছু কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বিবাহ-বিভ্রাট

নারীজীবনের অগ্রগতি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অনেকেই পছন্দ করত না। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মানুষদের এই অগ্রগতি তাদের কাছে অসহনীয় ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে আমরা তা জানতে পারি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে আমরা নারীজীবনের যে অগ্রগতি বা অগ্রসরতা লক্ষ করি প্রায় সমকালীন নাট্যকার অমৃতলাল বসুর নাটকে এই ব্রাহ্মদের রসাল এবং রঙচঙের কেরিকেচার প্রত্যক্ষ করি। ব্যক্তিগত জীবনে অমৃতলাল বসু ডাক্তারি ছাত্র এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেও তাঁর নাটকে নারীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, যে কোনো ধরনের সমাজ সংস্কার ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এমন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে নিয়েও তাঁর 'খাসদখল' নাটকে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে কেরিকেচার রচনা করেছেন। তাঁর সময়ে বিধবা-বিবাহ একটি বহু আলোড়নকারী ঘটনা। বিধবাদের সম্পর্কে তৎকালীন সমাজবোধের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অমৃতলালের নাটকেও বিধবা-বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় ('বাবু' ও 'ব্যাপিকা বিদায়')। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ করে তৎকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে যে নারীজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে বিধুমুখীচরিত্রে আমরা যে অগ্রগতি লক্ষ করি অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' (১৮৮৭) নাটকে তাকে হাস্যকররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

তবে একথা ঠিক যে, যে সামাজিক পরিস্থিতি দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রভৃতিকে প্রহসন রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল অমৃতলালের সময়ে তার অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। একদিকে যেমন ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, বিধবাবিবাহের পক্ষে বাস্তব প্রচলন ঘটতে থাকে তেমনই অন্যদিকে হিন্দুয়ানির রক্ষণশীলতা প্রবল হয়ে ওঠে। অমৃতলাল বসু হিন্দু রক্ষণশীলতার দৃষ্টিতেই এই ব্রাহ্মদের আচরণ এবং আন্দোলনের প্রতিবাদ করেছেন। তাদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনা করেছেন।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, যখন সমাজে কোনো প্রবল আন্দোলন বা বেগের

সঞ্চার ঘটে তখন তার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা সমর্থনযোগ্য নয়। যাকে বলা যায় বাড়াবাড়ি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। অমৃতলাল এই অনাচার, ভণ্ডামি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক ছিলেন না। সে জন্য তিনি সনাতনী সংস্কারপন্থীদের তীব্র আঘাত করেছেন।

অমৃতলালের নাটক প্রত্যক্ষ এবং সোচ্চার। বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। তিনি অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাটক ও গান রচয়িতা হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রসহনগুলির মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে যে সামাজিক প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছেন সেটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। এই নাটকের সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ এবং ব্যঙ্গাত্মক অংশ হল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এক বঙ্গমহিলা ও তাঁর স্বামীর চিত্রটি। এদিক থেকে দেখলে এই নাটকটি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে আমরা এই সম্পর্কে যে মনোভবের পরিচয় পেয়েছি 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে তার বিপরীত চিত্র পাই। সেজন্য এই নাটকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে একথা সত্য যে, এই নাটকখানির মধ্য দিয়ে পণপ্রথার দোষ-গুণ কীর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও নব্যবঙ্গের কলেজ শিক্ষার প্রতি এবং হিন্দু মতে 'সমুদ্র যাত্রা'র শাস্ত্র বিরুদ্ধ সংস্কার প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন।

অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে আমরা অনেকগুলি নারীচরিত্রের পরিচয় পাই। এই নাটকে আছে এক বরের পিতা, গৃহস্থ গোপীনাথ সরকারের স্ত্রী—গিন্নী। তিনি বিবাহযোগ্য বরের মাতা। কনে হল—মন্মথনাথ মিত্রের কন্যা কুমুদিনী। কুমুদিনীর ঠাকুর্মা (ঠানদিদি) এবং কুমুদিনীর বাসরসঙ্গিনী—সুরথকুমারী, নিত্যকালী, মনোমোহিনী, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা বঙ্গমহিলা বিলাসিনী কারফরমা এবং গোপীনাথ সরকারের ঝি।

এই নাটকের মূল কাহিনী ঋণগ্রস্ত গোপীনাথ সরকারের। পুত্রের বিবাহে বহু টাকা পণের লোভ তার। এই বিবাহ সুবাদে এসেছেন কন্যার পিতা, ঘটক ইত্যাদি পুরুষচরিত্র। প্রতিবেশী ধনী চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "ছেলের বিয়ে আর তেজারতি একই কথা।" সেজন্য গোপীনাথ সরকারের পুত্র কলেজে পড়া নন্দলাল সরকারের বিবাহে এই তেজারতি ব্যবসার সুন্দর পরিচয় আছে। বরপণ, বিবাহের গহনা ইত্যাদি নিয়ে সত্যি এ এক তেজারতি ব্যবসা! এই প্রসঙ্গেই গোপীনাথের গিন্নীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গোপীনাথ বলে, "গিন্নি বলেন, নন্দলালের বৌ যদি দশ হাজার টাকার কম ঘর ঢোকে, তবে তাকে দুধে

আলতায় পা দিতে দেব না।" যদিও ঘটকের কথায় জানা যায়, "স্ত্রীবুদ্ধি দুষ্কুলাদপি।" স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দুকুল যায়। তবু সাংসারিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরও যে একটা মতামতের মূল্য হয়েছে তা বোঝা যায়। তা প্রকাশ্যে না হলেও সাংসারিক নীতি নির্ধারণে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গোপীনাথের বাড়ির ঝি তারও আত্মসম্ভ্রমবোধ আছে। বাবুর জন্যে ধারে দোকানে জিনিস আনতে গেলে মুদি তাকে ছোট মুখে বড় দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে; এবং তাকে 'মাগী' বলে অপমান করেছে। সে এই অপমান সহ্য করতে পারে না। তার কথায় আরও জানা যায়, তখনই গরিব দুঃখী বলে সমাজে তাদের হেয় চোক্ষে দেখা হত। এখানে উল্লেখযোগ্য গোপীনাথ সরকার একজন হিন্দু গৃহস্থ ব্যক্তি। অন্যদিকে আমরা যে গৌরীকান্ত কারফরমা ও বিলাসিনী কারফরমারের পরিবারকে দেখতে পাই তাঁদের রীতিনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। এই বিলাসিনী কারফরমা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা। বি. এ.। এবারে সায়েন্সে-এম, এ দেবে। সে হিন্দুর প্রচলিত আচার আচরণকে অসভ্যতা বলে মনে করে। মিস্টার সিংকে সে বলে, উমাচরণবাবুকে আমি একপ্রকার বিবাহ কত্তে স্বীকার করেছিলাম বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাছা গলায় দিয়ে জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন। সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী বলে কি করে নিই?" সে স্ত্রীলোকের বিজ্ঞান শেখার পক্ষপাতী। বাড়িতে সে স্বামী গৌরীকান্ত কারফরমাকে দিয়ে কাজকর্ম করায়। গৌরীকান্ত রান্না করে, ফাইফরমাস খাটে। বিলাসিনী 'পুরুষদমন সভা'র নেত্রী। আর গৌরীকান্ত রান্না ঘরে বসে মশলা পেষে।

নন্দর বিবাহ বাসর থেকে আমরা জানতে পারি তখন কুসংস্কার বর্জন করে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে মিলে গীত ও বাদ্যাদি আমোদ করতে শিক্ষা করেছে। তাছাড়া তখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সকল স্ত্রীলোককেই ভগ্নী বলে গণ্য করা হত। গৃহে স্ত্রী হলেও সমাজে ভগ্নী। ঝি হলেও নারীর অধিকারবোধের পরিচয় তখন পাওয়া যায়। গোপীনাথের ঝি গোপীনাথকে বললে, "উঃ! কি মনিব গো! ভাত কাপড়ের ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই! দেড় বচ্ছর একটি পয়সার নাম নেই, মনিব! দে মিনষে, আমার সব ট্যাকা দে, জোচ্চর মিনষে!" শেষ পর্যন্ত গোপীনাথ বাবুর ছেলে নন্দকুমার তার বিবাহের বরপণ সব যৌতুকের টাকা-পয়সা নিয়ে বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির। বিলাসিনী তখন বলেছিল, "দম্পতির মনে প্রণয় না জন্মিয়ে বিবাহ দেওয়ার উপযুক্ত ফল। নন্দর এই পলায়নে বিলাসিনীর হাত ছিল। সে বলে, "ভগ্নীগণ না পৃষ্ঠ দিলে

ভ্রাতারা কখনও উচ্চ কার্যে উত্তেজিত হতে পারে না।" তাছাড়া অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহ্ সে সমর্থন করে না। সে বলে, "একাদশ বর্ষীয় বালিকার আবার পতি কি? সে প্রণয়ের কি জানে! সে হয়তো পতিকে গুরুর মত ভক্তি করতে শিখবে, দাসী হয়ে সেবা করবে, কিন্তু ভালবাসা তো—যে সে ভালবাসা না—যে ভালবাসাকে 'লভ্' বলে—সে ভালবাসা কখন শিখবে না, আপনার অধিকার স্থাপন কত্তে শিখবে না।"

অমৃতলাল এ নাটকে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বিলাসিনী কারফরমার মতো একজন শিক্ষিতা, সমাজসেবী বঙ্গ মহিলারও কেরিকেচার করেছেন। তবু আমরা এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালের নারীদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল, সমাজ সংস্কার হয়েছিল তার পরিচয় পাই। আর ঝি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের নিম্ন স্তরের নারীর মধ্যেও যে অধিকারবোধের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ পাই। রক্ষণশীল অমৃতলাল এই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধেই ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ করেছেন।

অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করবার সময় আমরা লক্ষ করেছি এর মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজে পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা, ব্রাহ্ম আন্দোলন, কলেজি শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র হলেও তৎকালীন নারীজীবনের পরিচয় পাই। আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা সমাজের মধ্যে অনেক সদর্থক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এর থেকে সতীদাহপ্রথা নিবারিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়েছে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রভৃতির প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসে এ সবের বিবরণ পাওয়া যায়।

অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট'-এর রচনাকাল ১৮৮৭। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য এবং বিখ্যাত প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে ফিরে এসেই দেশের সর্ববিধ সংস্কার সাধনে মনস্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সংস্কার সভা' (১৮৭০) স্থাপন করেন। এই সভা সমগ্র ভারতের সামাজিক জীবনে একটি যুগান্তর আনয়ন করেছিল। এই সভার অধীনে তিনি 'পঞ্চবিধ-সংস্কার'—সুলভ সাহিত্য, গণশিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের সূত্রপাত করেন। এই পঞ্চবিধ সংস্কারের মধ্যে নারীশিক্ষা

বিস্তারের উদ্দেশ্যে আশ্রমের মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের জন্য 'বয়স্কা মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করে নারীসমাজের মুক্তির যে আদর্শ অনুসরণ করতে লাগলেন তা অগ্রসর ব্রাহ্মদলের মনঃপুত না হওয়ায় উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে ১৮৭২-এ 'তিন আইন' নাম দিয়ে 'সিভিল বিবাহ' বিধি প্রচারিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান নামক প্রথা এই সময় রদ হয় ; কন্যার বিবাহের বয়স (সারদা আইন), পাত্র-পাত্রির স্বাধীন মতামত অনুসারে বিবাহকে আইনের স্বীকৃতি দান, সিভিল বিবাহের অধিকার ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে নারীর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গীয় সমাজের অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা এর প্রভাবাধীন হয়েছিলেন সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের এই 'পঞ্চবিধ' প্রতিষ্ঠানের আদর্শে বোম্বাই প্রদেশে এবং বাংলার বাইরে বহু জায়গায় এই ভাবধারা ও কর্মধারা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রেঙ্গুন ও বেলুচিস্তান থেকে কোয়েম্বাটুর পর্যন্ত প্রায় সোয়া দুইশো ব্রাহ্ম সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭০ সালের পর দেখা যায় বিভিন্ন জেলায় উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকদের উদ্যোগে ব্রাহ্ম-হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ও সকল ধর্মের জাতির লোকদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন—ঢাকায় 'শুভ সাধিনী সভা' (১২৭৭) ত্রিপুরায় 'হিত সাধিনী সভা' (১৮৭২) প্রভৃতি। এইসব সভার কর্মধারা ছিল প্রধানত স্ত্রীশিক্ষা। কারণ সেটাই তখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সাধনার বিষয় ও লক্ষণ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা করতে পেরেছিল। এই সূচনার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি উদার অবিদ্বেষী গুণগ্রাহী মনোভাবের দৃষ্টিতে কেবল স্ত্রীশিক্ষার প্রতিই নয়, অন্ধ, বধির, অনাথদের আশ্রয় ও সেবা-শুশ্রূষার ও শিক্ষার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সময়েই আমরা দেখি মূক ও বধির বিদ্যালয় এবং অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের বাইরেও এইসব—'দাসাশ্রম', 'সাধনাশ্রম', 'অনাথালয়', 'হিতকারী সভা' প্রভৃতি নানা জায়গায় গড়ে ওঠে। এইসব দাসাশ্রম বা অন্যান্য আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানব সেবা। উনিশ শতকের নবপ্রবুদ্ধ বাংলার সমাজ ও দেশের অবহেলিত স্ত্রীজাতিকে নতুন মর্যাদা দান করে এর অগ্রগতির পথকে সুগম করবার যে প্রয়াস পাচ্ছিল, সে

কাজ যে কত কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তা অমৃতলাল বসুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলিতে আমরা জানতে পারি। আলোচ্য 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসঙ্গে উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা মিসেস কারফরমার চরিত্রটিকে বিকৃত রুচির উপরে তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়েছে; এবং নন্দলাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে নব্য কলেজি শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত যুবকের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার যে প্রয়াস এখানে দেখানো হয়েছে তা 'কেরিয়ারিস্ট' চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তবে একথা ঠিক যে বাঙালি শিক্ষিত যুব-সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের দ্বারা রক্ষণশীলতার অবরোধ কাটিয়ে চিরায়ত সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে সমুদ্র পার হতে শুরু করেছে।

এখানে পণপ্রথার কুফল দর্শানোর জন্য গোপীনাথ এবং তাঁর স্ত্রী গিন্নী চরিত্রদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য প্রহসনে নন্দলালের পিতা-মাতা তাদের শিক্ষিত ছেলেকে বিবাহ দিয়ে ঋণমুক্ত হবার স্বপ্ন দেখেন। পিতা-মাতা অর্থগৃধ্নু, তার ফলে ছেলেও হয় কেরিয়ারিস্ট। বাবা চাইছেন ছেলেকে মূলধন করে ঋণমুক্ত ও প্রতিষ্ঠাবান হবেন; অন্যদিকে ছেলে চাইছে বাবাকে অগ্রাহ্য করে নিজে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধরনের ছেলেরা নিজেদের আত্মোন্নতির বা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য পিতা-মাতাকে প্রবঞ্চনা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত ছেলের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অর্থগৃধ্নু পিতারও চৈতন্যোদয় হয়। তাঁকে বলতে শোনা যায়—"ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে—সেও ভাল কিন্তু কেউ যেন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর! অতি চামার! অতি কসায়ের কাজ!"

যাই হোক, গোপীনাথের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালের 'পণপ্রথা'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, তারই একটি প্রকাশ্য স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অন্যদিকে তখনও যে সমাজে কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন ছিল তারও নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়।

সব মিলিয়ে 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের মধ্য দিয়ে আমরা নারীজীবনের বহু অগ্রগতির পরিচয় লাভ করি। যেমন—স্ত্রীশিক্ষা, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (মিসেস কারফরমার উচ্চ শিক্ষিতা এবং নিজের নামেই তিনি পরিচিতা) পণপ্রথা বিরোধী মনোভাব, অশিক্ষিতা নারীকে বধূরূপে গ্রহণেও অনীহা। নন্দলাল বিলেত যাবার সময় তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে শিক্ষিতা এবং আধুনিকা করে গড়ে তোলবার ইচ্ছা প্রকাশ করে যায়।

প্রফুল্ল

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। এই নাটকের পূর্ববর্তী নাটক অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'। সেটি একটি প্রহসন। ওটা ছাড়াও আমরা অনেকগুলি প্রহসনমূলক নাটক আলোচনা করেছি। প্রহসন সম্পর্কে এর আগেও উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রহসন হচ্ছে লঘু আয়তনের লঘু মেজাজের হাস্যরসাত্মক ব্যাপার। এর মধ্যে সমাজ বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। প্রকৃষ্টরূপে হাস্যরস সৃষ্টি করাই এর ধর্ম। নাটক কিন্তু প্রহসন নয়। নাটক হচ্ছে সমাজ দর্পণ। তাই নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিফলন তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। আর নাটকের উদ্দেশ্য হল বাস্তব জীবনের যথাযথ প্রতিফলন। যা পরিচিত, যা প্রাত্যহিক, যা স্বাভাবিক তাকে উদ্‌ঘাটন করা হল সামাজিক নাটকের উদ্দেশ্য। বাস্তব জীবনের সমস্যাবহুল সংগ্রাম, বিকৃতি ও দুর্নীতি, বেদনা ও ব্যর্থতা নাটকের পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত হয়ে থাকে। নাটকের মধ্যে একটা গুরুগম্ভীর বাস্তব সমস্যার রূপায়ণ। 'প্রফুল্ল' একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। এই নাটকের তৎকালীন সমাজবাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমৃতলাল বসুর সমসাময়িক নাট্যকার হলেও তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের, বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে যৌথ পরিবারের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় এবং ভাঙন দেখা দিয়েছিল তাকেই দরদী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা যে সব স্ত্রীচরিত্র পাই তা হল—যোগেশের মাতা উমাসুন্দরী, যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদা, যোগেশের ভাই রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল ডাক্তার কাঙালীচরণের স্ত্রী জগমণি, দুজন খেমটাওয়ালী এবং বাড়ীওয়ালী ও একজন পরিচারিকা।

উমাসুন্দরী এতদিন ছিলেন যোগেশের সংসারের কর্ত্রী। এবার তিনি বৃন্দাবনবাসী হবেন। হিন্দু যৌথ পরিবারের গিন্নীদের কাম্য স্থান। এতদিন তিনি পুত্র, পুত্রবধু, নাতি, পরিজন সকলকে নিয়ে সংসার করেছেন। এবার থেকে তিনি সংসারের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে বৃন্দাবনবাসী হবেন। যাবার আগে তিনি জ্ঞানদাকে গৃহের প্রধান সম্পদ লক্ষ্মীর কৌটাটি দান করে যা বলেছিলেন সেটাই ছিল নারীজীবনের আদর্শ। তিনি জ্ঞানদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো;

মালক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হলে, দেওর দুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন রমেশ সুরেশও তেমনি। মেজ বৌমাকে যত্ন কোরো, মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজ বৌমাকে যত্ন কল্লে তোমাকে মার মতন দেখবে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল পার্বণ বার ব্রত যেমন আছে সকলগুলি বজায় রেখো, এখন গিন্নী হলে, সব দিকে বুঝে চোলো, বরং দুকথা শুনো তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্বাদ কুড়িও; আর কি বল্‌বো মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।''

এই উক্তির মধ্য দিয়ে যৌথ পরিবারের আদর্শই বড় হয়ে উঠেছে। বাড়ির বড় ছোট সকলকে আপন করে তাদের সুখী করেই গিন্নীদের সুখ। সেজন্য আমরা দেখতে পাই তিনি বৃন্দাবন যাবার সময় বামুন গিন্নীকেও সঙ্গে নিতে চাইছেন এবং নিজের জীবনের হিসাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ''আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখন তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি; কিন্তু বাবা, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিনজী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফিরতে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।''

যোগেশের কথায় আমরা জানতে পারি তার পিতার মৃত্যুর পর পাওনাদারেরা তাদের বাড়িখানা বিক্রি করে নিয়েছিল। তখন এই মাকে নিয়ে যোগেশ দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে অনেক দুঃখে, অনেক চেষ্টায় বিত্ত এবং সুখের মুখ দেখেছিল। তারই পরিণামে উমাসুন্দরী সকলকে সুখে শান্তিতে রেখে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে যোগেশ তাতেও সানন্দে স্বীকৃত হয়েছিল।

কাজেই উমাসুন্দরী চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন নারীজীবনের এবং নারীর অবস্থানের সুন্দর পরিচয় পাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উমাসুন্দরী বৃন্দাবনবাসী হননি। তৎকালীন 'রি-ইউনিয়ন' ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় যোগেশ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। তাকে ইনসলভেন্ট কোর্টে যেতে হবে। নইলে পাওনাদারদের মোকদ্দমায় তাকে জেল বাস করতে হবে। যোগেশ সত্যিই বলেছে, ''ত্রিশ

বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল—একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল।"

হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে যোগেশ মদকেই একান্ত নির্ভর বলে গণ্য করল। উমাসুন্দরী চেষ্টা করেও এই সর্বনাশ রুখতে পারেননি। তারই শিক্ষিত এটর্নি ছেলে রমেশের চক্রান্ত তিনি একেবারেই বুঝতে পারেননি। যোগেশ যখন তার এই অবস্থার কথা মাকে দুঃখের সঙ্গে বলেছিল তখনও তিনি কোনো প্রতিকার করতে পারেননি। যোগেশ বলেছিল, "তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাটলে তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার কল্লে, তার কি কল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখ্‌লুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি কল্লুম। রমেশ মাতাল দেখে সই করে নিয়ে গেল।"

মনের দুঃখে যোগেশ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মা উমাসুন্দরীও বড় অসহায়। তাঁর তো প্রধান ভরসা এই সন্তানেরা। যোগেশ যখন তার বাড়ি ঘর সব বিক্রি করেও পাওনাদারদের দেনা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন উমাসুন্দরী রমেশের বুদ্ধিতে সায় দিয়ে তাতে বাধা দিয়েছিলেন। বরং রমেশের কথা শোনার জন্যেই যোগেশকে চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কিছু রক্ষা হল না। রমেশের চক্রান্তে যোগেশ তার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই রমেশের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। সুরেশকে মিথ্যা চুরির দায়ে রমেশ জেলে পাঠিয়েছে। তাই যোগেশ মনের দুঃখে সম্পূর্ণরূপে মাতাল হয়ে গেল। স্নেহশীলা মাতা উমাসুন্দরী শেষপর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেলেন। আসলে তিনি যে পারিবারিক আদর্শ নিয়ে সংসার করেছিলেন, যুগের পরিবর্তিত অবস্থায় তার সঙ্গে তাল রাখতে তিনি পারেননি। সন্তান-সম্বল নারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটা আদর্শের, একটা অবস্থানের পরিবর্তন ঘোষিত হল।

দ্বিতীয় নারীচরিত্র জ্ঞানদা। জ্ঞানদা যোগেশের স্ত্রী। উমাসুন্দরী বৃন্দাবনবাসী হবার দিন বড় বৌমা জ্ঞানদার হাতে লক্ষ্মীর কৌটাটি দিয়ে বলেছিলেন, "মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমারে কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হলে।" সংসারের সমস্ত ভার, দায়-দায়িত্ব জ্ঞানদার উপর অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞানদা এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়। সে বলে, "না মা তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি সব গুছিয়ে করতে পারবো? তোমার আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর কন্নার কি জানি মা।"

জ্ঞানদার এই উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন গৃহবধূর প্রকৃত অবস্থান এবং

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানদা প্রকৃতই উমাসুন্দরীর ঘরের লক্ষ্মী। সে যোগেশের ঘরে আসার পর সংসারের বাড়-বাড়ন্ত। শাশুড়ি-মাতা তাকে যে দিকে ফিরিয়েছেন সে সেই ভাবে ফিরেছে। উমাসুন্দরী ঠিকই বলেন, "তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও। তোমায় আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর, ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।"

উমাসুন্দরীর হাতে গড়া জ্ঞানদা যথার্থ বাঙালি ঘরের আদর্শ কুলবধূ। সে পাতিব্রত্যের আদর্শে আদর্শায়িতা। সংসারের সকলের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে তার জীবন আবর্তিত। সংসারে পৃথকভাবে তার অন্য সত্তা নেই। যোগেশের বরাবর একটু আধটু মদ্যপানের অভ্যাস। স্বামীর অন্যান্য সব মেনে নিলেও তাঁর মদ্যসেবন করা জ্ঞানদা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। যোগেশ তার কাছে মদের বোতল চাইলে জ্ঞানদা বলে, "তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পুজো করিনি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন? দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে। ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়।" পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে তৎকালের সমাজে মদ্যপানের প্রচলন আভিজাত্যের নামান্তর হলেও অন্তঃপুরস্থ নারীরা সংস্কারবশত সুরাপানকে মেনে নিতে পারত না। খানিকটা ঘৃণা বা অসম্মানের চোখে দেখত। আলোচ্য নাটকে আমরা জ্ঞানদার উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে দেখি যোগেশের মদ্যপানে তার বিরক্তির প্রকাশ। যদিও জ্ঞানদা জানত কঠিন পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য যোগেশ মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মাত্রাধিক্য এবং প্রকাশ্যে স্বামীর মদ্যপানে তার অপত্তিই ছিল। 'রি-ইউনিয়ন' ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে যোগেশ সর্বস্ব হারানোর শোকে ভেঙে পড়লে জ্ঞানদা তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলে, "গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?" জ্ঞানদা বুদ্ধিমতী এবং ধৈর্যশীলা। সুখে, দুঃখে সে স্বামীর অনুবর্তিনী। সমস্ত নারীশক্তি দিয়ে সে স্বামীর এই দুর্দিনে তাঁর পাশে থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সদাতৎপর।

ধূর্ত রমেশ ছোট ভাই সুরেশের সম্পত্তির লোভে মিথ্যে চুরির দায়ে তাকে পুলিশে দিলে জ্ঞানদা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই বিপদের হাত থেকে তার যথাসর্বস্ব দিয়েও সে ছোট দেবরকে রক্ষা করতে চায়। যখন পীতাম্বরের কাছে জ্ঞানদা জানতে পারে সুরেশের জেল হয়েছে এবং এই কুকর্মের জন্য প্রতারক এটর্নি রমেশই দায়ী তখন জ্ঞানদার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। রমেশের উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শোনা যায়—"সে কি! সে কি চণ্ডাল?" পীতাম্বরকে বলে, "তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডবকা ছেলে, পাথর ভাঙালে বাঁচবে না।" এই উক্তির মধ্য

দিয়ে যৌথ পরিবারের স্নেহশীলা বড়বৌদির কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্রের জেলবাসের সংবাদে উমাসুন্দরীর বড় রকম সর্বনাশের আশঙ্কায় জ্ঞানদা প্রফুল্লকেও সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কাঁদিস নি কাঁদিস নি চুপ কর, মা শুনবেন।.....না না খপরদার। বলিস নি।........মা শোনে নি; তার জেল হয়েছে, শুনলেই মরে যাবে।" উল্লিখিত উক্তির মধ্য দিয়ে সংসারের সকলের জন্য জ্ঞানদার এই যে ভাবনা-চিন্তা এটা তাকে বড় এবং দরদী করে তুলেছে।

শেষ পর্যন্ত রমেশের চক্রান্তে স্বামীর দেনার দায়ে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসতে হয়। সব হারিয়ে স্বামী মদে উন্মত্ত, পুত্রশোকে শাশুড়ি উন্মাদিনী, একমাত্র পুত্র যাদব খিদের জ্বালায় পথ চলতে পারে না—জ্ঞানদা দিশেহারা হয়ে বলে, "হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে। ভিক্ষে কত্তেও জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?" এই দুর্দিনে ভাড়া বাড়িতে প্রফুল্ল এসে জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা করে তাদের দুর্দশা দেখে নিজের গলার হার দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে জ্ঞানদা তা নিতে চায়নি। প্রফুল্লর কথায় সে বলে, "মেঝবৌ, পর ভাবিনি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি। আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর বেড়ালে খেয়ে অরুচি, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হত সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সলতে পাকাতাম সে কাপড় যাদবের নাই; কখনও চন্দ্র সূর্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে চলেছি।"

অনাহারে অনিদ্রায় জ্ঞানদার মৃত্যুকালে যোগেশের সাথে তার দেখা হলে সে বলে—"তুমি এসেছ। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা কথা শোন; আমায় মার্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্বনাশ করেছি। আমি শিব পূজা করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলাম, আমার বরাতে সইল না। তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও তোমার সব হবে।"

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জ্ঞানদা তার সমস্ত দেনা-পাওনা, আশা-আকাঙ্খা, কর্তব্য থেকে অবসর গ্রহণ করল। জ্ঞানদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালের যৌথ পরিবারের অন্তঃপুরস্থ গৃহবধূদের প্রকৃত অবস্থান জানতে পাই।

যোগেশের পরিবারের ছোট বউ প্রফুল্ল রমেশের স্ত্রী। যৌথ পরিবারে সে সংসারে উমাসুন্দরী এবং জ্ঞানদার অনুগামিনী। তার স্বামী এটর্নি। কূটবুদ্ধির মানুষ। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় যোগেশ যখন হতাশায় দিশেহারা তখন রমেশ তার কূটবুদ্ধিতে একে একে যোগেশের সমস্ত সম্পত্তি নিজে বেনামি করে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ছোট ভাই সুরেশকেও মিথ্যা চুরির দায়ে জেলে পাঠিয়েছে। প্রফুল্ল

তার স্বামীর এই সব কুকাজের সাক্ষী। সে বাড়ির ছোট। তার কোনো কিছুতে পৃথক কোনো মতামত নেই। যোগেশের অসুস্থতায় সে দিশাহারা। সে যোগেশকে সুস্থ করার জন্য নিজের কানের মাকড়ি জোড়া এনে সুরেশকে দিয়েছে মাদুলি সংগ্রহের জন্যে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর ভবিষ্যৎ কল্যাণ কামনাই তার কাজ। সে সেজন্য একসঙ্গে দুটো মাদুলির কথা বলেছে—একটা যোগেশের এবং একটা রমেশের জন্যে। কিন্তু রমেশ এই মাকড়ি চুরির দায়েই সুরেশকে জেলে পাঠিয়েছে। প্রফুল্ল জানে এসব ডাহা মিথ্যে। সে সুরেশকে উদ্ধার করবার জন্যে রমেশকে অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু রমেশ প্রফুল্লকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাবার জন্যে প্রফুল্লর উপরে জোর জবরদস্তি করে। রমেশ চায় প্রফুল্ল যেন বলে, সুরেশ তার বাক্স ভেঙে মাকড়ি নিয়েছে। প্রফুল্ল জানে মিছে কথা কইলে নরকে যেতে হয়। কিন্তু রমেশ বলে, "আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস স্বামী গুরুলোক। স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।" স্বামীর কথা এবং জোর-জবরদস্তি স্ত্রীকে মান্য করতেই হয়। প্রফুল্ল অতি সাধাসিধে নারী। তার মধ্যে কোন কুটিলতা নেই। সেজন্য রমেশ প্রফুল্লকে নিজের কুমতলবে ব্যবহার করে। প্রফুল্লকে দিয়েই সে তার মাকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারিত করে কাগজে সই করিয়ে নেয়। রমেশ বিপর্যস্ত যোগেশ ও তার পরিবারের লোকজনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাড়াবার সময় ছল করে রমেশ প্রফুল্লকে বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রফুল্ল যখন ঘটনাটা জানতে পারে, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে জ্ঞানদাকে জিজ্ঞেস করে, "ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন করে? মা আমায় কি বলে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি করে শুনবো—মিছে কথা কি করে শুনবো?" স্বামীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই স্ত্রীদের কাজ। কিন্তু স্বামী যদি অন্যায় করে, মিথ্যাচারণ করে তাহলেও কি স্বামীর অনুসরণ করা উচিত?" অতি সুন্দর ভাবে গিরিশচন্দ্র তৎকালীন সমাজের কাছেই এই প্রশ্ন রেখেছেন।

প্রফুল্লর মতো অতি সরলচিত্ত নারীর মনেও এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রফুল্ল সরলমতি হলেও বোকা ছিল না। জগমণি যখন জ্ঞানদার কাছে সুরেশের হ্যান্ডনোটের টাকা আদায় করতে এসেছে তখন প্রফুল্লই অন্তরাল থেকে সব কথা শুনে বলেছে, "ও মাগী মন্তর পড়ছে।" উমাসুন্দরী শেষ পর্যন্ত পুত্রশোকে পাগল হয়ে গেল।

প্রফুল্ল স্বাভাবিক ভাবেই যোগেশের ছেলে যাদবকে বড়ই ভালোবাসত। তাই সে কখনও তার অকল্যাণ কামনা করতে পারেনি। জগমণি-কাঙালিদের সঙ্গে

চক্রান্ত করে রমেশ যাদবকে খুন করতে চেয়েছিল এবং প্রফুল্লকে যোগেশের পরিবারের সকলকে রমেশের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছিল। প্রফুল্ল এসেও ছিল। কিন্তু তাদের নিয়ে যায়নি। প্রফুল্ল জ্ঞানদাকে বলেছে, "দিদি এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়া আসছি বলে এসেছি; কিন্তু দিদি তোমাদের নিয়া যাব না, তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খপরদার যেও না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিনসে ডান, যেদো বলে কি ফিস্ ফিস্ কথা কয়, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খপরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেও না।"

প্রফুল্ল সত্যিই যৌথ পরিবারের এক আদর্শ নারী। সে জ্ঞানদাকে বলে, "আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের।" জ্ঞানদা ভাড়া দিতে অক্ষম হলে বাড়িওয়ালি তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইলে প্রফুল্ল বাড়িওয়ালিকে জ্ঞানদাদের বাড়িভাড়ার জন্য নিজের হারছড়া দিতে চেয়েছিল। সে জ্ঞানদাদের দুর্দশা দেখে তাকে সাহায্য করার জন্য অর্থও দেয়।

অবশেষে রমেশ ও জগমণি যাদবকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করলে এই প্রফুল্লই সুরেশের সাহায্যে যাদবকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। পাগলিনি শাশুড়ি উমাসুন্দরীকে সে সেবা যত্ন করে।

একদিকে উন্মাদিনী শাশুড়ি অন্যদিকে তার প্রাণের ধন যাদবের চিন্তায় প্রফুল্ল কাতর হয়ে পড়েছে। জ্ঞানদা মৃত। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর রমেশ মদনকে দিয়ে হত্যার সব ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ধর্মভীরু মদনের কাছ থেকে প্রফুল্ল যাদবের সন্ধান পায়। না খাইয়ে রমেশ তাকে প্রাণে মেরে ফেলেছিল। সেই পাগলা মদনের সাহায্যে প্রফুল্ল যাদবকে উদ্ধার করে। রমেশ তখনও প্রফুল্লর কাছ থেকে যাদবকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং প্রফুল্লকে খুন করবার ভয় দেখায়। তখন প্রফুল্ল তার স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, "তুমি এখনও প্রতারণা করছো? তোমায় অধিক কি বলবো; তুমি কার জন্যে সর্বনাশ করছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করছো, কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছো? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার করছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করছে? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক। আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার এ মহাপাতকে লাভ কি?"

প্রফুল্ল তখন বেপোরোয়া। খুন হয়ে যাওয়ার ভয়েও সে ভীত নয়। সে তখন স্বামীকে বলেছিল, "তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ

নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণ ভয়ে পালাব? প্রাণ ভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য করতে দেব? আমি ধর্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই......।" শেষপর্যন্ত রমেশ প্রফুল্লকে গলা টিপে মেরে ফেলল। মৃত্যুর মুখে প্রফুল্ল সুরেশকে বলেছিল,. "যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মার জন্য জোর করে প্রাণ রেখেছিলাম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়ে সর্বনাশ করেছিলাম, তুমি আমায় মার্জনা কর; আমি জানতেম না এই সংসারের এত প্রতারণা।" মৃত্যুকালেও সে স্বামীকে কোনো অভিশাপ দেয়নি বরং বলেছিল, "জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়"।

আদর্শচ্যুত ধনলোভী প্রতারণাপূর্ণ পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রফুল্লর মতো নারীচরিত্রের মধ্যেই ধর্মভয়, সার্বিক কল্যাণ চিন্তা বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। জগমণি চরিত্র অবশ্য প্রফুল্ল চরিত্রের বিপরীত। স্বার্থপরতা, কুটিলতা, ধনলোভ প্রভৃতি নীচগুণ নারীর মধ্যেও বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। তার স্বামী কাঙালীচরণ নামে ডাক্তার। জগমণি বহুরূপী। চাপরাশিরূপে সে বিল সাধে, খানসামা রূপে তামাক দেয়, আর বিদ্যেধরীরূপে সে টাকা ধার দেয়। সুরেশ তার কাছে টাকা ধার নিতে আসে। তারা মামলাবাজও বটে! জগমণি আবার রমেশের কাছে নিজেকে কম্পাউন্ডার বলে পরিচয় দেয়। জগমণির স্বামী কলকাতার এটর্নির ক্লার্কগিরিও করে এসেছে। কাঙালীচরণ রমেশের গোপন খবর রাখে। রমেশ একবার রানাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরারি হয়েছিল। রমেশের নামে ওয়ারেন্ট বার করার জন্যে সে-স্ত্রীলোকের ভাইপো কাঙালীচরণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়েছিল। রমেশ পাঁচবার এগজামিনে ফেল করে তবে এটর্নি হয়েছে। সে এই কাঙালীচরণকে তার কেরানি করতে চায়। জগমণি তাদের কথাবার্তার মধ্যেই একটা দুর্নীতির গন্ধ পায়। সে অমনি রমেশের সঙ্গে খাতির জমাতে ব্যস্ত হয়। রমেশ আসলে এই জগমণির সাহায্যে সুরেশের বিষয়ের স্বত্ব হাতিয়ে নিতে চায়। জগমণি এই কাঙালীচরণের উপযুক্ত স্ত্রী—বুদ্ধিরূপিণী। সে কেবল কাজের কথা বোঝে। জগমণি রমেশকে বলে, "আমায় বিদ্যেধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়, এখন কাজের কথা বল।"

জগমণি কাঙালীচরণের চেয়েও বুদ্ধিতে দড়। সে প্রথম সাক্ষাতেই রমেশের মতলব আন্দাজ করে নিয়েছে। সে বুঝেছে শিগগির ওদের ঘরোয়া বিবাদ

বাধবে। আর রমেশ দশ-বিশটি জাল করতে ওস্তাদ। আর কাউকে নিশ্চয়ই সে বিষ্ খাওয়াবার মতলব করেছে। সে জন্য কাঙালীচরণকে তার ক্লার্ক করেও ডাক্তারখানা বজায় রাখতে বলেছে।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই এই কাঙালী ও জগমণি রমেশের সব রকম চক্রান্ত এবং কুকর্মের সঙ্গী।

উনিশ শতকে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে এবং তাদের স্বার্থেই স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছে। তারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পুরনো ঐতিহ্য এবং সামাজিক নীতিবোধ থেকে বঞ্চিত। এই শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে 'উকিল' একটা প্রধান অংশ। এছাড়াও আছে কেরানি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার ইত্যাদি।

'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা একটি পরিবারের পরিচয় পাই—যে পরিবার ছিল একটি যৌথপরিবার। সেই সংসারের প্রধান যোগেশ। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যখন পাওনাদারেরা তাঁদের বাড়িখানা বেচে দিলে তখন দুই অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে এবং মাকে নিয়ে তিনি একটা খোলার ঘর ভাড়া করে বাস করছিলেন। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধীরে ধীরে তিনি যে বিষয় আশয় করেছেন তাতে ভাইদের সম্পূর্ণ অংশীদার করেছেন। স্ত্রীর নামেও একখানি বাড়ি করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে তাহলে তারই ভাড়া থেকে তার চলে যাবে। আর মায়ের নামে খানকতক কোম্পানির কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। মাসে মাসে তার সুদ বৃন্দাবনবাসী মাকে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা রমেশ এটর্নি হয়েছে। উকিল পাড়ার বাড়িখানা তার ভাগে রেখেছেন। আর ছোট ভাই সুরেশ বাউন্ডুলে। কিন্তু তাকেও তিনি বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে চাননি এবং ভবিষ্যতে যাতে নিজেদের মধ্যে কোনো অবনিবনা না হয় সেজন্য তিনি ব্যাঙ্কে যে নগদ টাকা থাকবে তাকেও তিনি ভাগ করতে 'অ্যাডভাইস' করেছেন।

যোগেশের মধ্যে তৎকালীন বিত্তবান লোকদের বিষয়বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগেশ রমেশকে বলেছিলেন, "আমার বিবেচনায় কলকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী বাকরী করে আনছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে; যেই একজন চোখ বুজলো অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হল; কি খায় তার আর উপায় নাই।" তাই তিনি টালায় একখানি দেবোত্তর বাড়ি করেছেন যাতে অনাথা গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে তাতে থাকতে পারে। যোগেশ সে বাড়ির ট্রাস্টিও করেছেন তার উকিল ভাই রমেশকে। আমরা এই বিবরণ থেকে

তৎকালের কলকাতা শহরের আদর্শ এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কথা জানতে পারি। যিনি সংসারের স্ত্রীলোকদের কথা, পাড়ার দুঃস্থ অনাথ মানুষের কথা ভাবেন এবং নিজের স্বোপার্জিত বিষয়েও ভাইদের সম্পূর্ণ অধিকারী করে অবসর জীবন যাপন করতে চান। কিন্তু আমরা দেখতে পাই আলোর নিচে অন্ধকারের মতো এই আদর্শবান মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহু কূট, লোভী, চক্রান্তকারী মানুষও বর্তমান আছে।

সেই সময়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা আমরা জানি। ব্যবসায়, বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। সেকালের 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র কথা আমরা ঠাকুর বাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী থেকে জানতে পারি। "দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে কয়েকজন সাহেবকে লইয়া কলকাতায় 'য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন।" (দ্র. রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ.-৫)। ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। এই নাটকেও 'রি-ইউনিয়ন' ব্যাঙ্কের লালবাতি জ্বালাবার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কথা আছে। আর ব্যাঙ্ক ফেল পড়তেই যোগেশ একেবারে ফকির হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয়ে যথার্থই লিখেছিলেন, "আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতনকাল সবে এসে নামল।" আমরা এ নাটকেও দেখি এই দুকালের একটা সন্ধিক্ষণের উপস্থিতি। পুরাতন কালের মেয়ে পুরুষের কথা বলার ভাষা ছিল একটি বিশেষ ভঙ্গির, বেশভূষা, চাল-চলনের মধ্যে ছিল আভিজাত্যের গর্ব। এই সব আভিজাত্যের মধ্যে ইউরোপীয় আধুনিকতা নানাভাবে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। আমরা অবশ্য এই নাটকে আধুনিকতার ভালো দিকের কোনো কথার পরিচয় পাই না। আমরা পাই কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সবরকম ন্যায় নীতির বিসর্জন এবং নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য যে-কোনো হীন উপায় অবলম্বনের কথা। এই নাটকে একদিকে যেমন আছে যোগেশ, যোগেশের মা, স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূর কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে একটা আভিজাত্য, অন্যদিকে রমেশ ও তার সহচরদের ও সহচরীর মধ্যে তথাকথিত 'আধুনিক আদর্শচ্যুতি'। অন্যদিকে সুরেশ এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের আচার-আচরণের মধ্যেও বাউণ্ডুলেবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, মদ্যাসক্তি ইত্যাদির পরিচয় পাই। জগমণি খেমটাওয়ালিদের পরিচয়ের মধ্যে এই বিকৃতিরই নিদর্শন আছে।

আমরা যোগেশের বিবেচনায় দেখতে পাই নারীরা গৃহবন্দী হলেও একটা সম্মানের জায়গায় নীতিবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে তারাও

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আশ্রিতা। পুরুষের ভাগ্যবিপর্যয়ে তারা ভীষণ অসহায়। যোগেশের ভাগ্যবিপর্যয় শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যে, অনাহারে, অর্ধাহারে যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদাকে মরতে হয়। যোগেশের মা উমাসুন্দরীকে উন্মাদ হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। কিন্তু এই নাটকের প্রফুল্ল এই নতুন পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি। সে তার স্বামীর সহধর্মিণী হয়েও তার নীতিধর্মকে বিসর্জন দিতে পারেনি। রমেশের কুকীর্তি এবং প্রতারণা সে বুঝতে পারে। তবু পুরাতন রীতি অনুযায়ী স্বামীর অনুগমন এবং অনুসরণ-ই যে স্ত্রীদের একান্ত ধর্ম—সে সম্পর্কে প্রফুল্লের মনে প্রশ্ন জেগেছে। রমেশ তার চক্রান্তে এবং গোপন অভিসন্ধিতে তার স্ত্রীকেও কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রফুল্ল যখন সব বুঝতে পারল তখন সে কিন্তু স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিনী হয়নি। বরং স্বামীকে সে বলেছিল, "আমি মিছে কথা বলতে পারবো না; ঠাকরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।" কিন্তু রমেশ বলে, "আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছিল জানিস, স্বামী গুরু লোক, স্বামীর কথা শুনতে হয়।"

প্রফুল্ল কিন্তু তবুও সব জেনে-শুনে স্বামীর কথা শুনতে নারাজ। জ্ঞানদার কাছে সে বলে, "ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন করে? মা আমায় কি বলে দিয়েছিল— স্বামীর কথা কি করে শুনবো—মিথ্যো কথা কি করে শুনবো? দিদি আমি খাব না, কিছু করবো না, আমি মরবো।"

প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত স্বামীকে অমান্য না করলেও স্বামীর কথায় মিথ্যাচরণ করেনি। যাদবকে রমেশ যখন হত্যার চেষ্টা করেছিল, এমন কি প্রফুল্লকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছিল তখন প্রফুল্ল বলেছিল, "তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণ ভয়ে পালাবো? ....আমি ধর্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই।" শেষ পর্যন্ত রমেশ প্রফুল্লকে গলা টিপে হত্যা করে। তবু প্রফুল্ল অন্যায়ের পথে যায়নি। বরং মৃত্যুর পূর্বে সে সুরেশকে বলেছে, "আমি জানতেম না এ সংসারে এত প্রতারণা।" প্রফুল্ল মৃত্যু বরণ করল। কিন্তু নিজের সত্যধর্মকে সে বিজর্সন দেয়নি।

আমরা এই নাটকের মধ্যে একটা প্রতারণাপূর্ণ পরিবেশে নারীর সত্যধর্মের জন্য আত্মবলিদানকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম নারীও নবজাগরণের পথে হিন্দুপরিবারে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

রাজা ও রানী

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের সমকালে রবীন্দ্রনাথ একটি নাটক লিখেছিলেন—'রাজা ও রাণী'। রবীন্দ্রনাথ পরে (১৩৩৬ সনে) এই নাটকের পরিমার্জন করে নাম দেন 'তপতী'। 'তপতী'র ভূমিকায় এই পরিমার্জনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতীর' মধ্যে নাট্যরচনার যে দোষ ও গুণের কথা বলেছেন তা আমাদের আলোচ্য নয়। 'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যে নারীচরিত্রের যে অবস্থান সেটাই আমাদের বিবেচ্য। 'রাজা ও রাণী' নাটকের পূর্বে একটি 'সূচনা' আছে তাতে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল।" আমাদের আলোচনায় যেহেতু নাটক বিচার প্রধান নয়, সেইজন্য এই উক্তি সম্পর্কে আমরা কোনো আলোচনাই করছি না।

রবীন্দ্রনাথের নাটক যে তত্ত্বপ্রধান সে কথা সুবিদিত। 'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যেও একটি তত্ত্বকথা আছে। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই সূচনায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বাস্তব থেকে ভ্রষ্ট হলে সত্য হতেই ভ্রষ্ট হতে হয়।" এই নাটকের রাজা বিক্রমদেব প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছেন। "সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনিই জোগাতে পারে না। তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে। রানি সুমিত্রা ও রাজা বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের (আসক্তির) অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল—এটাই 'রাজা ও রাণীর' মূলকথা। এই তত্ত্বকেই তিনি একটি ঐতিহাসিক আবরণের মধ্যে বিবৃত করেছেন। এখানে বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা এবং তার মহিষী সুমিত্রা কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেনের ভগিনী। মূল দ্বন্দ্ব রাজা ও রানির মধ্যে হলেও সে কাহিনী ফুটিয়ে তুলতে তিনি রাজার অমাত্য, তার সেনাপতি, ত্রিচূড়ের রাজা ও রাজকন্যা ইলা প্রভৃতির কথা এনেছেন।

এই নাটকে মোট চারটি নারীচরিত্র আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন রাজমহিষী সুমিত্রা। রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্তের স্ত্রী নারায়ণী, কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের মহিষী রেবতী এবং ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজের কন্যা ইলা। তিনি

আবার কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ কুমারসেনের সঙ্গে বিবাহ-পণে আবদ্ধ।

রাজা বিক্রমদেব রানি সুমিত্রার প্রেমে অন্ধ। রাজকার্যে তিনি ভয় পান। মন্ত্রীপরিষদদের দেখলে তিনি পালিয়ে বেড়ান। ফলে "রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহাকার রবে।" রানির কাশ্মীরি কুটুম্বরা দেশজুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। বিদেশীয় অত্যাচারে 'জর্জর কাতর কাঁদে প্রজা।' রাজ্য জুড়ে এক অরাজক অবস্থা। রাজা প্রজাদের এই কাতর অবস্থায় ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি কেবল রানির অন্দরমহলে প্রেম পিপাসায় অস্থির। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। রাজপথে কিনু নাপিত, মনসুখ চাষা, জওহর তাঁতি প্রভৃতিরা বলতে আরম্ভ করেছে তারা শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরবে। রানি সুমিত্রা কিন্তু রাজার এই একান্ত প্রেমসম্ভোগে অখুশি। তিনি বলেন, "অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী"। রাজকার্য বাদ দিয়ে রাজাকে তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। রাজা যতই বলেন, "বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ"। ততই রানি সুমিত্রা বলেন, "আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।" রাজসখা দেবদত্তের কাছে সুমিত্রা শুনতে পান প্রজাদের দারিদ্র্য, আর্ত চিৎকার। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজাকে এই সব কথা বোঝাতে পারেন না। রাজা শুধু বলেন, সকল কর্তব্যের চেয়ে প্রেম গুরুভার। প্রেম হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য। সুমিত্রা তবু বলেন, তিনি কেবল রাজরানি নন, তিনি রাজ্যের প্রজার জননী। প্রজাদের করুণ ক্রন্দন তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। তিনি নিজেই মন্ত্রীর সঙ্গে এর প্রতিকার করার পরামর্শ করেন। অবশেষে পিতৃসত্য পালনের জন্য যেমন রাম বনে গিয়েছিলেন, তিনিও পতিসত্য পালনের জন্য রাজ অন্তঃপুর ত্যাগ করেন। দেবপূজার ছলে ছদ্মবেশে পিতৃগৃহ কাশ্মীরে চলে যান। কাশ্মীরে তার একমাত্র সাথী হয় ভ্রাতা কুমারসেন। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বিক্রমদেব কাশ্মীররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কুমারসেন এবং সুমিত্রা ত্রিচূড় রাজ্যে পালিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তারা অব্যাহতি লাভ করেননি। বিক্রমদেব আরও বেশি করে হিংস্র হয়ে উঠেছেন। বিদেশি রাজসেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে। অবশেষে সুমিত্রা এবং কুমারসেন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিক্রমদেবের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু আত্মসম্মান নিয়ে রাজসভায় বিক্রমের কাছে ধরা দেওয়া কুমারের পক্ষে অসম্ভব। তাই শেষপর্যন্ত সুমিত্রা রাজসভায় বিক্রমদেবের কাছে আতিথ্যের উপহার হিসাবে কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিক্রমদেবের হাতে কুমারের শেষ উপহার

অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমদেবের সত্য উপলব্ধি হল।

এখানে সুমিত্রা তাঁর ভাই-এর ছিন্নমুণ্ড এবং নিজের আত্মবলিদান দিয়ে বাস্তব থেকে বিচ্যুত কর্তব্যভ্রষ্ট বিক্রমদেবের মোহমুক্তি ঘটিয়েছিলেন।

এই নাটকের অন্যান্য নারীচরিত্র রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বকথা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করেছে। রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্তের স্ত্রী নারায়ণী। তিনি গৃহকার্যে নিযুক্তা। গৃহকাজেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। দেবদত্ত রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত ভিক্ষুক জুটিয়ে আনেন, আর তাদের খাবার যোগান দিতে নারায়ণী অস্থির। নারায়ণী যথার্থই স্বামীর কর্মসঙ্গিনী। নারায়ণী অন্তঃপুরচারিণী হলেও তিনি রাজ্যের সব খবরই রাখেন। সুমিত্রা রাজ্য ত্যাগ করলে নারায়ণী বলে, "আমাদের রানীর মত অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।" নারায়ণী এবং দেবদত্তের পারিবারিক জীবন বিক্রম-সুমিত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁদের দাম্পত্য জীবন খুব মধুর।

রেবতী কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের মহিষী। রেবতী একটি কুটিল চরিত্র। কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেন চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেও তার প্রতি রেবতীর কোনো মায়া-মমতা বা স্নেহ নেই। বিক্রমদেবের যুদ্ধ কুমারের বিরুদ্ধে। আর রেবতী, চন্দ্রসেন ও কুমারদ্রোহী। রেবতী কুমারের ধ্বংস কামনা করেন। বিক্রমদেবকে সে বলে—আগুন জ্বালাও। শস্যক্ষেত্র ছারখার করে দাও। বিক্রমদেবও এই হিংস্রনারীর ক্রূরতায় বিস্মিত হয়ে যান। নারীর মধ্যেও যে একটা পিশাচরূপ আছে এ তার এক উদাহরণ।

ইলা ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজের কন্যা। কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেনের সে বাগদত্তা। এই নাটকে ইলার প্রেয়সী রূপই প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লিরিকের প্লাবন বয়ে গেছে। কুমারের কাছে সে সুমিত্রার কথা শুনে তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইলা এক সরল বালিকা। রাজ্যের কূটনীতি, রাজনীতি সে কিছু বোঝে না; সে শুধু জানে কুমারসেনকে। তাই তার পিতা যখন তাঁর রাজত্বের সঙ্গে ইলাকেও রাজা বিক্রমদেবের হাতে সমর্পণ করেছিলেন তখন ইলা কিন্তু বিক্রমদেবের ভালোবাসায় তার কুমারের প্রতি প্রেমকে বিসর্জন দিতে পারেনি। বিক্রমদেব যে প্রেমের মোহে নিজের রানিকেও বিসর্জন দিয়েছিলেন, ইলার মধ্যে তিনি সেই প্রেমের এক

নিষ্ঠাবানরূপ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। ইলাকে দেখেই বিক্রমদেবের যুদ্ধ পিপাসা দূর হয়েছিল; ইলার এই প্রেমময়ী সত্তাই বিক্রমদেবকে মুগ্ধ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা দেখেছি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীর অবস্থান। সেখানে প্রফুল্ল গৃহবধূ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সে জানে স্বামী তার পরম আশ্রয় এবং পরম ধর্ম। তাঁকে অনুসরণ করাই স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। কিন্তু প্রফুল্ল তার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছে তার স্বামী কপটচারী, মিথ্যাবাদী, ছলচাতুরীতে অভ্যস্ত। সে তার ছোট ভাইকে মিথ্যা চুরির অপবাদে জেল খাটিয়েছে; দুষ্ট লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে একমাত্র বংশধর তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত করেছে। গৃহবধূ হয়েও প্রফুল্ল নিজের অভিজ্ঞতায় যা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে সে স্বামীকে সমর্থন করতে পারেনি; এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামীর হাতে প্রফুল্ল প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

'রাজা ও রাণী' নাটকেও আমরা দেখতে পাই রাজরানি সুমিত্রা নিজের স্বামীকে বাস্তব এবং কর্তব্যনিষ্ঠ করে তোলবার জন্য স্বামী-সঙ্গ পরিত্যাগ করে পিতৃরাজ্যে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেখানেও পুরুষের বা স্বামীর ক্রোধ থেকে তিনি অব্যাহতি পাননি। রানির এই আচরণকে রাজা ভুল কিংবা অহমিকাবশত নারীর দম্ভ বলে মনে করেছেন এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য সৈন্যদল নিয়ে তাড়া করেছেন। রানির পিতৃরাজ্য অধিকার করেও তাঁর শান্তি হয়নি। তিনি রানির আশ্রয়দাতা তার ভাই কুমারসেনের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। নিজের স্বামীকে শান্ত করবার জন্য রানি সুমিত্রাকে শেষ পর্যন্ত তার ভাইয়ের ছিন্নমুন্ড উপহার দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হল। এখানে 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রফুল্লর সঙ্গে রানি সুমিত্রার এক অদ্ভুত মিল আছে—পুরুষের ক্রোধ এবং অহমিকাকে প্রশমিত করবার জন্য নারীকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে—তবু নারী সত্যভ্রষ্ট হয়নি।

আবার ত্রিচূড়ের রাজা অমরুরাজ রাজা বিক্রমদেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর হাতে রাজত্বের সঙ্গে আপন কন্যা ইলাকেও সমর্পণ করতে প্রস্তুত হলেও ইলা কিন্তু বিক্রমদেবের আগ্রহে কুমারের প্রতি তার প্রেমকে বিসর্জন দিতে পারেনি। ইলা মনেপ্রাণে জানে সে কুমারের বাগদত্তা। যে-জীবন সে কুমারকে অর্পণ করেছে—তা সে গ্রহণ করুক আর না-ই করুক— সেটা তাঁর

ইচ্ছা; —তা বলে অন্য কাউকে সেই প্রেম ইলা দিতে পারবে না। কুমারই তার ইহকাল পরকাল। পিতার বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে ইলার এই যে প্রতিবাদ—এটা তার সহজাত নারীশক্তি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সামান্য নারীর এই একনিষ্ঠ ভালোবাসার রূপ প্রত্যক্ষ করে বিক্রমদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুমিত্রার প্রেমের সততার প্রতি রাজার শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল; রানি সুমিত্রার প্রতি ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়ে বিক্রমদেবের আত্মশুদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। ইলাও কুমারের শোকে আত্মবিসর্জন দিয়েছে; তবুও সে তার অবিচল প্রেমের জন্য সত্যভ্রষ্ট হয়নি।

'প্রফুল্ল' নাটকের পিশাচী জগমণির অনুরূপ নারীচরিত্র কাশ্মীর-রাজমহিষী রেবতী। এখানে আমরা দেখতে পাই দুর্বলচিত্ত রাজা চন্দ্রসেনকে বাধ্য হয়েই মহিষীর ইচ্ছার দাস হতে। কাশ্মীর রাজ-সিংহাসনের প্রতি যে দুর্বার আকাঙ্খা তাকে পেয়ে বসেছিল সেই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এই হিংস্র নারীর জঘন্য চক্রান্ত রাজ-পরিবারে কালছায়া নেমে আসে। সুমিত্রাচরিত্রের বিপরীত এই রেবতীচরিত্র। সুমিত্রা প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যথাসর্বস্ব স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। ত্যাগের ধর্মে সুমিত্রাচরিত্র সমুজ্জ্বল। সেখানে ভোগবিলাসী রেবতী রাজসিংহাসনের লোভে কুমার, ইলা, সুমিত্রা তথা অগণিত প্রজাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

'প্রফুল্ল' এবং 'রাজা ও রাণী' সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। দুইটি নাটকেরই প্রকাশকাল ১৮৮৯। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি উনিশ শতকে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে, বিধবাবিবাহ আইন প্রচলিত হয়েছে। রাজা রামমোহনের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে বিরাট নারী জাগরণ ঘটেছে। অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠেছে। 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে, (১৮৬৭)। এর কয়েক বছরের মধ্যে ১৮৭৬-এ 'ভারতসভা' এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা দেখেছি এইসব আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে না হলেও অনেক নারীও অংশ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষায়-দীক্ষায় নারীজীবনে অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থানে দেশের মধ্যে, বিশেষ করে, বঙ্গসমাজে সংস্কার-আন্দোলনের তরঙ্গ উঠেছিল। 'কলিকাতা কালেজ' নামে

যে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেটা নবীন ব্রাহ্মদলের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সর্ববিধ সদালোচনার জন্য 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়েছিল। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়—"সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে স্বীয় স্বীয় পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির শিক্ষা বিধানে মনোযোগী হন।" (দ্র. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ.-২২৩)।

'বামাবোধিনী' পত্রিকা এবং 'ব্রাহ্মিকাসমাজ'-এর কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাতে আমরা দেখেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে বন্ধু-সম্মেলনে যেতেন। তার ফলে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে দেশমধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কী নবীন ব্রাহ্মরা জাতিভেদের নিন্দা করলেন, একত্রে পান-ভোজন করলেন। ১৮৬৪ সাল থেকেই তাঁরা বিভিন্ন জাতীয় নর-নারীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এইসব আন্দোলন কেবল কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গেও প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে ঢাকায় 'ইডেন ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৬ সালে ব্রজসুন্দর বাবু নিজের গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নারীরা প্রকাশ্যে উপাসনা মন্দিরে পুরুষদের সঙ্গে বসার অধিকার লাভ করেছিলেন। কাদম্বরী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। এরপর থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মহিলারাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসতে থাকেন। যেমন—কামিনী সেন, বিধুমখী বসু, মোহিনী খাস্তগীর, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলাদেবী প্রভৃতি। এই মহিলারা শুধু উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নি; বিভিন্ন পেশাও গ্রহণ করেন।

১৮৭২ সালে 'তিন আইন' নামে একটি 'সিভিল বিবাহ' বিধি প্রচারিত হয় এবং ১৮৬৯ সালে 'ডাইভোর্স' আইন পাশ হয়। ১৮৭২ সালেই ব্রাহ্মদের

মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এভাবেই আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের শেষদিকে নারীর অবস্থানের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত সংস্কার সভা' নামে যে সভা স্থাপন করেছিলেন তার অন্যতম কার্যসূচিই ছিল স্ত্রীশিক্ষা। এ বিভাগের বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলা হল। তাতে অনেক বয়স্কা মহিলারা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কুমারী এক্রয়েডের 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে'র কথাও উল্লেখ করা যায়। কুমারী এক্রয়েড ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ গার্টেন কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার দুরবস্থার কথা শুনে এদেশে তাদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ওই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নাম ধারণ করেছিল; এবং কয়েক বৎসর পরে এই বিদ্যালয় বেথুন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। আলোচ্য পর্বে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের ফলে নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নানা ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়।

'রাজা ও রাণী' নাটকে রানি সুমিত্রা ও রাজা বিক্রমদেবের কাহিনী তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হলেও আমরা এ নাটকের মধ্যে সুমিত্রার ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বামীকে সত্যনিষ্ঠ করবার প্রয়োজনে তাঁর গৃহত্যাগের মধ্যে নারীর এক উন্নত অবস্থানেরই পরচয় পাই। এই নারী 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের নারীচরিত্র থেকে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। এই অগ্রসরতার মূলে ছিল উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন। তবে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যতই দেখা দিক না কেন পুরুষ-সমাজ তাকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। রাজা বিক্রমদেবের কাছে মনে হয়েছিল ''এ নারীর দম্ভ''—সেই দম্ভকে চূর্ণ করবার জন্যই তিনি সসৈন্যে কাশ্মীর রাজ্য এবং ত্রিচূড় রাজ্যে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই রানি সুমিত্রা রাজার এই পরাক্রমের কাছেও নতি স্বীকার করেননি। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে নিজেও আত্মবলিদানের মাধ্যমে ক্ষমতায় প্রমত্ত স্বামী তথা পুরুষকে সচেতন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমরা এ প্রসঙ্গে আমেরিকার এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী সোর্জানার 'ট্রুথ'-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি ১৮৫১ সালে এক সভায় বলেছিলেন, ''মাঠে লাঙ্গল টেনেছি আমি, শস্যের বীজ বপন করেছি চষা খেতে, ফসল পাকলে তুলেছি গোলায়। কোনো মরদ কাজে আমাকে হারাতে পারেনি। পুরুষের সমান খেটেছি। সেই সভার পুরুষ অভ্যাগতরা এই নারীর প্রতি সদয় ছিল

না। কারণ তিনি কৃষ্ণাঙ্গ, তিনি নারী এবং তিনি স্বাধীনচেতা। কিন্তু সাহসী, স্পষ্ট এবং ঋজু সত্যভাষণের সামনে সেই বিরূপসভাও শেষ পর্যন্ত নত হয়েছিল।" (দ্র. বন্দী নারী, সম্পাদনা স্বপন সিংহ, পৃ.-৮১)।

আমরা এখানেও দেখি রাজা বিক্রমদেব শেষ পর্যন্ত রানি সুমিত্রার সত্যরূপকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিক্রমদেব নতজানু হয়ে বলেছিলেন,

"দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে?"

বিক্রমদেবের এই উক্তি প্রেমের ক্ষেত্রে হলেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারী প্রগতিরই এক অভিনব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। নারী উপযুক্ত স্বীকৃতি এবং সমাদর পেলে পুরুষের যথার্থ যোগ্যসঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারে, যদি তার উপযুক্ত স্বীকৃতি এর সমাদর লাভ করতে পারে। শুধু ব্যক্তির প্রেমের ক্ষেত্রে নয়, পরিবারে এবং সমাজেও নারী যে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে এই নাটকে তারই সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়।

বিসর্জন

'রাজা ও রাণী' নাটকের এক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ আর একটি সাড়া জাগানো নাটক লিখেছিলেন 'বিসর্জন'। এই নাটকের প্রকাশকাল ১৮৯০। এই নাটকের পটভূমিকায় আছে ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা। পুরাতন নাহি ঘেসে কাছে।" কলকাতা শহর তখন ইংরেজি শিক্ষিত যুক্তিবাদী নব্য সমাজের শহর। অন্যদিকে আছে হিন্দুধর্মের গোঁড়া সনাতনপন্থী প্রাচীন সমাজ। এই দুই সমাজের দ্বন্দ্বই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বঙ্গীয় সমাজে এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে রামমোহন থেকেই এবং রবীন্দ্রনাথের আমলেও তা বিতর্কিত হয়ে আছে। নব্যযুগের কলকাতা স্পর্ধিত বুদ্ধিমত্তার কাছে পুরাতন দুর্বল হলেও তারাও হীনবল ছিল না। 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে কবি অনেকদিন থেকেই ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকের তিন বছর আগে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে প্রথম বিষয়টি আলোচিত হয়। উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙালি সমাজে মুখ্যত ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলে সত্যের সঙ্গে সংস্কারের এবং ধর্মের সঙ্গে আচারের একটি দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। সেটাই একটা স্তরে মূর্তিপূজা বনাম নিরাকার উপাসনার দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক সহজ সিদ্ধান্তে ঈশ্বর যখন নিষ্ক্রিয় তখন নিরাকার, যখন সক্রিয় তখন সাকার রূপে দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব স্তিমিত হয়ে যায়।

'বিসর্জন' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত সংস্কারপন্থী নব্যসমাজ এবং অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু প্রবীণসমাজ। একদিকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য অন্যদিকে রাজপুরোহিত রঘুপতি।

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রশ্নে চৈতন্য লাভ করেন। ভিখারিনি অপর্ণার পুত্রসম ছাগশিশু মহামায়ার পূজায় বলি প্রদত্ত হওয়ায় পুত্রহারা মাতৃ হৃদয়ের মর্মভেদী হাহাকার, চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তার সুতীব্র প্রতিবাদ ন্যায় বিচারক রাজার চৈতন্যকে জাগ্রত করে। তিনি অচিরে তাঁর রাজ্যে বলিপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজপুরোহিত রঘুপতি সহস্র বছরের প্রচলিত বলিপ্রথা উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে

ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং রাজার নিষেধকে অমান্য করবার জন্য রানি গুণবতী, রাজ্যের প্রজাবর্গ এবং রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় প্রভৃতিকে নিয়ে একটি গভীর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেন। এমন কি রাজার পালিতপুত্র ধ্রুবকে হত্যা করার জন্য তিনি নানাভাবে গোপন প্ররোচনা দেন। কিন্তু রঘুপতির শিষ্য সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের আত্মবলিদানে একদিকে রঘুপতির সংস্কার দূরীভূত হয়, অন্যদিকে মানবধর্মের সত্যরূপ প্রাধান্য লাভ করে। ড. নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন, "বিসর্জন আমাদের ধর্মের মধ্যে একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়েছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হতে, এবং সে প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছেন গোবিন্দমাণিক্য।" প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সংস্কারের বিষয় নিয়ে এই নাটক রচিত বলে দীর্ঘকাল ধরে এই নাটক পাঠকচিত্তে এবং বাঙালি সমাজে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই নাটকের দুইটি নারীচরিত্র প্রধান। একজন মহিষী গুণবতী, অন্যজন ভিখারিনি অপর্ণা। এছাড়াও আর একটি নারীচরিত্র আছে, সে বালিকা হাসি। রানি গুণবতী ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী। তিনি স্বামীগতপ্রাণা কিন্তু নিঃসন্তান। শত শত দাস-দাসী, সৈন্য, প্রজা নিয়ে সোনার পালঙ্কে এই মহারানি একটি শিশুর স্পর্শের জন্য একান্ত কাতর। রাজপুরোহিত রঘুপতি তাঁকে বলে, এ সবই মার ইচ্ছে। অর্থাৎ দেবী শ্যামা তুষ্ট হলে তবেই গুণবতীর সন্তানলাভ সম্ভব। সেজন্য রঘুপতি গুণবতীকে মার নামে পূজা দেবার পরামর্শ দেয়। গুণবতী বলেন, এ বছর সব পূজার বলি-পশু তিনি দান করবেন। আরও বলেন,

> "করিনু মানত মা যদি সন্তান দেন
> বর্ষে বর্ষে দিব তারে একশ মহিষ,
> তিন শত ছাগ।"

আসলে গুণবতী প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাসী। ছাগ, মোষ বলি দিয়ে মায়ের পূজা করলে মায়ের আশীর্বাদে তিনি সন্তান লাভ করবেন। অর্থাৎ সন্তান কামনায় এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় তিনি অগণিত অসহায় জীবের প্রাণ বলি দিয়ে মহামায়াকে তুষ্ট করতে চান। কিন্তু তার আগেই রাজা গোবিন্দমাণিক্য ছাগশিশু হারানোর শোকে কাতর এক ভিখারিনি বালিকা অপর্ণার ক্রন্দনে বিচলিত। তিনি এই মন্দিরে বলিদানের অন্যায় কুসংস্কারের প্রথা বন্ধ করে দেন। ফলে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। রঘুপতি সন্তানহীনা রানির দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রানিকে রাজবিরোধী হতে প্ররোচিত করে।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য সত্যনিষ্ঠ। তাঁর দয়ার শরীর হলেও তিনি রানির পূজার বলি মন্দির থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়েই রাজা ও রানির মধ্যে প্রথমে মতবিরোধ, তারপরে তীব্র সংঘাত। গুণবতী যথাশাস্ত্র, যথাবিধি মহামায়ার পূজার জন্য রঘুপতির সঙ্গে যোগদান করেন। অবশ্য এখানে রানি তাঁর স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হন। রাজা রানিকে অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সংস্কারের পথ থেকে তাঁকে বিচলিত করতে পারেন নি। রানি ঊর্ধ্ব ফণা ভুজঙ্গিনীর মতো রাজাকে দংশন করার জন্য রঘুপতির সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর কাছে তখন স্বামীর প্রেমও তুচ্ছ মনে হয়েছে।

গুণবতী ভেবেছিলেন তিনি কঠিন হয়ে থাকলে রাজা প্রেমের তৃষ্ণায় নিজে থেকেই তাঁর কাছে ধরা দিতে আসবেন। কিন্তু তা না হওয়ায় তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবর উপর। রানি নক্ষত্র রায়কে এই বালক ধ্রুবকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন। ধ্রুবকে গোপনে দেবীর চরণে নিবেদন করার জন্য পরামর্শ দেন। কারণ ধ্রুবইতো ভবিষ্যৎ রাজা। ধ্রুব জীবিত থাকলে রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের কোনো দিন রাজা হবার সম্ভাবনা নেই।

মোঘলের সেনা নক্ষত্র রায়কে নির্বাসনের পথ থেকে তুলে এনে রাজপদে অভিষিক্ত করেছে। গোবিন্দমাণিক্য ভাই বলে নক্ষত্র রায়ের কোনো বিরোধিতা করেননি। গুণবতী কিন্তু তখনও রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন মহামায়ার কাছে শেষ পূজা দিয়ে নির্বাসনে চলে যেতে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বললেন, হিংসা নয়, রক্ত নয়, অশ্রু নিয়ে, প্রেম নিয়ে, পুষ্প নিয়ে তিনি মন্দিরে যেতে রাজি আছেন। গুণবতী নারী হিসেবে রাজার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, কেবলমাত্র তাঁর প্রতি ভালোবাসার জন্যই রাজা যেন তাঁর পথ থেকে সরে আসেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য তখনও সম্মত হননি। গুণবতী শেষ পর্যন্ত মায়ের পূজা এবং বলি দেবার জন্য স্থিরসংকল্প হলেন। কিন্তু ততক্ষণে জয়সিংহের আত্মবলিদানে রঘুপতির মূঢ়তার অবসান হয়েছে। সে মন্দিরের দেবীকে গোমতীর জলে বিসর্জন দিয়েছে। গুণবতী কিন্তু তখনও তাঁর সংস্কারের পথ থেকে সরে আসতে পারেন নি। অবশেষে রঘুপতি যখন গুণবতীকে জানাল যে, দেবী নেই। তখন গুণবতীর হুঁশ হল। তিনি মহারাজের পথে সত্য লাভ করলেন এবং গোবিন্দমাণিক্যকে বললেন—"তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।"

'রাজা ও রানী' নাটকে আমরা দেখেছি রাজা প্রেমে অন্ধ আর রানি সুমিত্রা সত্যনিষ্ঠ। 'বিসর্জন' নাটকে আমরা দেখি ঠিক বিপরীত চিত্র। এখানে রাজা গোবিন্দমাণিক্য সত্যনিষ্ঠ আর রানি গুণবতী স্বার্থান্ধ এবং সংস্কারাচ্ছন্ন।

এই নাটকের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র অপর্ণা। সে ভিখারিনি। পুত্রসম এক ছাগশিশু ছাড়া অপর্ণার আর কেউ নেই। সেই স্নেহের ধনকে রাজ-সিপাহিরা জোর করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মহামায়ার পূজায় বলি দিয়েছে। এটা তার মনে হয়েছে অত্যন্ত অন্যায়। মাতৃত্বের মর্মভেদী হাহাকার নিয়ে সে ছুটে এসেছে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে। এই ঘোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করছে তীব্রকণ্ঠে—একজনের সন্তানকে বলি দিয়ে অন্যের কল্যাণ কামনা অন্যায়। তার অভিযোগ রাজার কাছে। সংস্কার এবং রাক্ষসী দেবীর বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

অপর্ণা সংস্কারহীনা। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, আছে শুধু বুকভরা ভালোবাসা। মন্দিরে প্রথম দর্শনেই সে জয়সিংহের সহানুভূতি ও ধর্মবোধের পরিচয় পেয়ে তাকে সে চিনতে পেরেছিল। তার ব্যবহারে মোহিত হয়ে তাঁকে সে ভালোবেসেছিল। অপর্ণা ভালোবাসার অধিকারে অন্যায় ও অধর্মের পরিবেশ থেকে জয়সিংহকে মন্দির ছেড়ে তার কাছে আসতে অনুরোধ করেছিল। অপর্ণা সাহসী, সৎ এবং প্রতিবাদীচরিত্র। নারীর কোমল প্রবৃত্তি দ্বারা আকীর্ণ অপর্ণার হৃদয়—মায়া, মমতা, স্নেহ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণে অপর্ণাচরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল। নাটকের শেষে নিরাশ্রয় রঘুপতিকে তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা সৎসাহসে তাঁর হাত ধরে মন্দির থেকে বের করে এনে অপর্ণা সত্যের পথে এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

তৃতীয় নারীচরিত্র বালিকা হাসি। অলোচ্য নাটকে আমরা এই চরিত্রকে পাই প্রসঙ্গক্রমে। হাসি ও তাতা অনাথ দুই শিশু। নিঃসন্তান রাজার তারা বড় প্রিয় পাত্র-পাত্রী। রাজা তাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। তাদের সান্নিধ্যে রাজা আনন্দ অনুভব করেন। হাসি নিতান্ত বালিকা। তার মন সরল ও স্নিগ্ধ। একদিন মন্দিরে বলির তাজা রক্ত দেখে সে শিউরে ওঠে। শঙ্কিত হয়ে রাজার কাছে হাসি প্রশ্ন করে— 'এত রক্ত কেন?' বলির রক্ত ক্ষুদ্র বালিকাকে দিশাহারা করে তোলে এবং তাতেই তার জ্বর বিকার এবং মৃত্যু হয়। হাসির মৃত্যুতে রাজা মর্মাহত হন। অপর্ণার ছাগশিশুর বলি এবং হাসির মৃত্যু রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সত্য নির্ধারণে সহায়ক হয়। রাজা বলি প্রথা নিষিদ্ধ করেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান ক্ষুদ্র বালিকা হাসির তীব্র প্রতিবাদ। অপর্ণার মাতৃ-হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনও বলি প্রথার উচ্ছেদের সহায়ক হয়েছিল।

ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগে বঙ্গীয় সমাজের সকল

স্তরেই এক বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। সমাজসংস্কারক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ দে প্রমুখ এবং ব্রাহ্মসমাজের ধারক এবং বাহক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সকলেই নারীমুক্তির এবং শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে 'ভারত সভা' স্থাপনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই সঙ্গে তখন নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যে প্রবল ভাঙনের উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তারও উল্লেখ আমরা করেছি। এঁরা ইতিহাসে 'ইয়ংবেঙ্গল' নামেই পরিচিত। এই সময় 'নীল বিদ্রোহ', হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় তার সমর্থন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, সোম প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে চারজন মহিলা অভিনেত্রীর (জগৎতারিনী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী এবং শ্যামাসুন্দরী) যোগদান, বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকেদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে এই বারবনিতা মহিলাদের অভিনয় বাঙালি সমাজের স্থিতাবস্থাকে অনেকটা আঘাত করেছিল। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তাবের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৮৭৭ সালে জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ গোলাপসুন্দরী তথা সুকুমারী দত্তের নামাঙ্কিত 'অপূর্ব সতী' নাটকের অভিনয়। অবশ্য পরে জানা গিয়েছে সুকুমারী দত্তের নামে এই নাটকের প্রকৃত রচয়িতা হলেন সুকুমারীর পৃষ্ঠপোষক আশুতোষ দাসের ছদ্ম নামে উপেন্দ্রনাথ দাস। সেই সময় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত 'বঙ্গ মহিলা' পত্রিকাও এক ব্যতিক্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐ পত্রিকার লেখিকা ছিলেন কামিনীসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী, মায়াসুন্দরী ইত্যাদি। এঁদের পথ ধরেই পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কামিনীসুন্দরী দেবী কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন,—'বালবোধিকা' (১৮৬৮), 'উষা নাটক (১৮৭১), 'রামের বনবাস' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৭)। অতএব ইতিহাসে দেখা যায় তখন অনেক মহিলাও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রবর্তী হয়ে সমাজ-প্রগতির আলোড়নে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

'বিসর্জন' নাটকে অবশ্য আমরা ত্রিপুরা রাজমহিষী গুণবতীকে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক জননীরূপেই দেখতে পাই। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলেই সন্তান কামনায় অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সেইজন্য রাজা গোবিন্দমাণিক্যের

রানির প্রতি যে প্রেম তাও তুচ্ছ হয়ে যায়। 'রাজা ও রানী' নাটকের রানি সুমিত্রার চেয়ে একেবারে বিপরীত স্থানে তাঁর (গুণবতীর) অবস্থান।

গুণবতী সংস্কারবোধে আচ্ছন্ন ছিলেন বলেই বলিপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁর সংস্কারে আঘাত লাগে। তিনি বন্ধ্যা। সন্তান আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে তিনি সংস্কারমূলক ধর্মবোধেই প্রেমের মর্যাদা হারিয়ে সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হন। রঘুপতির প্ররোচনায় তার মধ্যে রানির মর্যাদা এবং মহিষীর অবস্থানই বড় হয়ে দেখা দেয়। তখনই তার মধ্যে জাগে প্রতিহিংসার স্পৃহা। গুণবতীর অন্তরে-বাইরে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ঈর্ষায় আর গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে রানি রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়ের সহায়তায় পশুবলির পরিবর্তে রাজার প্রিয় পালিতপুত্র ধ্রুব হত্যার চক্রান্ত গভীরতর করেন। অন্যদিকে অপর্ণা তার একান্ত আপন সন্তানসম ছাগশিশুকে হারিয়ে দেবতার প্রতি বিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে এবং নিজের প্রেমের দ্বারা দেবতার অন্যতম পূজারি জয়সিংহের বিশ্বাস টলিয়ে দেয়।

দীর্ঘকালের আচরণে অভ্যস্ত জয়সিংহ রঘুপতিকে ছেড়ে আসতে পারেনি। আবার অপর্ণার প্রতি প্রেমকেও উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে রাজার প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাও যথেষ্ট। তার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে এই ত্রিবিধ সমস্যার সমাধান হল।

সন্তানসম জয়সিংহের আত্মবিসর্জনেই রঘুপতিরও চৈতন্যোদয় হল। যে হত্যাকে তিনি এতদিন অন্ধসংস্কারের জন্য সমর্থন করে আসছিলেন তা তার কাছে মিথ্যে প্রতিভাত হল। এখানেই নাটকটির শেষ হয়নি। যে দেবী ছিলেন এই অন্ধ-বিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রতিভূ রঘুপতি সত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবীও মিথ্যে হয়ে গেল। রঘুপতি তার দেবীকে গোমতীর জলে বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন, "দেবী ছিল না, দেবী নেই।" সংস্কারের পরিবর্তে জয়ী হল মানুষের প্রেম, ভালোবাসা।

এই নাটকে দুইটি বিপরীত নারীচরিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি সংস্কারান্ধ নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা এক নারী—তিনি রাজমহিষী গুণবতী। অন্যটি এক ভিখারিনি বালিকা অপর্ণা—সন্তানসম ছাগশিশুকে অন্ধ-বিশ্বাস বশে বলি দেওয়ার সে বিরোধী। নিজ অভিজ্ঞতায় অপর্ণা জেনেছে এই প্রচলিত প্রথা ভুল, অন্যায় এবং জীবন-বিরোধী। অপর্ণা কোনো শিক্ষিত নারী নয়। তবে সমকালীন আলোড়ন এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সত্য সে লাভ করেছে তাকেই রাজার

হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। রাজা অপর্ণার মধ্য দিয়ে কঠিন হলেও এক গভীর সত্য লাভ করেছেন।

আমরা দেখেছি গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটকেও প্রফুল্ল নিজ অভিজ্ঞতায় এক সত্য লাভ করেছিল যা প্রচলিত রীতি-নীতির বিরোধী। প্রফুল্ল দেখেছে তার স্বামী কীভাবে অন্যায় আচরণ করে, মিথ্যাকথা বলে। প্রফুল্ল চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সেই স্বামীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারেনি।

'রাজা ও রানী' নাটকেও আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রানি সুমিত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর স্বামী বিক্রমদেব সত্যভ্রষ্ট, কর্তব্যভ্রষ্ট। তাঁকে নিজ দায়িত্ববোধে সচেতন করে তোলবার জন্যে রানি স্বামী ত্যাগ নয়, রাজ্য ত্যাগ করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

'বিসর্জন' নাটকে নারী কুসংস্কারে আবদ্ধ অন্ধ; প্রচলিত বিশ্বাসেই বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই নারীও শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বললেন,—"আজ দেবী নাই—তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।" আমরা উপলব্ধি করি সমাজে দুই বিপরীত মেরুর অবস্থান। নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসত্য তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। 'বিসর্জন' নাটকে রানি গুণবতী প্রথমদিকে এই অগ্রগামী মহিলাদের একজন না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তিনিও সত্যধর্মের প্রত্যয় লাভ করেছেন। চেতনার দিক থেকে নারীদের মধ্যে যে অগ্রগতি দেখা দিয়েছে, আমাদের আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। সমাজে আর্থিক এবং সামাজিক-সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে না হলেও যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। শিক্ষায়, স্বাতন্ত্র্যে, বুদ্ধি চর্চায়, সাহিত্য চর্চায়, অভিনয় এবং জাতীয় আন্দোলনে নারীরা সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে।

বাবু

আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষ নাটক অমৃতলাল বসুর 'বাবু'। এটি একটি সামাজিক নকশা। এর প্রকাশকাল ১৮৯৩। আমরা পূর্বে নারীজীবনের যে অগ্রগতি লক্ষ করেছি, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনেকেই তা পছন্দ করত না। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত মানুষদের এই অগ্রগতি তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে আমরা তা জানতে পারি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে আমরা নারীজীবনের যে অগ্রগতি বা অবস্থান লক্ষ করি, প্রায় সমকালীন নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর নাটকে সেই নারীদের (ব্রাহ্মদের) রসাল এবং রঙ-চঙের কেরিকেচার ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাটকে নারীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, যে কোনও ধরনের সমাজ সংস্কার ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর সময়ে বিধবা-বিবাহ বহু আলোড়নকারী ঘটনা। বিধবাদের সম্পর্কে তৎকালীন সমাজবোধের অনেক পরিবর্তন হয়েছে; সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অমৃতলাল সেই নারীজাগরণকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

অবশ্য এই কথা স্বীকার্য যে, সমাজে যখন কোনো প্রবল আন্দোলন বা বেগের সঞ্চার ঘটে, তখন তার মধ্যে এমন কিছু অনঅভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যা সমর্থনযোগ্য নয়; যাকে বলা যায় বাড়াবাড়ি, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। অমৃতলাল এই অনাচার, ভণ্ডামি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক ছিলেন না। সেইজন্য তিনি সনাতনী সংস্কারপন্থীদেরও তীব্র আঘাত করেছিলেন।

অমৃতলালের নাটক প্রত্যক্ষ এবং সোচ্চার। পূর্বে বলা হয়েছে বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। তিনি অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাটক ও গান রচয়িতা হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সর্ববিধ সামাজিক প্রগতিবিরোধী অমৃতলাল তাঁর 'বাবু' নাটকের মধ্য দিয়ে দেশের প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলনের জনক ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তীব্রতম বিষোদ্‌গার করেছেন। এই সঙ্গে ভন্ড দেশহিতৈষী, অপরিপক্কজ্ঞান বৈজ্ঞানিক, হুজুগপ্রিয় সংস্কারক, স্বার্থপর সম্পাদক, কপট ধর্মধ্বজী সকলের বিরুদ্ধেই একযোগে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ প্রয়োগ করেছেন। বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতাই এই নকশার তীব্রতম আক্রমণের বিষয়।

'বাবু' নাটক একটি সামাজিক নকশা। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে মধ্যবিত্ত বঙ্গসমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বাবুদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার অসঙ্গতি নিয়ে

অমৃতলাল এই নক্সাটি রচনা করেছেন। দেশহিতৈষী বাবু, বৈজ্ঞানিক বাবু, সংস্কারক বাবু, ধর্মধ্বজ বাবু, ছোকরা বাবু, কেরাণী বেচারি বাবু এই নাটকের ব্যঙ্গ রসিকতার পরিমন্ডল তৈরি করেছেন। এখানে ব্রাহ্মসমাজ যেমন আক্রান্ত হয়েছে তেমনই হিন্দুসমাজের নানা সনাতনী সংস্কারও ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা উপহসিত হয়েছে। এই নাটকে নির্দিষ্ট কোনও ধারাবাহিক গল্প বা প্লট নেই। দেশের হিতসাধন, বিজ্ঞানের প্রসার, সমাজের সংস্কার, ধর্মের সংস্কার, কর্ম ও শিক্ষার পরিবেশের (কেরানি বাবু) ভ্রান্ত, কপট ও শঠ আচার-আচরণ নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপের সাহায্যে কয়েকটি খন্ড চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বৈষ্ণবীগণের বাবু নাম-কীর্তনের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়েছে। "কখন বা বাবু কখন বা মিষ্টার পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্টার......ঘোমটা ঘুচবে খেমটা নাচবে....." ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন চরিত্রের কেরিকেচার বা ব্যঙ্গাত্মকচিত্রই প্রধান হওয়ায় নারীর ভূমিকা তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি। পুরুষ চরিত্রের সংলাপ থেকে জানা যায়,—তখন স্ত্রীকেও ভগ্নী সম্বোধন করা হত এবং বিধবা-বিবাহের খুব প্রচলন হয়েছিল। যেমন, সংস্কারক বাবু সজনীকান্তের চেলা দামোদর বলছে, "ভগ্নী দ্বিতীয়বার বিধবা হয়ে সম্প্রতি ঘেটু কুটিরে এসেছেন, নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণায় এমন আকুল যে, শিশু সন্তানটি পর্যন্ত কোলে করতে পারে না।"

দেশহিতৈষী ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক দেশের হিত সাধনের নামে খববের কাগজের সাহায্যে চাঁদা তুলে আত্মসাৎ করে মানুষ ঠকানোর পেশায় লিপ্ত। মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য-দুর্যোগের সুযোগ বুঝে সাহায্য করার নামে তাদের শোষণ করা এবং কাজের চেয়ে বড় বড় কথা ও আয়োজনের বহর দেখিয়ে দাম বাড়ানো, ভারত উদ্ধারের জন্য স্বীয় জননীকে অবহেলা করা, নারী-স্বাধীনতার দিক থেকে স্বীয় স্ত্রীকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ঘরের বাইরে বার করতে উৎসাহী। কিন্তু গোরার আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা না করে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়া, আস্ফালন দেখিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে প্রতিকার করার শপথ বাক্য আওড়ানো, গরিব চাষিদের নিধন কামনা প্রভৃতি দেশহিতৈষী বাবুর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ধর্ম প্রচারের নামে অনাচার, প্রলোভন দেখিয়ে বিধবা-নারীকে ফুস্‌লিয়ে শ্লীলতার নামে অশ্লীলতার চর্চা ও পুষ্টিসাধন, সংস্কারের নামে, ভারত স্বাধীন করার নামে ক্রন্দন এবং চোখের জলে পাপাচার ধুয়ে ফেলার কপটতা ইত্যাদির চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। এরা সকলেই ভারত উদ্ধারে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক অশনি-প্রকাশ বলে,

"ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব, মেয়েদের ঘোড়া চড়াব, এই ইণ্ডিয়াতে পার্লামেন্ট বসাব, আরও কত কী করব।" এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের ভালো করতে গিয়ে তারা নারীসমাজের অকল্যাণই করেছে। এছাড়াও নানাভাবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখানো হয়েছে। আর সংস্কারক সজনীকান্ত বলে, হিন্দুমাত্রই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণীপীড়নকারী। তাঁর মেয়ে সৌধকিরিটিনী তার বাবাকে 'ছোট-বাবা' বলে ডাকে। কারণ সে সজনীকান্তের স্ত্রী দয়িতদলনীর প্রথম পক্ষের স্বামীর সময়ে জন্মেছিল। সজনী এখন স্ত্রীকে বলে স্বামীনী। সে আরও বলে, "কন্যা চিরকুমারী থাকলে দেশের অনেক উপকার করতে পারে।" তাঁর স্বামীনী দয়িতদলনী তাকে বকবে বলে ভিতরে ডাকছেন। অর্থাৎ এখানেও নারীর প্রাধান্যের কথা জানা যায়। দয়িতদলনীকে 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকের বিলাসিনী কারফরমার অনুসরণে বা আদলেই তৈরি করা হয়েছে।
আজিমার নাতি কন্দর্প ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। সে আজিমার বিধবা-বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের যুবক বিধবা-বিবাহের সংস্কারে এত আগ্রহী যে, সে তার বিধবা বৃদ্ধা দিদিমার পুনরায় বিবাহ দিয়ে সমাজে গণ্যমান্য হতে চায়।
এমনি করে নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের ব্যঙ্গচিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন। এখানে দেখা যায় দেশহিতৈষী ষষ্ঠীবাবু ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য দিনরাত এত ব্যস্ত যে নিজের গর্ভধারিণী জননী শ্রীমতীকে একখানা কাপড় দিতেই সে কুণ্ঠাবোধ করে। সে বলে, "দিনরাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারতমাতার কাজ হয় না।" এখানে অমৃতলাল স্বদেশহিতৈষী এবং সমাজসংস্কারক ব্যক্তিদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নিজের পারিবারিক কর্তব্য অবহেলার কথা বড় করে তুলেছেন। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁরই ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসনের মধ্যে তৎকালের যে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন চলছিল তার পরিচয় পাই। এই নকশার চরিত্রগুলো সবই কেরিকেচারাইজড টাইপ। অর্থাৎ কতকগুলি সামাজিক টাইপের ব্যঙ্গবিদ্ধ বিকৃতরূপ। কাউকে ঠিক জীবন্ত মানুষ বলে মনে হয় না। এই নকশায় নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা—ব্রাহ্মিকা সবই উপহসিত হয়েছে।
'বাবু' নাটকে আমরা যে কয়টি নারীচরিত্র পাই সেগুলি হল—দেশহিতৈষী বাবু ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালের স্ত্রী নীরদা, ধর্মধ্বজ বাবু বাঞ্ছারাম সাধুখাঁর স্ত্রী ক্ষমাসুন্দরী,

সংস্কারক বাবু সজনীকান্ত চাকীর স্ত্রী দয়িতদলনী এবং অবিবাহিতা কন্যা সৌধকিরিটিনী, ষষ্ঠীকৃষ্ণের মাতা শ্রীমতী, ছোকরাবাবু কন্দর্পকান্তের স্ত্রী ও মাতামহী আজিমা। এছাড়া আছে প্রতিবেশিনী শীলদা, জ্ঞানদা এবং কায়েত ঠাকুরঝি ও মহিলাগণ।

ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্যসভ্যতা এবং ধর্ম-আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের উদ্‌যোগ জনসমর্থন লাভ করে। এক শ্রেণির অর্ধশিক্ষিত আত্মস্বার্থপরায়ণ মানুষ এই সব উদ্‌যোগের আবরণে সমাজের যে অনাচার ও নারীসমাজের যে অনিষ্ট সাধন করেছিল তারই কম বেশি পরিচয় মেলে এই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে।

এই নাটকের প্রধান নরীচরিত্র নীরদা। ভেকধারী দেশহিতৈষী ষষ্ঠীকৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী নীরদা। সে সাদাসিধে সরলমতিসম্পন্ন গৃহবধূ। তার নিজস্ব মতামত নেই। তবে জীবনের শুরুতে স্বামীর আচার, আচরণ সম্পর্কে সে মোটামুটি নির্লিপ্ত ছিল। আধুনিকতা, নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে তার আগ্রহ কম। কারণ বঙ্গবধূর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে লজ্জাশীলা এবং ভীতুও বটে। পাশ্চাত্য ও ব্রাহ্মপরিবারের অনুকরণে স্বামীর চূড়ান্ত নির্দেশে বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে তাকে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতে হয়েছিল। অপরিচিত পরিবেশে অনভ্যস্ত নীরদা তার স্বভাবসুলভ আড়ষ্টতা কাটিয়ে সহজ হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মাতাল গোরা কর্তৃক সকলে আক্রান্ত হলে নীরদাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে স্বামীও পালিয়ে যায়। অমৃতলাল বসু এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল স্বামীর ভীরুতাকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র আজিমা। কন্দর্পের বৃদ্ধা বিধবা দিদিমা— আজিমা। সংস্কারে উদ্যোগী তাঁর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নাতি কন্দর্পের হাস্যকর পুনর্বিবাহের প্রস্তাব তিনি অস্বীকার করে দেশে পালিয়ে যান। এখানে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক নাতির চরিত্রের মধ্য দিয়ে সংস্কারকের প্রচেষ্টাকেই হাস্যকর করে দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্রদ্বয় দয়িতদলনী এবং তার কন্যা সৌধকিরিটিনী। সংস্কারক সজনীকান্তবাবুর স্ত্রী দয়িতদলনী। সে ব্রাহ্মিকা। এক কন্যা সন্তান নিয়ে সে বিধবা হয় এবং পরে সজনীকান্তকে পুনরায় বিবাহ করে। ইনি অতি আধুনিকা স্বাধীন মহিলা। বিলাসীও বটে! ইডেন উদ্যানে সস্ত্রীক সংস্কারক বাবুগণ মিলিত হলে সেই চমৎকার পরিবেশে কেবলমাত্র প্রেমের খেলা নয়, সেখানে কপাটি খেলা, দৌড় প্রতিযোগিতায় সে বাজি রাখার প্রস্তাব দেয়। তার

মতে স্বাধীন নারীদের কিসের লজ্জা। ভারত-উদ্ধারকার্যে পুরুষ উদ্যোগ নিয়েছে—তারাই হবে প্রেরণা। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্বাধীন হয়ে নারী বাইরে বেরুতে শিখেছে। তার মতে নারী যখন স্বাধীন হয়েছে তখন আর ভারত উদ্ধারের বিলম্ব নেই। লজ্জাশীলা নীরদাকেও সে লজ্জাহীন হয়ে প্রেমের দ্বারা পুরুষকে প্রেরণা দিয়ে ভারত উদ্ধারের কাজে ব্রতী হতে পরামর্শ দেয়। তারা স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সহযোগী।

দয়িতদলনীর কন্যা সৌধকিরিটিনী একটি অবিবাহিতা নারীচরিত্র। সেও স্বাধীন। সেই যুগের ব্রাহ্মসমাজের এক অতি আধুনিকা বালিকা। এর মধ্যেই সে নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শিখেছে। এই দুই ব্রাহ্মনারীচরিত্রের মধ্যে তাদের মুক্তচিন্তার চেয়ে উগ্রতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আর একটি নারীচরিত্র ক্ষমাসুন্দরী। সচ্ছল এবং আনন্দময় জীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিধবা ক্ষমাসুন্দরী ধর্মধ্বজ বাঞ্ছারামকে পুনরায় বিবাহ করে। বাঞ্ছারাম কপট এবং শঠ। এরই মধ্যে ক্ষমাসুন্দরীর পিতার দেওয়া সোনার গহনা হাতিয়ে নিয়েছে। বড় বড় আদর্শের বুলি আউড়ে নিজের শঠতাকে আবরিত করতে সচেষ্ট। ক্ষমাসুন্দরী নিজের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারছে। তাই অকর্মক ভেকধারী বাঞ্ছারামের কার্যকলাপকে কঠিন ভাষায় নিন্দা করে এবং চাক্‌রি-বাক্‌রির চেষ্টা করে সংসারী হতে বলে। এখানেও যারা বিধবা-বিবাহ করে তাদের কাপট্যকেই প্রধান করে দেখানো হয়েছে।

আরও একটি নারীচরিত্র স্বল্প কথায় এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে—তিনি শ্রীমতী। তাঁর সন্তান নব্যশিক্ষিত এবং সচ্ছল। তিনি দেশহিতৈষী বাবু বলে সমাজে পরিচিত। তিনি দেশ উদ্ধারের কাজে লিপ্ত। নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা, ভারতমাতার স্বাধীনতার নামে তার গালভরা বড় বড় বুলি; কিন্তু মাকে মায়ের মর্যাদায় দেখে না। ইয়ারদের সামনের মলিন-বেশী মায়ের আগমন ঘটলে ছেলের অসম্মান হয়। তাই বাইরের ঘরে তার যাবার হুকুম নেই। ষষ্ঠীবাবু বলে,— "তুমি—পাকা চুলগুলো নড়বড় করছে, ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোঙ্গা হয়ে যেন বাঙ্গলা হ্রস্বউর মত হাঁট্‌ছ; কেউ এসে যদি টের পায় যে, তোমার গর্ভে আমি জন্মেছি, তা হলে আমায় শুদ্ধ অসভ্য ঠাওরাবে!" এখানেও নব্যশিক্ষিত যুবকদের মাতৃ অবহেলার মাধ্যমে তাদের উপহসিত করা হয়েছে। দেশ উদ্ধারের নামে তারা স্বীয় জননীকেও অবহেলা করে।

এক শ্রেণির পুরুষ সংস্কার কর্মকে আত্মোন্নতির স্বার্থে নারীকে পণ্যরূপে যে

ব্যবহার করত সে কথাটাও এই ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও কয়েকজন প্রতিবেশিনী নারিচরিত্র—কায়েত ঠাকুরঝি, জ্ঞানদা ও শীলদা। এগুলি টাইপচরিত্র। পরম্পরা অনুসারে এর যা জেনেছে, তার বাইরে সব কিছুকে ভয়ের চোখে দেখে। রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ এরা। স্বামী-সংসার ঘিরেই এদের পৃথিবী। পুরনো সমাজ ও আচার-ব্যবহার ভালো কি মন্দ এ বিচার করার ক্ষমতা এদের সামান্য। এরা আচরিত অভ্যাসের বশে এবং স্বামীর কর্তৃত্বের বাইরে পা বাড়াবার সাহসে সাহসী নয়। কায়েত ঠাকুরঝি ও জ্ঞানদা-চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এ সত্য মেলে। কিন্তু শীলদা তাঁতি বৌ হলেও তার সুপ্ত আকাঙ্খা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন লক্ষণীয়। তার কথায়, বাহার দিয়ে বাইরে বেড়াবার ওর কত সখ! "তবে স্বামী যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তা হলে আমি তত ভাবি না।" এর থেকে অনুমান করা যায় যে সংস্কার আন্দোলন এবং নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে পরিবর্তনের ঢেউ অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছে এবং অজ্ঞাতসারে নারীর চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে।

'বাবু' নামক প্রহসনে আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯৩) সমাজ সংস্কারের প্রবল আলোড়ন নাগরিক সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অন্দরমহলের নারীসমাজেও। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উত্তরসূরি কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ যেমন নারীশিক্ষার প্রসার ও নারীর অবরোধ মোচনের সহায়ক ছিলেন, তেমনই বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারকগণ নারীশিক্ষা-পুষ্টির সহায়ক ছিলেন। যা-ই হোক নারীশিক্ষা, নারী-মুক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এই ধারাকে সংস্কারকগণ অব্যাহত রেখেছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নারীর অবরোধ মোচনের ক্ষেত্র প্রথম প্রস্তুত হয়। সেদিক থেকেও ঠাকুর পরিবারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে একাকী বিলেত যাওয়ার পূর্বে ১৮৬৪-তে স্বামীর কর্মস্থল বোম্বাই-এ বসবাস করেন। এর পূর্বে কোনও বাঙালি সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে বসবাস করেছেন এমন ঘটনা বিরল। পালকি ছাড়া ফিটনগাড়ি চড়া, বিশেষ করে, আধুনিক পোশাকের প্রবর্তন সর্বপ্রথম জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দ্বারাই হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের

দাদা জ্যেতিরিন্দ্রনাথও সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন। পূর্বেই 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকের ব্রাহ্মিকা শিক্ষিতা বিধুমুখী চরিত্র আলোচনার সময়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র এবং নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম-সদস্যবৃন্দের আনুকূল্যে 'উপাসনা সভা'য় মহিলাদের প্রকাশ্যে যোগদান এই সময়েই স্বীকৃত হয়।

আলোচ্য 'বাবু' নাটকের সংস্কারক বাবুদের স্ত্রীরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার জন্য নীরদার মতো মহিলা গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে ইতস্তত করলেও, বলা বাহুল্য এই সময়ে নাগরিক সমাজের নারীদের অনেকেরই বাইরে বের হবার একটা সাড়া পড়েছিল। এই নাটকে রক্ষণশীল ঘরের তাঁতি বৌ শীলদার উক্তি থেকে জানা যায়, বাহার দিয়ে বেড়াবার তার কত সখ! তবে স্বামী যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহলে তার তত লজ্জা করে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কী হবে—শীলদা তার স্বামীর কাছে পরাধীন। অন্যদিকে দেশহিতৈষী ষষ্ঠীবাবু তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "পুরোপুরি পুরুষের সমান স্বাধীন হতে।" স্বামীর কথা মতো নীরদা ঘোমটা তুলে দিয়েছে, সময় সময় জুতো-মোজাও পরে, প্রয়োজনে শাশুড়িকে লজ্জা করে না। তাঁকে ধমকে কথা বলে, স্বামীর ইয়ারদের সামনেও সে বের হয়। অর্থাৎ এ যুগের নারীর অবরোধ মোচনের বাস্তবচিত্র এই নাটকের নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। যুগের পরিবর্তনে এ সময়ে নারীর শিক্ষায়, চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন হয়েছে তাদের অবস্থানের। অমৃতলাল বসুর এই নাটক যেহেতু প্রহসন, সেজন্য সাধারণ নাটকের ক্ষেত্রে যে সমাজ-বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়, এখানে তা কখনও আশা করা যায় না। অমৃতলাল তাঁর এই নাটককে ঠিক প্রহসন বলেননি; নাট্যকার নিজেও এটাকে 'নক্সা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'নক্সা'র মধ্যে হাস্য পরিহাসই প্রাধান্য লাভ করে। বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতাই এই 'ন'া'র তীব্রতম আক্রমণের বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই নাটকের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতাকে সেভাবে পাই না। তবুও অমৃতলাল যে কয়টি নারী ও পুরুষচরিত্র এখানে উপস্থাপন করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিত্ব-মূলক। তবে এই নাটকে যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি ও কয়েকটা গান পরিবেশিত হয়েছে—নিতান্ত ব্যঙ্গই তার উপজীব্য। এটা বাস্তবিক পক্ষে সঠিক সমাজদর্পণ নয়, অমৃতলালের নিজস্ব মনোদর্পণ। তাছাড়া নাটকের নারীচরিত্রের নামগুলোও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো ঘটনাকে পরিপুষ্ট করার জন্য টাইপ নামগুলোকে আনা হয়েছে। এতে নাট্যকারের বিশিষ্ট

একটি মনোভাব এখানে একেবারে নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতাই এই নকশার তীব্রতম আক্রমণের বিষয়। এই সম্পর্কে নাট্যকার যে সব চিত্র ও সংলাপ এখানে পরিবেশন করেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে গেছে। ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক নিয়ে তিনি গ্রাম্যস্তরের রসিকতা করেছেন। বিধবা-বিবাহ তিনি 'ঠানদিদি'র বিবাহ ধরে সুলভ কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই নক্‌শার নারীচরিত্রগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা স্বাধীন নারী তেমই রয়েছে রক্ষণশীল চিন্তাধারার বহু নারীচরিত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সময় ঠাকুর পরিবারের মহিলাগণ পুরুষদের সঙ্গে প্রায় সমানভাবে সামাজিক বা দেশহিতের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী অবিস্মরণীয়। সরলাদেবী স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদীর পথে নয়, গঠনমূলক পথে দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য বিদেশিদ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধনের কথা বলেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী মনে করতেন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় নারীসমাজকে সচেতন করে গড়ে তুলতে না পারলে কখনও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। পুঞ্জীভূত অন্ধ কুসসংস্কারকে চূর্ণ করে ভারতে নারীসমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে সেদিন তিনি যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

১২৯৩ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখীসমিতি' নামে একটি মহিলাসভা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাব বর্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান। তাছাড়া অক্ষম পিতার কন্যাদের শিক্ষা, অসহায় বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্য ও আশ্রয় দান প্রভৃতি কার্যও ইহাদের কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। 'মহিলা শিল্পমেলা' ছিল এই 'সখি সমিতি'র অন্তর্গত অনুষ্ঠান। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখী সমিতি'র ভান্ডারে যাইত। ভারতী ১২৯৮ পৌষ সংস্যায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি প্রকাশিত হয়। সখীসমিতি ও শিল্পমেলার স্ত্রীসভার সখিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীর নাম Mrs. R. N. Tagore দেখতে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা। (দ্র. ভারতী, ১২৯৫ পৌষ, পৃ. ৫৩২-৩৩।)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ থেকে ‘বাবু’ নাটক পর্যন্ত যে সব নাটকের আলোচনা করেছি তার থেকে দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার এবং ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ফলে নারীর সামাজিক অবস্থানের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য এই পরিবর্তন সমাজের মধ্যবর্তী স্তরেই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। সংসারে পুরুষ প্রধান হলেও নারীরা একেবারে পিছিয়ে নেই। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ সংস্কার, স্বাদেশিকতাবোধ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের পাশাপাশি একটা নিশ্চিত স্থান করে নিয়েছে। তাদের ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। রক্ষণশীল সমাজ অবশ্য সহজে নারীর এই ব্যক্তিত্ব এবং অগ্রগতিকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। ফলে তাদের নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ প্রহসন রচিত হয়েছে।

যাই হোক, এ কথা স্বীকৃত যে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্দরমহলেও প্রচলিত রীতিপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। স্বামীর অন্যায়চারিতাকে শাস্ত্রের বা প্রচলিত রীতির অজুহাত দেখিয়ে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে আমরা নারীর এই পরিবর্তিত অবস্থানকেই লক্ষ করি।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশাত্মবোধের আন্দোলন ও বাংলা নাটক

বলিদান (১৯০৫)

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের প্রবল আলোড়ন বিশ শতকের দোরগোড়ায় বঙ্গীয় সমাজের অন্দরমহলের সর্বস্তরে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে সমাজ সংস্কার আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে 'হিন্দুমেলা'র পর থেকেই আমাদের দেশে দেশাত্মবোধের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব ও প্রেরণায় তখন বহু দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক লিখিত এবং অভিনীত হয়েছিল। এই সময়ই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয়। ফলে যে প্রতিবাদী আবেগ বাংলা নাটকে জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছিল তা পৌরাণিকতা এবং অধ্যাত্মবাদে আপ্লুত হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ক্ষেত্রেই তা দেখা যায়।

আমাদের আলোচনা সামাজিক নাটক নিয়ে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথমদিকে রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের ভিত্তি ছিল উত্তর কলকাতার সমাজ। শিক্ষা-সংস্কৃতি, আমোদ-প্রমোদ, সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিল তখন উত্তর কলকাতা। আবার এই অঞ্চলও ছিল বেকার, মাতাল, বেশ্যা, কাপ্তেন, দালাল, ইয়ার, ঠগ্, জোচ্চোরদেরও আবাস।

"গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে-কলকাতার চিত্র পাই তা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, চাকচিক্যময় নগরের চিত্র নয়। তখনও শহর ও পল্লিগ্রাম যেন মিলেমিশে ছিল। গাছপালা, বাগান, পুকুর তখন শহরের এখানে সেখানে দেখা যেত। রাস্তা ধুলো, পাঁক, ময়লা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল। শুঁড়িখানা, বেশ্যালয়, বাগানবাড়ি, কলকারখানা সব পাশাপাশি ছিল। রাস্তায় ইতরজাতীয় লোক, রঙ-তামাসার লোক, খেমটাওয়ালি, জমাদার, ঝাড়ুদার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল। পালকির ব্যবহারই বেশি ছিল। বড়লোকদের ছিল ফিটন, জুড়িগাড়ি ইত্যাদি। লোকেদের নৈতিক মান ছিল নিম্নস্তরের। অলস, বিলাসী, অকর্মা

বড়লোকের ছেলে শান্ত নিরীহ ভদ্র নরনারীদের পক্ষে আতঙ্কের স্থল ছিল। বাগানবাড়ি কিংবা বৈঠকখানায় বেশ্যাদের সঙ্গে কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের স্রোত বয়ে যেত। শুধু তাই নয়, গৃহস্থ বৌ, মেয়ে জোর করে ধরে এনে তাদের মান ইজ্জৎ নষ্ট করে অবশেষে তাদের পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করা হত। সুন্দরী স্ত্রীলোক নিয়ে পারস্পরিক জেদ ও কাড়াকাড়ি তখন এই বিত্তশালী অধঃপতিত লোকেদের একটা কদর্য স্বভাব ছিল।

এই ঘৃণ্য, কুৎসিত চিত্রের পাশে আর একটি চিত্র আছে। যে-চিত্র ত্যাগে, সেবায়, মানবিক আদর্শে উজ্জ্বল। শিক্ষিত শ্রেণির কিছু কিছু যুবক পরোপকার ও উদার মনুষ্যত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের নিষ্কাম সেবাধর্মের আদর্শে অনেকে ব্রতী হয়েছিলেন। অনেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেও ভারতের অধ্যাত্মবাদের মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। পুরুষসমাজ তখন অনেক ক্ষেত্রে ছিল অর্থলোভী, স্বার্থান্বেষী, ছন্নমতি, পাপাসক্ত কিন্তু সমাজকে ধরে রেখেছিল নারীসমাজ। স্নেহমমতা, সেবা, সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের মূর্ত প্রতীক ছিল এই নারীসমাজ। কিন্তু তাদের ভাগ্যে জুটত শুধু অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলা ও নির্যাতন। কিন্তু এ-সব সহ্য করেও এরা ভ্রান্ত, আদর্শভ্রষ্ট ও বিপথগামী পুরুষসমাজকে পরিবারের কল্যাণকেন্দ্রে এনে তাদের রক্ষা করেছে, সমাজকে তার নিজস্ব কক্ষে ধরে রেখেছে।''

গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' এই সমাজের একটি বাস্তব প্রতিফলনের নাটক। এই নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৫। নাটকের মূল বিষয়বস্তু পণপ্রথার বিষময় পরিণাম। তখনও সমাজে কৌলীন্যপ্রথার খুব প্রচলন ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের মতো কুলীন কায়স্থকেও শুধু কুলীন ঘরে কাজ করতে হত। সেইজন্য 'বর' নির্বাচনের ক্ষেত্র যেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত, বরপক্ষের চাপও তেমনই অত্যাচারের মাত্রায় গিয়ে পৌঁছত। এ-নাটকের গোড়াতেই প্রধান চরিত্র করুণাময় বলেছেন, ''হায় হায় যদি বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থের সঙ্গে বিবাহপ্রথা প্রচলন হয়, তা হলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হয়।'' কিন্তু সমাজ সেদিকে অনুদার। ফলে নাটকে কন্যাদানের সমস্যা এবং কন্যাদানের পরবর্তী অবস্থার শোচনীয়তা রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকে বলিদান বলতে মূলত কন্যাদানকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু 'বলিদান' শুধু কন্যার নয়, হতভাগ্য পিতারও বটে! এই বলিদান বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন সর্বনাশা পণপ্রথা ও কন্যানিগ্রহ বন্ধ করা। গিরিশচন্দ্র নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে পণপ্রথার

নিষ্ঠুরতা এবং নারীনিগ্রহের ভয়াবহতার নির্মম বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে উদ্ঘাটন করেছেন।

এই নাটকে আমরা যে কয়টি নারীচরিত্র পাই তার মধ্যে কয়েকজন সধবা ও কয়েকজন প্রতিবেশী এবং কয়েকজন নিচুজাতীয় স্ত্রীচরিত্র আছে—এদের সকলের অবস্থা সমাজে এক রকম নয়। এদের মধ্যে প্রধান নারীচরিত্র হল করুণাময়ের স্ত্রী সরস্বতী। স্বাভাবিকভাবে তিনি স্বামীকে অনুসরণ করেন। বাঙালির সংসারে তিনি স্নেহময়ী করুণারূপিণী জননী। স্বামীর দুঃসময়ে তিনি তাঁকে বল ভরসা দিয়ে বোঝান, উৎসাহ দেন। আবার কখনও তিরস্কারও করেন। বাইরের ঘটনার উত্থান-পতনে তাঁর কোনো হাত নেই। অথচ তার ফলে সংসারে যে দুর্যোগ নেমে আসে তার আঘাত তাঁকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ময়ী করুণাময়ের তিন কন্যা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা করুণাময় বাড়ি বন্ধক দিয়ে প্রথমা কন্যা কিরণের বিবাহ দেন। তাঁর জামাতা মোহিতমোহন মাতাল ও লম্পট। কিরণের শাশুড়ি বৌ-কাট্‌কি এবং দজ্জাল। স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনে কিরণময়ী অল্পদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে ফিরে আসে। বহু সন্ধানের পর দ্বিতীয়া কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেন এক রুগ্ন দোজবর বৃদ্ধ বরের সঙ্গে। বিবাহের অল্পদিন পরেই হিরণ্ময়ী বিধবা হয়। স্বামীর প্রথম পক্ষের পুত্রেরা সৎমাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। হিরণ্ময়ীকে নিঃস্ব অবস্থায় পিত্রালয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

দুই কন্যার বিবাহ দিয়ে করুণাময় ঋণভারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অর্থের অনটনে একমাত্র পুত্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়। সব হারিয়ে বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকবার সময় বিব্রত বিপন্ন বাপের নিষ্ঠুর তিরস্কারে বিধবা হিরণ্ময়ী জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। হিরণ্ময়ীর ক্ষেত্রে কন্যার যথার্থ বলিদান হয়েছে।

তৃতীয় কন্যা জ্যোতির্ময়ী বড় দুই দিদির নির্যাতন এবং পরিণতি দেখে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। বিবাহই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সে আধুনিক, স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল নারী। সংসার বাঁচাবার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। হাতের কাজ করে মেয়েরাও যে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে এ সাহস, শক্তি, মনোবল এবং আত্মপ্রত্যয় জ্যোতির্ময়ীর আছে। প্রতিবেশী উদার, শিক্ষিত যুবক কিশোরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিশোর-জ্যোতির্ময়ীর ঘটনায় অবশেষে কিরণের অনুতপ্ত স্বামী তার কাছে ফিরে এসেছে। বস্তুত জ্যোতির্ময়ী-কিশোরের বিবাহের ঘটনায় এই নাটকের অনেক জটিলতারই

অবসান ঘটেছে। করুণাময় তাঁর প্রতিবেশীর এক দুশ্চরিত্র, লম্পট পুত্রের সঙ্গে প্রথমে জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই লম্পট পুত্রের পিতা বিবাহসভায় এসে জ্যোতির্ময়ীকে তার পুত্রের বাগদত্তা বলে দাবি করে। এরূপ নানা বিড়ম্বনায় অবশেষে করুণাময় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন এবং তাঁর স্ত্রী সরস্বতীরও কন্যা এবং স্বামীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

কিরণময়ীর শাশুড়ি মাতঙ্গিনী প্রকৃত অর্থে ছিল ভুজঙ্গিনী। তৎকালে বৌ-কাটকি দজ্জাল শাশুড়ির সে আদর্শ প্রতিনিধি। পাড়া-প্রতিবেশিনীদের ডেকে এনে বৌ-এর চেহারা, পণের-টাকা, যৌতুকের জিনিসপত্র প্রভৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালাগাল, অঙ্গভঙ্গিসহ ইতর মন্তব্য তার চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। আবার এই নির্লজ্জ ধূর্ত স্ত্রীলোকটি তার ছেলে এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে মাতাল, বেশ্যাসক্ত কুঞ্জ দুলালের সঙ্গে করণাময়ের মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করে এবং তার উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে অভিসম্পাত দেয়।

কিশোরের মা রাজলক্ষ্মীও পতিব্রতা বাঙালি নারী। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে বড়লোকের মেয়ের বিবাহ দিয়ে প্রচুর যৌতুকের আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের মেয়ে ভামিনীর দুর্গতির কথা মনে রাখেননি। ভামিনীকে অনেক টাকা দিয়ে বিয়ে দিলেও সে সুখে স্বামীর সংসার করতে পারেনি। তাকেও নানা নিগ্রহ ভোগ করে পিতৃগৃহে চলে আসতে হয়েছিল।

এই নাটকে একটি ব্যতিক্রমী নারীচরিত্র, সে জোবি। সেও বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বামীর লাথি খেয়ে সংসার ছেড়ে তাকে পথে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তার স্বামী লম্পট, দুরাচারী, মাতাল রমানাথ। শাশুড়ি ও স্বামীর অত্যাচারে স্বামীর সংসারে ঠাঁই হয়নি। জোবীও শ্বশুর বাড়িতে লাঞ্ছিতা নারীদের একজন। তবে কিরণময়ী, হিরন্ময়ীর মতো সে নিজেকে কখনও অসহায় মনে করেনি। স্বামীর সংসারে অত্যাচারিত হয়ে পিতৃগৃহেও তার ঠাঁই মেলেনি। তার পরিচয় ভিখারিনি পাগলিনি। তার জীবনে তিক্ত ও দুঃখময় অভিজ্ঞতার মধ্যেও সে স্বামীবিদ্বেষী বা আত্মঘাতী হয়নি। সে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। তার কপট স্বামীকেও সে আর্থিক সাহায্য করে। গিরিশচন্দ্র পাগল, বাতুল ও ভিখারি চরিত্রকে অনেক জায়গায় বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। জোবিও একটি তাৎপর্যময়ী চরিত্র। সে নিজে দুঃখী হয়েও

অন্যের দুঃখে সে সমবেদনা জ্ঞাপন করে। প্রয়োজনে তাদের সে সাহায্যও করে। কিরণময়ীকেও সে সাহায্য করেছিল। বাইরের দিক থেকে এরা তুচ্ছ, হীন, অবজ্ঞেয় হলেও তারা মানুষের প্রবুদ্ধবিবেক, সত্যপথ-প্রদর্শক এবং মুক্ত-আলোর দিশারি। জোবি-আপাত দৃষ্টিতে ভিখারিনি, অবজ্ঞার পাত্রী। কিন্তু ঘরের বাঁধন-ছিন্ন করার পর তার মধ্যে এমন একটা নৈতিক শক্তি এবং নির্ভয় সত্যদৃষ্টির জাগরণ ঘটেছে যার ফলে সকলে তাকে মানে, খাতির করে, সমীহ করে। তার গতি সর্বত্র অবাধ। পুলিশের লোকেরা তার কথার বাধ্য। কিশোর ও তার যুবক সঙ্গীগণ তাকে শ্রদ্ধা করে। রমানাথ এখন তার করুণা ভিক্ষা করে। পাষণ্ড দুলালচাঁদ তার ঐন্দ্রজালিক উপদেশে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। দুলালচাঁদের মানসিক রূপান্তরের ফলেই এই নাটকের কাহিনীর আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে। জোবি সংসারের সকলের কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছে। কিন্তু কখনও সে কাউকে আঘাত দেয়নি। বরং তার মধ্যে এমন এক অলৌকিক শক্তির নির্ভর ঘটেছে যার ফলে তার গায়ে কোনোও কাদা লাগেনি। সে এক অলৌকিক শক্তির কাছে নিজেই নিবেদিতপ্রাণ। এই নাটকে আর একটি নারীচরিত্র আছে, সে হল যশোমতী। তার দাপটে রূপচাঁদের মতো প্রতাপান্বিত পুরুষও থরহরি কম্পমান। যশোমতীর কড়া হুকুম ছিল, "ও মিনসেকে জেলে দাও, আর মেয়েটাকে টেনে নিয়ে এসে দুলুর সঙ্গে গাটছাড়া বেঁধে দাও।" এই যশোমতী কিরণময়ীর শাশুড়ি মাতঙ্গিনির অনুরূপ।

এছাড়াও কিছু গৌণচরিত্র আছে—ঝি, প্রতিবেশিনী, ঘটকী ইত্যাদি। বিভিন্ন ঝিরা বৈবাহিক বাড়ির খবর আদান, প্রদান করেছে। মোহিতের বাড়ির খবর এনেছে করুণাময়ের ঝি, ভামিনীর শ্বশুরবাড়ি থেকে শাশুড়ির চরমপত্র এনেছে আর এক ঝি। চাঁছা-ছোলা, ধারাল ও মাজাঘষা কথা এসব ঝিদের। কিরণ ও হিরণের শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কিছুটা সহানুভূতি ও সহৃদয়তার স্পর্শ পাওয়া যায়।

'বলিদান' যেহেতু একটি সামাজিক নাটক। এই নাটকে কলকাতার সমাজজীবন, বিশেষ করে সমাজে যে পণপ্রথা সেই সমস্যার উপরেই গিরিশচন্দ্র এই নাটক রচনা করেছেন। তখন সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা অটুট ছিল। পিতৃপ্রধান পরিবারে পিতাই প্রধান নিয়ামক ও শক্তি। তাঁর ইচ্ছা এবং বিধান অনুযায়ী পারিবারিক কর্তব্যবোধ, ত্যাগ, লেনাদেনা ইত্যাদি পালিত; তবে সমাজের স্বার্থপরতা লোভ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি প্রবৃত্তির

জন্যে সংসারের নানা অশান্তি, উপদ্রব, দুঃখ, ট্র্যাজেডির উদ্ভব হত। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধ, পিতার সঙ্গে পুত্রের অসদ্ভাব, বৌ-এর উপর শাশুড়ির অত্যাচার প্রভৃতি নানা অবাঞ্ছিত এবং দুঃখজনক ঘটনা ঘটত। এই সব ঘটনা বাইরে থেকে আসত। যেমন—বৈবাহিক বাড়ি থেকে কোনো অবিচার, অত্যাচার কিংবা আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা পরিবারের কোনোও ব্যক্তির অসৎকাজ অথবা কুক্রিয়ায় আসক্তি ইত্যাদি। এর প্রতিক্রিয়ায় সংসারে দুঃখ, অশান্তি দেখা দিত। স্বাভাবিক কারণে পরিবারের যিনি প্রধান তাঁর উপরেই এই আঘাত বেশি করে দেখা দিত। তার ফলে তিনি বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, অপ্রকৃতিস্থ এমন কি আত্মঘাতী হতেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে সমাজের দুর্নীতি, বিকৃতি ও অধঃপতনের বাস্তব চিত্র এই নাটকে দেখা যায়। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরাও অসৎ, স্বার্থপর ও অপরাধপ্রবণ। তাদের মদ্যাসক্তি ও বারবণিতা বিলাসের বিষময় পরিণাম, দরিদ্র অসহায় মানুষের উপর ধনমদমত্ত মানুষের অত্যাচার—ইত্যাদি সবই তৎকালের বাস্তব ঘটনা। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায়। নব্যশিক্ষিত যুবকেরা তখন প্রাচীনপন্থী-প্রথা এবং সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। সেইজন্য তারা সভা-সমিতি গঠন করে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছে। নব্যশিক্ষিত যুবকদের এই মহৎ কাজে অগ্রণী ভূমিকার পরিচয় এই নাটকেও আছে। কিশোর তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে 'বান্ধব সমিতি' গঠন করে এই সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছে। কিশোর বলেছে, "যদি পিতা মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্যে নিযুক্ত রাখেন, যদি আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখান যে, দৈহিক-স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে রাঙ্গা বর হবে, হেন হবে, তেন হবে, এই সব না শোনান, যদি কন্যা বুঝতে পারে যে, পিতা মাতা তার জন্যে দৈহিক ভাব পরিত্যাগ করে বন্ধুভাবে কালযাপন করছেন, যদি আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার তাড়া না করেন, তা হলে কি মনে করো, দুর্ঘটনা ঘটে?" এরা রাত্রে অনাথ স্কুল খুলে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত হয়েছে। যেখানে হাহাকার সেখানেই কিশোরের মত অগ্রণী যুবকেরা আছে।

পিতৃগৃহে যে কন্যা, শ্বশুরগৃহে সেই বধূ। বলিদানের ফলে একটি প্রাণীর প্রাণ যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনই বিবাহের পরে নারীও বিগতপ্রাণা হয়ে পড়ে। কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা, বধূরূপী বেশির ভাগ জায়গায় নারী আত্মঘাতিনী হয়েছে। কিরণ্ময়ী, হিরণ্ময়ী, জোবি সকলেই

পরিত্যক্তা হয়েছে। বিবাহের পরে পিতৃগৃহেও কন্যা বাঞ্ছিতা ও আদৃতা নয়। কিরণ্ময়ী ও হিরণ্ময়ী পিতৃগৃহে ফিরে এসেও সমাদৃত হয়নি। দারিদ্র্য ও অপমানের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়ে পিতা তাদের প্রতি দুর্বাক্য উচ্চারণ করেছেন। হিরণ্ময়ী নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে এবং সে সহ্য করতে না পেরে পুকুরের জলে আত্মবিসর্জন করেছে। অতএব শ্বশুরবাড়িতে এবং বাপেরবাড়িতে কন্যার স্থান শোচনীয় ছিল। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র কন্যাদানকে বলেছেন 'বলিদান'।

উনিশ শতকের শেষ দিকে নানা সমাজ সংস্কারের ফলে নারীজাগরণ ঘটলেও সাধারণ ভাবে বাঙালি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীর অবস্থান কী রকম ছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' এবং 'বলিদান' নাটক। 'সতীদাহ নিবারণ' আইন পাশ হওয়ার পর জীবন্তদগ্ধ হওয়ার হাত থেকে নারী রক্ষা পেল। সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইনও পাশ হল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের কাছে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। অনেক বাঙালি নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। অনেকে অন্তঃপুরের চোকাঠ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসারও অধিকার পেল। অনেক মহিলা পরিচালিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছল। ফলে উনিশ শতকের অভিজাত হিন্দুপরিবারে বেশ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এই জাগরণের প্রতিফলন তেমন দেখা যায় না। সেখানে আলোর নিচে অন্ধকারের মতো নারীদের জীবনেও কতগুলি সামাজিক বিধি-বিধান অলঙ্ঘ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে বরপক্ষের মর্জি ও দাবি অনুযায়ী হতভাগ্য কন্যাদের নানা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হত। বিবাহের পরে ভীত, সন্ত্রস্ত, নিঃসহায় নারীকে প্রায়ই শাশুড়ি, ননদিনি এবং প্রতিকূল আত্মীয়-আত্মীয়াদের হাতে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হত। নারীকে এক প্রকার পণ্যরূপে গণ্য করা হত।

এর প্রতিকার অবশ্য ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই সম্ভব। কিশোর এবং তার 'বান্ধব-সমিতি'র মধ্যে সেই উদ্যোগের কথাও এই নাটকে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথাগতসংস্কার সমাজের এক দারুণ ব্যাধি। তার ঊর্ধ্বে উঠে স্বাবলম্বী না হলে এবং সুশিক্ষিত না হলে এই বলিদানপ্রথা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

পূর্বে আলোচিত 'বাবু' নাটকের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ও প্রাচীনসমাজের বিভিন্ন বয়সের নারীর অবস্থান ও পরিস্থিতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেখানে অমৃতলাল ব্রাহ্মিকা নারীদের অত্যাধুনিকতা, নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি এবং

বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক চিত্রই উপস্থিত করেছেন। বর্তমান নাটকে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র কৌলীন্যসর্বস্ব পণপ্রথার মধ্যে নাটকের বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখলেও এই নাটকে প্রাচীনপন্থীসংস্কারে আবদ্ধ মানুষ এবং শিক্ষিত নব্যযুবকদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে তৎকালীন সমাজের একটি বড় সমস্যা, বিশেষ করে নারীদের অবস্থানের কথা সহানুভূতির সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। এখানে একদিকে যেমন সংস্কারে জর্জরিত সমাজের অবক্ষয়ের কথা আছে তেমনই নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কার ভাঙার উদ্যোগে আশার আলোর কথা বলেছেন। মাতাল, লম্পট দুলালচাঁদ, মোহিতমোহন, রমানাথ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই অবক্ষয়ের চিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলন কেবলমাত্র বর্হিমুখী নয়, অন্তর্মুখী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে সমাজে নারীনিগ্রহই সর্বত্র স্বাভাবিক প্রথারূপে গণ্য করা হয় সেখানে কিশোরের মতো উদার, নির্ভীক নারীমুক্তিবাদী যুবকদের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে সমাজে নারীর অবস্থানের কারুণ্যকেই নাট্যকার প্রকট করে তুলেছেন।

এই নাটকে একদিকে আমরা যেমন সমাজের নিষ্ঠুর পণপ্রথা এবং নারীদের প্রতি অনুদারতার পরিচয় পাই তেমনই অন্যদিকে সমাজের একটি পরিবর্তনমুখিতাও লক্ষ করতে পারি।

খাসদখল

সর্ববিধ সামাজিক প্রগতির বিরোধী অমৃতলাল বসু তাঁর 'খাসদখল' নাটকটি লিখেছিলেন ১৯১২ সালে। লর্ড কার্জনের কুখ্যাত 'বঙ্গভঙ্গ' আইন সবেমাত্র রদ (১৯১১) হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির সামগ্রিক আবেগ উদ্বেলিত হয়েছিল। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, নাটক প্রভৃতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটা প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অমৃতলালের নাটকে তার পরিচয় নেই। তিনি এই নাটকেও ব্রাহ্মসমাজের নারীমুক্তি, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি আন্দোলনের দুর্বলতাই চিত্রিত করেছেন। এই নাটকের মূল বক্তব্য হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের দুর্বলতার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ। তিনি বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবই প্রধান। অবশ্য তিনি যে চরিত্রগুলিকে আক্রমণ করে ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনা করেছেন তাদের মধ্য দিয়ে আমরা সেই সমাজের অগ্রগতি বিশেষ করে নারীর অবস্থান জানতে পারি। বিরুদ্ধবাদী নাট্যকার হলেও তিনি সমকালীন জীবন ও চরিত্র অবলম্বনেই তাঁর প্রহসন রচনা করেছেন। অতএব সেই চরিত্রগুলি তখনকার জীবন ও তাদের অবস্থানেরই পরিচয় জ্ঞাপক।

'খাসদখল' নাটকে গৃহকর্ত্রী মোক্ষদা এবং তাঁর পরিচারিকা 'গিরিবালা' প্রধান চরিত্র হলেও এখানে আহ্লাদী, বিধু, লাবণ্য, মহালক্ষ্মী, বিভাস, মিনি ও মহিলাগণ ইত্যাদি বহু নারীচরিত্র আছে। তবে সে-সব নারীচরিত্র একেবারেই গৌণ।

'খাসদখল' নাটকটি ১৯১২ সালের ৩০ মার্চ মঞ্চে অভিনীত হয় এবং ঐ বছরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্র. ২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার)। এই নাটকে অমৃতলাল বিশ্বাস করেন গঙ্গা স্নানে, হরিনামে পুণ্য আছে। সেই জন্য তিনি বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষাকে কখনও সমর্থন করতে পারেননি। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতির বিকৃতিকেই তুলে ধরে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। এই নাটক মূলত বিধবা-বিবাহের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র।

খাসদখলের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মোক্ষদাই প্রধান। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা, বিধবা-বিবাহের সমর্থক এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তার স্বামী প্রখ্যাত উকিল লোকেনবাবু সমাজসেবী। বিধবা-বিবাহের একনিষ্ঠ সমর্থক; এবং ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। মোক্ষদাও বিধবা-বিবাহের সমর্থক। তার স্বামী লোকেনবাবু

পশ্চিমে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেড়াতে গিয়ে 'নিরুদ্দেশ' হয়ে যান। লোকেন বাঘের মুখে নিহত হয়েছেন এই সংবাদের পর মোক্ষদা বেশি সময় অপেক্ষা না করে স্বামীর বন্ধু কবি মোহিতের সঙ্গে বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই লোকেনের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটায় সেই বিবাহ সম্ভব হয়নি। লোকেন এবং মোক্ষদা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার ভুল স্বীকার করে আবার হিন্দুমতের অনুগামী হয়েছিলেন।

এই নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র গিরিবালা। সে লোকেনবাবুর বাড়ির পরিচারিকা। নিতান্ত ছেলেবেলায় নন্দদুলাল নামে এক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের রাত্রে শিক্ষাহীন অজুহাতে সে গিরিবালাকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়। পরে ঘটনাচক্রে গিরিবালা মোক্ষদার আশ্রয়লাভ করে। মোক্ষদা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে গৃহে প্রতিপালন করেন। এদিকে নন্দলালও মোহিতের ছদ্মনামে কবিত্বচর্চায় লোকেনের সান্নিধ্য গ্রহণ করে। পরে এক হাস্যকর মুহূর্তে লোকেন নিরুদ্দেশ অবস্থানের পর যখন স্বগৃহে ফিরে আসেন তখন গিরিবালার সঙ্গে এই নন্দদুলাল ওরফে মোহিতেরও মিলন ঘটে।

আর একটি চরিত্র মোক্ষদার ঝি আহ্লাদী। মোক্ষদা তাকেও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মোক্ষদা তাঁর স্বামী লোকেনের যথার্থ সহধর্মিণী। তাঁরা বালিকা-বিবাহ নিবারণ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী। তাছাড়া ভারত উদ্ধারের এবং বঙ্গমাতা উদ্ধারের কাজেও তারা নিবেদিত। এ নাটকের অন্যতম চরিত্র মাইতির কথায় জানা যায়, "বঙ্গের বিধবা আর দিনপেশা রুক্ষকেশা পরলোকগত প্রিতিপদ পিপাসিতা কাঙালিও নহে। দেখ দেখ ভারত! দেখ দেখ বঙ্গ! তোমার বিধবা যুবতীরা আবার সুচিক্কন শাটী পরিধান করিয়া কম-কায়ার সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিতেছেন। আবার ব্রেসলেট, নেকলেস, ইয়ারিং-এ চারু-অঙ্গ অলংকৃত করিয়া স্বর্ণালংকারের শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছেন" ইত্যাদি। এই উক্তির মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়েছে। নারী বৈধব্যদশাকে আর একমাত্র ভবিতব্য বলে জ্ঞান করছে না।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার সদর্থক প্রভাব সমাজের উপর পড়েছিল। 'সতীদাহ প্রথা' নিবারিত হয়েছে, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবাবিবাহ' প্রচলিত হয়েছে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসে এই সবের বিবরণ পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের নবপ্রবুদ্ধ বাংলার সমাজ এদেশে অবহেলিত নারীজাতিকে নতুন মর্যাদা দান করে এর অগ্রগতির পথকে সুগম করবার যে প্রয়াস পাচ্ছিল সে কাজ যে কত কঠিন বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তার পরিচয় অমৃতলালের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলিতে আমরা জানতে পেরেছি।

ব্রিটিশ শাসকের বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)-কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এক প্রবল প্রতিবাদী আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর প্রবল ধাক্কা বঙ্গসমাজের সর্বস্তরে আঘাত হানে। বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বরাজ ও স্বদেশি আন্দোলন, বয়কট, জাতীয়-শিক্ষা ও জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রমে প্রসারিত হয়। ভারতবাসী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদেশি শাসকের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিভিন্ন সভা, সমিতি (অনুশীলনী, সঞ্জীবনী সভা) পত্র-পত্রিকা এবং (সঞ্জীবনী, হিতবাদী, সন্ধ্যা, চারুমিহির, যুগান্তর, নবশক্তি, সুপ্রভাত প্রভৃতি) ও লেখক শিল্পী গোষ্ঠীর—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ) প্রয়াস ও লেখার মধ্য দিয়ে দিনের রুদ্রবাণী প্রচার করে বাংলার সমাজের দীর্ঘকালের জাড্য ঘুচিয়ে দেন। এ সময় বরদা থেকে শ্রী অরবিন্দ কলকাতা এসে এক হাতে বিপ্লব, অন্য হাতে জাতীয় শিক্ষার হাল ধরেন। তাঁর কাগজ 'বন্দেমাতরম'-এর শিরোভূষণ হল "India for Indians"।

এর ফলে বাঙালি সমাজের মধ্যেও একটা আলোড়ন হয়। যার প্রভাবে অন্তঃপুরের নারী সমাজকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও তাদের চিন্তা, চেতনার বিকাশ লাভ করে বাইরের সমাজে প্রেরণা জোগায়, কেউ কেউ কার্যকরী ভূমিকাতেও অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেফতার হলে কলকাতার মহিলারা নীলরতন সরকারের বাড়িতে সমবেত হয়ে ভূপেন্দ্রজননীকে সম্বর্ধনা জানান।

এরই মধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বিনিময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ের কয়েক বছর পূর্বে রামকৃষ্ণ সহধর্মিণী জননী সারদাকে কেন্দ্র করে নতুন একটি নারীসমাজ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তপস্বিনী মাতাজির ভারতীয় ধারায় গড়া বালিকা বিদ্যালয় 'মহাকালী পাঠশালা' এবং ভগিনী নিবেদিতার বাগবাজারে ভারতীয় রীতি-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় (বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রী মা সারদামণি দেবী) বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একান্ত উজ্জ্বলতম ঘটনা। কিন্তু নারীশিক্ষার জন্য সমাজ-মন তখনও সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়নি। এই সব

বিদ্যালয়ে অনকদিন যাবৎ উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রী জোটানো সম্ভব হয়নি। এ-বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস, 'আধুনিক যুগমুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, "........পরিবারের নিয়ম কানুন প্রধানত স্ত্রীলোকেরাই রক্ষা করে। হিন্দু শাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, স্বীয় পরিবারের বাহিরে আর কাহারও প্রভাবে তাহারা পরিচালিত হইবে না।" এই চিন্তাধারায় যে ফাটল ধরেছিল তারও কিছু প্রমাণ বাংলার সমাজজীবনে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের মধ্যে অনুভবগ্রাহ্য হয়েছিল। কার্যক্রমে পরিবর্তনটা পুরুষদের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নারীসমাজেও শিক্ষার বিস্তার অনিবার্য ভাবে ঘটে যায়। বাংলায়ও তাই হয়েছে। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্মসমাজ পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে এবং হিন্দুধর্মের প্রবল বিরূপতায় হয়তো বিলুপ্তি হতে বসেছিল কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শিক্ষিত সমাজসেবকবৃন্দ, তা সে প্রাচীন হোক, বা নবীনই হোক সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে, নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা ভদ্রসমাজ মেনে নেন এবং সেই ধারাটা পরম্পরাক্রমে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে।

সময়ের পরিবর্তনে এবং শিক্ষার প্রসারে ও উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে গ্রাম্য, অশিক্ষিতা নারীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ নারীর সত্যিকারের উত্তরণ এবং গুণগত যে পরিবর্তন হয়েছে তা গিরিবালা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে সমাজের প্রগতির ধারা স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত। আলোচ্য প্রহসনের নারীচরিত্রের চিন্তাভাবনায় যে আমূল পরিবর্তনের পরিচয় আমরা পেয়েছি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে নারীর অবস্থানের সেই অগ্রগতি আরও স্পষ্ট হবে।

গিরিবালার এই যে পরিবর্তন তার মূলে ছিল সমাজ সংস্কারক উকিল লোকেনের পরিবার প্রতিবেশ এবং শিক্ষিতা সমাজসংস্কারক মোক্ষদার হৃদয়ের ঔদার্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি। এই মোক্ষদাকেই আমরা অন্যরূপে দেখতে পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকের শিক্ষিতা বিধুমুখীর মধ্যে। আমরা দেখতে পাই ভারতের প্রথম আই. সি. এস. রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনীর মধ্যে। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এবং নারীশিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে নারীসমাজ প্রচলিত হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কারের আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন মোক্ষদা তাদেরই একজন। আমরা ইতিপূর্বে নানা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েও তা প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে মোক্ষদা নামে শিক্ষিতা বিধবা-বিবাহের সমর্থক লোকেন-পত্নী

মোক্ষদার চরিত্রকে নাট্যকার ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থিত করলেও মোক্ষদার মধ্য দিয়ে তৎকালীন নারীপ্রগতি ও অবস্থানের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

'খাসদখল' নাটকে স্পষ্টতই স্বদেশি আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় এই নাটকটি রচিত হয়েছিল ১৯১২ সালে, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরে। তৎকালীন বড়লাট কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাদেশের স্বাদেশিক আন্দোলন, সংস্কার আন্দোলন, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যই মূলত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ও অবদান গর্ব করার মতো। আমাদের প্রধান আলোচনা যেহেতু নারীর অবস্থান এবং তার জাগরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেজন্য এখানে বিস্তৃত ভাবে এই স্বদেশি আন্দোলনের আলোচনা সম্ভব না হলেও এখানে তার অনিবার্য সহযোগী সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে প্রসঙ্গ এসেছে, সেজন্য এই আন্দোলনের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সতীদাহ বিরোধী, বিধবাবিবাহ প্রর্বতন, পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং বালিকাবিবাহ বিরোধী আন্দোলনই ছিল মুখ্য। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সব আন্দোলনই যেন স্বদেশ চেতনায় এবং জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক কামনায় মুখরিত হয়ে উঠল। বাংলা নাটকে আমরা দেখতে পাই স্বদেশি আন্দোলনই সরাসরি নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকারদের মধ্যে এই দেশাত্মবোধের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে।

আমরা অবশ্য এর সূচনা দেখতে পাই 'হিন্দুমেলা'র মধ্যে, 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে। ফলে স্বদেশি আন্দোলন যেন কোনো আকস্মিক ঘটনাই নয়। ব্রাহ্মসমাজের কর্মতৎপরতা এবং আন্দোলনের মধ্যেও এই স্বাজাত্যবোধ ছিল প্রধান। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে এই মেলাকে 'স্বদেশী মেলা' বলেই উল্লেখ করেছেন। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেমের নতুন আবেগ সঞ্চার—এই দুইটিই ছিল মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই মেলার যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁরা সকলেই ইংরেজি

শিক্ষায় শিক্ষিত এবং চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই স্বাদেশিকতার এক নবরূপায়ণ গড়ে ওঠে বিশেষভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক রূপ ছিল পুরোপরি সংস্কারমূলক। কিন্তু পরে এই আন্দোলন অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। এঁরা জাতিভেদ অস্বীকার করেন, উপবীত পরিত্যাগ করেন এবং পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী হয়ে দাঁড়ান। এদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। ব্রাহ্মমহিলারাও পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে উপাসনা সভায় পুরুষদের পাশে অংশ গ্রহণ করেন। এই সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভারত সংস্কার সভা' (১৮৭০)। এই সভার কার্যক্রমের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা এবং শ্রমিকশিক্ষা ছিল অন্যতম।

আমরা 'খাসদখল' নাটকে শিক্ষিত সমাজ সংস্কারক উকিল লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদাকে লোকেনের পাশে শিক্ষায়-দীক্ষায় উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখি। এই মোক্ষদা তাঁর বাড়ির পরিচারিকাদেরও শিক্ষিতা এবং সংস্কারমুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায় অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা গিরিবালাও শিক্ষিতা এবং রুচিশীলা হয়ে উঠেছে।

১৮৭৮ সালে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা শুধু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেই মনোনিবেশ করেননি। তাঁদের নেতৃত্বে রাজনীতি চর্চা ও স্বাদেশিকতা প্রচারও এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসুর নাম বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁর 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্চার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাহার নায়কত্বে আমরা কজন মিলিয়া একটি ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল, 'স্বায়ত্ব' শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ নির্দিষ্ট শাসন স্বীকার করি। —তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্নমেন্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।"

আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বেই সেই সময় গড়ে ওঠে 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ছাত্রসভা'। জাতীয় জাগরণের ব্যাপারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুতর দায়িত্ব বহন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'রায়ত সভা'।

অতএব অমৃতলাল বসু তখনকার শিক্ষিত সমাজ সংস্কারকদের নিয়ে যতই ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখুন না কেন সেই সময় এটা ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় দেশপ্রেমের অনুভূতি দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পল্লিসংগঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সর্বাত্মকভাবে দেশ গড়ার একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় নারীরাও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবীর নাম অবিস্মরণীয়। তাঁদের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

মুক্তধারা

স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমরা 'খাসদখল' নাটকের আলোচনা করেছি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশে স্বাজাত্যবোধের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। বাংলা নাটকে ক্রমশ এর প্রতিফলন আরও তীব্রতা লাভ করেছে।

স্বদেশি আন্দোলনের পরে আমাদের দেশে প্রবল স্বাজাত্যবোধের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা পৃথক মত ছিল। এ সম্পর্কে তিনি 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতের নবযুগের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানালেও রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মমর্যাদা এবং আত্মোন্নতি দেশ-উন্নয়নের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অসহযোগের নেতাদের সঙ্গে বিশেষ করে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বিশ্বমানবতাই তাঁর একমাত্র আদর্শ। সেই জন্য তিনি সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র হিসাবে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করলেন। এর অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর 'মুক্তধারা' নাটক।

এটি রবীন্দ্রনাথের এক উল্লেখযোগ্য তত্ত্বনাটক বা রূপকনাটক। এই নাটকের কাহিনী সুপরিচিত। এখানে আপাতদৃষ্টিতে তিনি যন্ত্রের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেছেন। এই নাটকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তোমার (কালিদাস নাগ) চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।" আসলে এই নাটকে কবির আক্রমণের লক্ষ্য যন্ত্র নয়, যন্ত্রব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদ। প্রাণ-গঙ্গার মুক্তধারার উৎসমুখে এই যন্ত্রব্যবস্থা অতিকায় বাঁধ বেঁধে তাকে অবরুদ্ধ করতে চেয়েছিল। অতএব এই যন্ত্র-ব্যবস্থারূপী বাঁধ ভেঙে দিয়ে তিনি সজীব প্রাণ-শক্তির মুক্তি দেবার আহ্বান জানালেন মুক্তধারায়।

আরও স্পষ্ট করে জানা যায়, উত্তরকূটের রাজার শিবতরাই-এর প্রজা-বিরোধী মনোভাব। শিবতরাই-এর প্রজারা মুক্তধারার ঝরণার জল দিয়েই তাদের ফসল ফলায়। তাতেও যেটুকু ফসল ফলে তাতে তাদের খেয়ে বেঁচে থাকা দায়। তাই তারা খাজনা দিতে পারে না। রাজা সে কথা বোঝেন না। প্রজা মরুক আর বাঁচুক

তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। তিনি খাজনা চান। অন্য কোনোও উপায়ে খাজনা আদায় করতে না পেরে রাজা যন্ত্ররাজ বিভূতির সাহায্যে এক বিরাট লোহার বাঁধ নির্মাণ করিয়ে মুক্তধারার ঝরণার পথ রুদ্ধ করে দিলেন। এই কাজে জবরদস্তি প্রজাদের লাগিয়ে তাদেরও অনেকের প্রাণের বিনিময়ে যান্ত্রিক উপায়ে নির্মিত হল এই বাঁধ। শিবতরাইয়ের মানুষের চাষ তো বন্ধ হলই, পানীয় জল থেকেও তারা বঞ্চিত হল। তাদের কাছে এই বাঁধ জীবন-মরণের সমস্যা। তাদের কাতর আবেদন নিবেদনেও রাজা অটল। দুর্বল প্রজাদের অন্য প্রতিকারের পন্থা জানা নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহসও দরিদ্র প্রজাদের ছিল না। এই সংকটের মুহূর্তে বাঁধের উপর নির্মিত কালভৈরবের মন্দিরই তাদের একমাত্র ভরসা। অভিজিৎ এই প্রজাদের একমাত্র হিতৈষী। অবশেষে সে তার নিজের প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারার রুদ্ধস্রোত উন্মুক্ত করে দিল।

স্বাভাবিক ভাবেই এই নাটকে তত্ত্ব কথাই প্রধান। নারীর ভূমিকা এখানে গৌণ। তবু এই নাটকের নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা এক সংস্কার-বিরোধী শোকাতুরা মায়ের মানবতাকে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারি। এই নাটকে মোট চারটি নারীচরিত্র আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অম্বাচরিত্র। জনা গাঁয়ের অম্বা সন্তানহারা এক মা। সে দরিদ্র, অসহায়া। মুক্তধারার বাঁধের কাজে তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে সে উন্মাদিনীর মতো হারানো পুত্র খুঁজে ফেরে। সে জানে না এই মুক্তধারার বাঁধ নির্মাণেই তার পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু রাজকর্মচারীরা বলে, মুক্তধারার বাঁধের কল্যাণে ভৈরবের পূজায় মন্দিরে তাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। ভৈরব মন্দিরের পথে যাত্রীদের কাছে সে তার হারিয়ে যাওয়া সুমনের সন্ধান জানতে চায়। একদিন তাকে রাজা বলেন, "ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছে।" সেখানেই তার ক্ষোভ। মাতৃহৃদয়ের সহজ প্রতিবাদ—"ভৈরব কী শুধু ডেকে নেন! ফিরিয়ে দেন না!" অম্বা এক বঞ্চিতা নারী। সে দুর্বল, অক্ষম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ সে জানে না। ভৈরব ঠাকুরের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে তার পুত্র বাৎসল্যই বড়। সে সত্যকে জানতে চায়। রাজার কাছে সুমনের সন্ধানই তার একমাত্র জিজ্ঞাসা।

অম্বা ভৈরবের মন্দিরে একদিন পূজা দিতে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসে দেখে সেখানে তার ছেলে নেই। তারপর ভৈরবের আরতিতে সকলে আনন্দবোধ করছে দেখেই তার সন্দেহ দেখা দিল। সে বলে, "আমাদের পূজা বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে না। পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।" যারা তার সুমনকে কেড়ে নিল তারাই এই পূজার প্রকৃত প্রতিবন্ধক। মন্ত্রী স্বীকার করেছিল, বাঁধ বাধার কাজে

তার ছেলের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু রাজা বলেন, "পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।" অর্থাৎ এই মন্দিরের কাজেই এবং দেবতার সেবায় তার ছেলের অন্তিম পরিণতি ঘটেছে। অম্বা জানে এ-সবই একটা ধাপ্পা। দেবতার নাম করে এরা মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাই অম্বা রাজার এবং দেবতা বা মন্দিরের এই প্রবঞ্চনায় বিশ্বাস করে না। রাজাদের কাছে অম্বা এক পাগলিনি। 'বিসর্জন' নাটকে নিঃসন্তান গুণবতীর মধ্যে আমরা যে দেবতায় অন্ধভক্তির পরিচয় পেয়েছি অম্বা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অম্বা রাজা এবং দেবতার চক্রান্তকে তুলে ধরেছে।

এই নাটকে অপর দুই নারীচরিত্র—মাসি এবং বোনঝি। এরা উত্তরকূটের বাসিন্দা। যুবরাজ অভিজিৎ নন্দীসংকটের রাস্তা খুলে দেওয়ায় এরা খুশি। মাসি অবশ্য তার মনোভাব প্রকাশ করতে অস্বীকৃত। সে বরং প্রাচীনপন্থী। যুবরাজ অভিজিৎ নন্দীসংকটের গিরিপথ খুলে দেওয়ায় উত্তরকূটের রাজা এবং পরিষদের সকলেই অভিজিতের উপরে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ। তারা যুবরাজকে আর বিশ্বাস করে না। মাসির কণ্ঠে সেই অবিশ্বাসের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বোনঝি যেন শিবতরাইয়ের মানুষের বিবেক। সে যুবরাজকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে এবং তার লম্বা চুল ভৈরবের কাছে মানত করে যুবরাজেরই জয় কামনা করে। এই বোনঝি বঞ্চিত, পীড়িত শিবতরাইবাসীদের যেন প্রতিনিধি। নারী হয়েও সে তার বিশ্বাসের সততার জন্য অকুণ্ঠ। রাজভয় ত্যাগ করে সে সকলের সঙ্গে এগিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর চেতনা জাগ্রত হয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

আরও একটি নারীচরিত্র আছে এই নাটকে, সে দেওতলির দুখনী ফুলওয়ালী। সে দরিদ্র। ফুল বিক্রি করাই তার জীবিকা। দেব, দ্বিজ, সাধুর প্রতি তার অটল বিশ্বাস। কিন্তু পথে সঞ্জয়ের কাছে উত্তরকূটের এবং ভৈরব মন্দিরের প্রকৃত খবর সে পায়। জানতে পারে, যে-সাধুর উদ্দেশ্যে ফুল নিয়ে যাচ্ছিল সে প্রকৃত সাধু নয়। যে বিভূতি মুক্তধারার বুকে বাঁধ নির্মাণ করে উত্তরকূটের স্বার্থসিদ্ধি করেছে সকলেই তার প্রচুর প্রশংসা করেছে। এই কথা শুনে সাধারণ নারীও বিভূতিকে দেওয়ার জন্যে নিজের মালঞ্চের ফুল নিয়ে এসেছে। সঞ্জয় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে বিভূতি আসলে কোনো দেব-প্রতিনিধি নয়। বিভূতি প্রকৃতপক্ষে দেবতার হাতে বেড়ি পরিয়েছে। যে বাঁধের দেবতা ভৈরব মুক্তধারার পথ অবরোধ করে শিবতরাইয়ের মানুষের দুঃখ এবং মৃত্যুকে ডেকে এনেছে তিনি কখনও মানুষের হিতৈষী নন। তাই সঞ্জয় বলে, সে যে সাধুকে সবচেয়ে ভক্তি করে যে অভিজিৎ, সে মুক্তধারার বাঁধ

উন্মুক্ত করে দিয়েছে শিবতরাইয়ের সকল মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। ফুলওয়ালি অবশেষে তার ফুল এই সাধুকেই বিনামূল্যে নিবেদন করেছে।

ফুলওয়ালি এক অশিক্ষিতা সাধারণ নারী। প্রকৃত সত্য তার জানা নেই। জনরবে বিশ্বাস করে সে তার ফুল নিয়ে এসেছিল দেব প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে বলে। সাধারণ মানুষের বোধ এবং বুদ্ধি তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'মুক্তধারা' নাটক প্রকাশিত হয়েছে 'খাসদখল' নাটকের দশ বছর পরে। এই নাটক প্রকাশের পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে দেশে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে স্বরাজের দাবিতে স্বদেশি আন্দোলনও মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য চৌরিচৌরার হিংস্র ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু দেশের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। বরং বিপ্লবীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। এই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়।

'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রূপক নাটক। এই নাটকের মধ্যে আমরা যে সমাজের চিত্র দেখতে পাই তা দ্বিধাবিভক্ত। এক দিকে উত্তরকূটের দৌর্দন্ড প্রতাশশালী শাসকশক্তি অন্যদিকে শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত শিবতরাইয়ের দরিদ্র প্রজাগণ। এই দুই সমাজের দ্বন্দ্ব এই নাটকে যথার্থভাবেই অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

আলোচ্য নাটকে উত্তরকূটের পার্বত্য রাজ্যের একটা অংশের নাম শিবতরাই। মুক্তধারার ঝরণার জল তাদের চাষবাসের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু রাজা যন্ত্ররাজ বিভূতির সাহায্যে এক বিরাট বাঁধ নির্মাণ করিয়ে মুক্তধারার সেই ঝরণার জল বন্ধ করে দেন; এবং বাঁধের উপরে এক বিরাট ভৈরব-মন্দির নির্মাণ করেন। এবং এই বাঁধকে দেবতার প্রতি অর্ঘ রূপেই জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

দুর্বল প্রজাকে রাজশক্তির পীড়ন থেকে মুক্তি দেবার ধর্মে দীক্ষিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া যায়। উত্তরকূটের গুরুমহাশয়ের চরিত্র ও কার্যাবলির মধ্য দিয়ে পরাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজেতা রাজশক্তির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মনে হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিজেতা জাতি ব্যবস্থিতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছিল এখানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরে স্বদেশি আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপক হারে না হলেও নারীসমাজ যে এই সব আন্দোলনের থেকে দূরে ছিলেন তা নয়। বহু নারী এইসব আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার কর্মসূচি হিসেবে পিকেটিং করা, চরকা কাটা, খদ্দর পরা, অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি বহু ব্যাপারে নারীরাও আগ্রহী হয়ে ঐ সব কাজে যোগদান করেছেন। শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে নবজাগরণ এবং নতুন চেতনার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুযায়ী অভিজিৎ হচ্ছে মরনেওয়ালাদের ভিতরকার পীড়িত মানুষ, আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালাদের ভিতরকার মানুষ। এই রূপক নাটকে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল,—যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে, মনুষ্যত্বকে মারে, সেই যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। কিন্তু আমরা রূপকের আবরণে লক্ষ করি শাসক শোষকের সঙ্গে শোষিতদের বাঁচার লড়াই। সে লড়াইতে শাসক সমাজের কিছু হৃদয়বান মানুষের সমর্থন থাকে।

এই নাটকে নারীচরিত্রগুলির ভূমিকা একান্ত গৌণ হলেও এর মধ্যে আমরা শিবতরাইয়ের বঞ্চিত মানুষদের অংশীদার রূপেই তাদের দেখতে পাই। সন্তানহীনা অম্বার পুত্রসন্তানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিবাদী মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। বোনঝির আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, বোনঝি মাসির থেকে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। তার বুদ্ধি স্থূল নয়। যন্ত্র-দানবের ধ্বংসকারী ক্ষমতা মানুষের কল্যাণ করতে পারে না—এই বোধ তার এসেছে অভিজিতের কার্যকলাপ দেখে। রাজশক্তির অত্যাচার ও শোষণে প্রজারা যখন জর্জরিত হয় তখন নিরুপায় হয়েই তারা দেবতার দ্বারস্থ হয়। এই নাটকের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সেই অসহায় মনোভাবেরই প্রকাশ পাওয়া যায়। ভৈরব-ই তাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নারীদের এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির পথই দেখিয়েছেন। তারা যুক্তি-বুদ্ধির পরামর্শ গ্রহণ করেছে।

এই নাটকের কোনো সামাজিক বর্ণনা নেই। আছে শোষিত, বঞ্চিত, প্রজাসাধারণের ক্ষোভ ও দুঃখের কথা। অতএব এখানে সমাজ সংস্কারের চেয়ে স্বাজাত্যবোধের কথা, শাসন মুক্তির কথা প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আছে প্রজা বিদ্রোহ এবং সত্যাগ্রহের উল্লেখ।

রক্তকরবী

পাশ্চাত্য যন্ত্র-সভ্যতার উপর রীবন্দ্রনাথের বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। তাঁর প্রধান অভিযোগ যান্ত্রিকতা মানুষের সহজশক্তি, সৌন্দর্যকে নষ্ট করে স্তূপীকৃত বস্তুপিন্ডের উপর তার সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত। সেই বেদনাই রূপকের আবরণে 'রক্তকরবী' নাটকে রূপ লাভ করেছে। এই নাটকের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই যন্ত্রের যুগে মানুষ নৈর্ব্যক্তিক হয়েছে। মানুষ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। 'মুক্তধারা'র মধ্যেও এই যান্ত্রিকতার কথা আলোচিত হয়েছে। এই নাটকের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্র আছে। সময়টা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের। মহাত্মাগান্ধী তখন কারাগারে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় নেতাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ। আন্দোলনও ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐ আন্দোলন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলে তাঁর মনে হয়েছিল এর কারণ অর্থনৈতিক। শিবতরাইয়ের সঙ্গে উত্তরকূটের বিরোধের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক সভ্যতার নির্মমতা ও বীভৎসতা নিয়েই লিখেছেন 'রক্তকরবী' নাটক। তাঁর সমগ্র বক্তব্যই রূপকের আবরণে বিবৃত। এই নাটকে যক্ষপুরী ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থাপ্রধান চিত্র। বাণিজ্য ক্ষেত্রে যারা টাকা খাটায়, আর যারা সেখানে মজুর খাটে তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ থাকে অনেক বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়। সেই পীড়ায় বিপ্লব ঘটে। আধুনিক ভাষায় তাকে বলে শ্রেণিবৈষম্য।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই নাটকে শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করলেও তিনি তার ফলে কোনোও বিপ্লবের কথা বলেন নি। সেই জন্যই বোধ হয় নাটকটির নাম পরিবর্তন করে 'যক্ষপুরী'র পরিবর্তে 'রক্তকরবী' নামকরণ করেন। এখানে তিনি শ্রেণি-সংগ্রাম এবং বিজ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতিকে বড় করে রেখেছেন। প্রাণের অদম্য শক্তিকে কৃত্রিম কোনোও বাঁধনের দ্বারাই নষ্ট করা যায় না।

'রক্তকরবী' একটি বহু আলোচিত নাটক। 'রক্তকরবী'র তত্ত্ব এবং তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য পৃথক। নাট্য আলোচনা বা তত্ত্বালোচনা আমাদের বিষয় নয়। আমরা এই নাটকের মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থান লক্ষ করছি। 'রক্তকরবী' নাটকের একজন নারীই প্রধান চরিত্র। আমরা এই পর্যন্ত যে সব নাটক আলোচনা করেছি তার মধ্যে নারীচরিত্র বর্তমান

থাকলেও নারীকে কেন্দ্র করে নাট্যচরিত্রের সংগঠন ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম নন্দিনী নামক একটি নারীকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। অবশ্য একই সঙ্গে স্মরণীয় 'রক্তকরবী' কোনোও সামাজিক নাটক নয়। এটি একটি তত্ত্বপ্রধান রূপক নাটক। তবু তত্ত্ব বা রূপকের আড়ালে আমরা একটি মানবীর যে চিত্র পাই তার মধ্যে সমাজজীবনের নারীর অগ্রগতির প্রকাশ অনুভব করি। প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।" রবীন্দ্রনাথের এই মানবী কোনোও সামাজিক নারী নয়। নন্দিনীর কোনোও সামাজিক সত্তা আমাদের অজ্ঞাত। এই মানবী রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। তাঁর চিরন্তন প্রকৃতি মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধ এবং তা প্রকাশে সহজ স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত হওয়া। এইটেই তাঁর একান্ত প্রকৃতি। কারণ সে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে প্রাণের স্পন্দন। ফলে তার পক্ষে জীবননিগ্রহের প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব। কিশোরের শাস্তির সম্ভাবনায় সে শিউরে ওঠে। যক্ষপুরীর নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গদের কাছে তাকে মনে হয় আকাশের সন্ধ্যাতারা। যক্ষপুরীর অন্ধকারের মধ্যে নন্দিনী এক ঝিলিক আচমকা আলো। তাকে দেখে সর্দারেরা হতবুদ্ধি হয়। অধ্যাপক তাকে তত্ত্বকথা শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনকে মিলিয়ে দেখলে একটা পূর্ণচিত্র কল্পনা করা যায়। নন্দিনী ভাবজগতের অনুপ্রাণক, আর রঞ্জন কর্মজগতের সংগঠক। তাই নন্দিনী সব সময় রঞ্জনের আগমনের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে থাকে। অবশ্য রঞ্জন সম্পর্কে যা কিছু জানা যায় সবই নন্দিনীর মুখ থেকে। রঞ্জন খোদাইকরদের বিদ্রোহের নায়ক। তাই নন্দিনী যক্ষপুরীতে গ্রহণীয় হলেও রঞ্জন নয়। নন্দিনী রঞ্জনের সঙ্গে যাতে মিলিত হতে না পারে তার জন্য সর্দার মোড়লকে নির্দেশ দেয়। শেষকালে অবশ্য নন্দিনী অনেকটা রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। বিশুকে যখন গ্রেফতার করল তখন বকুল, চন্দ্রা নন্দিনীকে দায়ী করেছিল। নন্দিনী সে অভিযোগ অস্বীকার করেনি। ফাগুলালকে বলেছিল, "নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।" নন্দিনীকে আমরা শেষ দেখি রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কারিগরদের নিয়ে সর্দারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে এগিয়ে যেতে।

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের নাট্য পরিচয়ে বলেছেন, এই নাটকটি সত্যমূলক হলেও এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেনি। তবে কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য। এই সত্য কবির বিশ্বাস এবং চেতনার ফল। নন্দিনী যতটা কবির কল্পনা ততটা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। তবে নন্দিনী যখন সর্দারকে বলে, "ওই সব ছায়াদের

মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা তেমন শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল তমাল আষাঢ়চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। ....ঐ-যে দেখি শকলু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা.......ওকি, কঙ্কু যে! ....বড়ো লাজুক ছিল; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে।" এই নন্দিনী ঈশানীপাড়ার নন্দিনী। যক্ষপুরীর নির্মম পেষণে তার গ্রামের মানুষগুলি যেন মাড়াই করা আখের মত ছিবড়ে হয়ে গেছে। এই নন্দিনীকে আমাদের বড় কাছের মানুষ মনে হয়। অন্যের দুঃখে তার চোখে জল আসে। প্রাতকারের জন্য ছটফট করে। এই যক্ষপুরীর খোদাইকর ফাগুলাল, বিশু, কিশোর প্রভৃতি সকলের সঙ্গে তার সহৃদয় সম্পর্ক। তবু সে যখন তত্ত্বকথা বলে তখন সে একটা আইডিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

এই নাটকের যথার্থ রক্তমাংসের মানবী যক্ষপুরীর শ্রমিক ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা। সে নিরক্ষরা এবং গ্রামের মেয়ে। উদার আকাশের তলায় প্রকৃতির কোলে একদিন তার নিজের ঘর ছিল, সংসার ছিল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবই ছিল। তার এখনও মন পড়ে আছে গ্রামের দিকে। ফাগুলাল এবং বিশুকে সে বার বার বলেছে, "চল আমরা পালিয়ে যাই।" কিন্তু বিশুর কথায়, সে রাস্তা বন্ধ। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। চন্দ্রা অবশ্য বলে, "বিশু ভাই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছো। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয়নি।" কিন্তু বিশু বলে, "সোনার নেশা এমন নেশা দেশে গিয়েও আর তারা টিকতে পারবে না। এই যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে হা বন্ধ হয়ে যায়।" ধনবাদী সভ্যতা মানুষকে অর্থের লোভে গ্রাম থেকে কারখানার দিকে টেনে আনে। এখানে যত কষ্টই থাক, নগদ অর্থের এমন আকর্ষণ যে, তাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। একবার এ কারখানায় ঢুকলে মানুষের জীবন থেকে আকাশখানা হারিয়ে যায়। নন্দিনীকে চন্দ্রার মনে হয় মায়াবিনী। সে তার রূপ নিয়ে সকলের সর্বনাশ করে বেড়ায়। নন্দিনীকে সে বিশ্বাস করে না। তার স্বামী যক্ষপুরীর একজন খোদাইকর। আর সে নিজেও এখানকার মহিলা-শ্রমিক। শ্রমিকরা এই যক্ষপুরীতে বারো ঘন্টার ওপর আরও চার ঘন্টা খেটে মরে। তাদের কাজের সহায়ক একমাত্র মদ। জীবন ধারনের জন্যই এরা একদিন গ্রাম ছেড়ে শহরের কারখানায় শ্রমিক হয়ে যোগ দিয়েছিল তাদের জীবনে যত দুঃখ-

যন্ত্রণাই থাকুক তারা আর এই প্রেতপুরী ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না।

এই ছাড়া আছে বিশু পাগলার স্ত্রীর কথা ও সর্দারনিদের জীবনযাত্রার কথা। বিশু একদিন স্ত্রীর কথায়—তাকে সুখী করবার জন্য, তার স্বর্ণতৃষ্ণা মেটাবার জন্য যক্ষপুরীতে চরের কাজে বহাল হয়। বিশু তার কাজে উন্নতি লাভ করে যখন আরও অর্থ উপার্জন করে তখনও তার স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণা মেটে না। তার স্বর্ণপিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। কিন্তু বিশু বিদ্রোহী শ্রমিক ফাগুলালের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর এবং নন্দিনীকে দেখার পরে চরের কাজে ইস্তফা দিয়ে পাগলের মত গান গেয়ে বেড়ায়। ততদিনে তার স্ত্রী বিশুকে ত্যাগ করে চলে গেছে। যক্ষপুরীর সর্দারনিদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের কোঠাবাড়ি আছে। তাদের জীবনযাত্রা আড়ম্বরপূর্ণ, বৈভবপূর্ণ। তারা যেমন বিলাসী তেমনি আয়াসী। তাসাদি খেলে তাদের অবসর বিনোদন হয়। বিশুর স্ত্রীও তাদের তাসখেলায় সঙ্গ দিত।

পূর্বে আলোচিত 'মুক্তধারা' (১৯২২) এবং বর্তমানে আলোচ্য 'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকের ব্যবধান মাত্র দু-বছর। ততদিনে অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। তিনি দেখেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার যান্ত্রিকতার প্রচণ্ড অগ্রগতি। ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে যা আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলেও পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধং দেহি মনোভাবের কোনোও পরিবর্তন ঘটেনি। আসলে শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতির ফলে বাজারের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই বাজারের জন্যে পৃথিবীর নানা দেশে বিশেষ করে অনুন্নত দেশের উপর তাদের আধিপত্য প্রয়োজন। ফলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। প্রতিযোগিতা জন্ম দেয় স্বার্থপরতা, ভ্রষ্টাচার, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অমানবিক প্রবৃত্তির। 'রক্তকরবী'তে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কালজয়ী রূপক নাটক। এই নাটকের মধ্যে আমরা যে সমাজকে প্রত্যক্ষ করি তা হল এক যান্ত্রিক সমাজ, তার নাম যক্ষপুরী। মাটির তলার গহ্বর থেকে তাল তাল সোনা তুলে এনে যক্ষপুরীর রাজা যিনি সেই শিল্পের প্রধান তার আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। এই কাজে তিনি নিয়োগ করেন অনেক সর্দার, অধ্যাপক, পুরোহিত, গোঁসাইজি, কোতোয়াল, জল্লাদ, মুদ্দফরাস, পালোয়ান, মোড়ল প্রভৃতি মানুষকে। এরা

সকলেই যক্ষপুরীর রাজার প্রতিনিধি এবং শোষণের সহায়ক। তারা সকলেই নিজ নিজ পদে খোদাইকর নামে শ্রমিক শ্রেণিকে এই খননকার্যে নিযুক্ত করে। অপরিসীম দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় গ্রামবাসীরা একদিন ভিটেমাটি হারিয়ে এসে মালিকের ধনোৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এই নাটকের মধ্যে শিল্পযুগের যান্ত্রিকতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার আভাস আমরা পেয়েছি 'মুক্তধারা' নাটকে। তবে যক্ষপুরীর মধ্যে সেই চিত্র একদিকে যেমন অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্ট অন্যদিকে তেমনই রহস্যময় ও জটিল। এই যক্ষপুরীর শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে যে বীভৎসতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নিকট হতে। তিনি মুম্বাইয়ের এক শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঐ নগ্নতার পরে নানা প্রতীকী এবং রূপকের আবরণ দিয়ে রচনা করেছেন তাঁর 'রক্তকরবী' নাটক। এর মধ্যে আমরা আধুনিক যুগের শ্রমিক শোষণের একটা নগ্নচিত্রই প্রত্যক্ষ করি—যা আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ধনবাদী শোষণেরই এক মর্মন্তুদ চিত্র। অবশ্য এই শোষণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা আছে। 'রক্তকরবী' রচনার আগে মুম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, জামসেদপুর ও অসম প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি শ্রমিক-ধর্মঘট হয়েছে তার প্রভাব পরোক্ষভাবে এই নাটকে পড়ে থাকতে পারে। মুম্বাই-এর সূতাকলগুলির দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। মালিক পক্ষ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নিরস্ত্র শ্রমিকদের হত্যা করে। আট ঘন্টার বেশি তখন শ্রমিকদের খাটতে হত। যক্ষপুরীতে বারো ঘন্টার পরেও চার ঘন্টা খাটুনির কথা আছে। ১৯২০ সালে জামসেদপুরে ত্রিশ হাজার শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। ১৯২০ সালে মুম্বাই শহরে প্রথম শ্রমিকের সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে আসামের চা বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘটের সামিল হয়। তার ঢেউ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে, চাঁদপুরে ছড়িয়ে পড়ে। শান্তিনিকেতন থেকে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ চাঁদপুরে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং 'রক্তকরবী'র পশ্চাতে ওইসব শ্রমিক ধর্মঘট নিশ্চয়ই পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

'রক্তকরবী'তে আমরা আধুনিক সমাজব্যবস্থারই পরিচয় পাই। এই সময় নারীও শ্রমিক হিসাবে নানা কলকারখানায় নিয়োজিত। তাছাড়া এই যুগে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে। গান বাজনায়ও দক্ষ হয়েছে। সাধারণত এযুগের মেয়েরা অলংকারপ্রিয় এবং ঘরসংসার নিয়ে থাকতে

ভালবাসে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দরুণ একদিন অপরিসীম দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে রেহাই পেতে ভিটেমাটি হারিয়ে গ্রামের চাষিরা যক্ষপুরীতে এসে মালিকের ধনোৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। স্বামীদের সাথে মহিলারাও এখানে শ্রমিক। কিন্তু যক্ষপুরীর নারীদের সকলের অবস্থান এক রকম নয়।

যক্ষপুরীর সর্দারনিরা বহাল তবিয়তে আছে। সোনার তালের আর মদের নেশায় তারা বেঁহুশ। নেশায় তারা স্বামীদেরও ছাড়িয়ে যায়। এরা কোঠাবাড়িতে থাকে। জাঁক-জমক, আড়ম্বরপূর্ণ এদের জীবনযাত্রা। মহাধুমধামের সঙ্গে যক্ষপুরীর ধ্বজা পূজায় তারা অংশ গ্রহণ করে। অবসর বিনোদনের জন্য তারা তাসাদি খেলে। যতদিন বিশু চরের কাজে বহাল ছিল সর্দারনিদের কোঠাবাড়িতে তাস খেলতে বিশুর স্ত্রীর ডাক পড়ত। তারপর বিশু ফাগুলালের দলে যোগ দিলে ও-পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে সে বিশুকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। তখন থেকে মনের দুঃখে বিশু গান গেয়ে বেড়ায়। যক্ষপুরীর সবাই তাকে বলে বিশুপাগলা।

কিন্তু শ্রমিক নারীরা নিপীড়িতের দলে। এই শ্রমিকদের মধ্যে আছে চন্দ্রার মত সরল বিশ্বাসী মেয়ে। নবান্নের উৎসবে দেশে যাওয়ার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়। স্বামীকে সে দুদিনের ছুটি নিতে বলে। কিন্তু চন্দ্রা জানে না, বুঝতে পারে না কেন এখানে ছুটি পাওয়া যাবে না। বিশুর কথায়, এই যক্ষপুরীতে প্রবেশের দ্বার আছে কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ। যক্ষপুরীর একঘেয়ে অমানুষিক পরিশ্রম আর স্বামীর মদের নেশা চন্দ্রাকে অস্থির করে তোলে। স্বামীকে নিয়ে সে শৃঙ্খলিত বদ্ধ-পরিবেশের ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। চন্দ্রা ফিরে যেতে চায় ফেলে আসা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, স্বাধীন, সুন্দর গ্রাম্যজীবনের মধ্যে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের অনাবিলতায়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চাপে তারা গৃহহারা থেকে আজ সর্বহারাতে পরিণত হয়েছে। তবু চন্দ্রারা চিরকাল মুক্তি পেতে চায়, ঘর চায়। তাই চন্দ্রা বার বার স্বামীকে বলে, "কাজ ছেড়ে দাও না, চল না ঘরে ফিরে।" কিন্তু ফাগুলালের এ-জীবন থেকে মুক্তি নেই। এদের অবকাশ কোথায়? ধানের গায়ে তুষের মত এরা যেন ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো। ফাঁক তো কিছু নেই।

যক্ষপুরীর বন্দি খোদাইকরদের জীবনে নন্দিনী নামে আছে আর এক গ্রাম্যনারী। তার বাড়ি ছিল ঈশানপাড়ায়। কিন্তু এখানে সে এক অদ্ভুত মানবীরূপে উপস্থিত। রক্তমাংসের মানবী হয়েও শোষিত বঞ্চিত শ্রমিকদের জীবনে সে এক প্রাণভরা খুশির খনি। সে নিয়ে এসেছে আশা, উদ্দীপনা, মুক্তি ও আনন্দের

বাণী। শ্রমিক শ্রেণির জীবনে এক আশ্বাসবাণী নিয়ে এসেছে নন্দিনী। বিশু তার স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণা মেটাতে, তাকে খুশি করতে যক্ষপুরীতে এসেছে। গুপ্তচরের কাজ নিয়েছে। কিন্তু বিশুর স্ত্রীর কামনার শেষ নেই। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো তা বাড়তেই থাকে। বিশুর স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে এল যখন বিশু আর তাকে ধরে রাখতে পারল না। সে তার জীবনবৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে ছিটকে পড়ল। শেষটায় যক্ষপুরীর ধনবাদী সভ্যতার নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে নারীরা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। নন্দিনী এই নাটকে অন্যান্যদের মতন শ্রমিক নয়। সে রঞ্জনের সহকর্মী এবং বিপ্লব-পথের সহযাত্রী। সে কাউকে ভয় করে না। রঞ্জনের মতো সে এক বৈপ্লবিক শক্তি। রঞ্জনের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাহায্যের জন্য সে এখানে এসেছে। নন্দিনীর উপস্থিতিতে তাই যক্ষপুরীর শ্রমিকরা বন্ধন ছিন্ন করে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল হয়েছে। সে কোনোও বাঁধন মানে না। প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় এবং অন্যের প্রাণে আনন্দের হিল্লোল তোলে। এমন কী যক্ষপুরীর রাজাও শেষ পর্যন্ত তার আকর্ষণে যক্ষপুরীর জাল ছিঁড়ে আনন্দের মিছিলে মানুষের মাঝে এসে মিলিত হয়েছে। বাস্তবজীবনে এমন নন্দিনীর অভাব থাকলেও আমাদের কল্পনার জগতে তার একান্ত প্রয়োজন। নন্দিনী আমাদের প্রাণের আনন্দ, কল্পনার আকাশ। নন্দিনী শোষণ-মুক্তির প্রধান ভরসা।

বাংলানাটকে নন্দিনীচরিত্র এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমাদের সমাজে বিক্ষিপ্তভাবে স্বাদেশিক আন্দোলনে কিংবা কলকারখানার শ্রমিক আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। কিন্তু এই নাটকে নন্দিনী একেবারে বিপ্লবের বার্তাবহ। সে সব ভেঙেচুরে নতুনের জয়ধ্বনি করে চলে। এমন কী রাজার জালকে ভেঙে ফেলে সে রাজাকেও ফসল কাটার উৎসবে এনে জড়ো করে। (পৌষ তাদের ডাক দিয়েছে,.......... চলে আয় রে আয়,......)। তার এই ভূমিকার কথা পড়তে পড়তে স্বাভাবিক ভাবেই গোর্কির মা চরিত্রের কথা মনে পড়ে। তবে গোর্কির মা অনেক বস্তুনিষ্ঠ বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণির তত্ত্বে বিশ্বাসী। রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিশারি। কিন্তু নন্দিনী আমাদের ভাব জগতের ফোয়ারা। রঙিন আকাশের সিঁদুরের ফোঁটা। নন্দিনী কাব্যের জগতেই মানানসই। তবু নন্দিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা নারীর এক বিশেষ অগ্রগতিকে অনুভব করি—যা তখনও প্রাত্যহিক সমাজজীবনে অনুপস্থিত। আমাদের সমাজ একদিকে যন্ত্রসভ্যতার ফলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রায় সম-অগ্রসরমান। অন্যদিকে মধ্যযুগীয় সব সংস্কার, আচার, বিচার নিয়ে নারী তখনও

'সতী' হয়ে আছে, মানুষ হয়ে ওঠেনি। নন্দিনী তাই এখনও আমাদের আবেগ, আমাদের ভরসা। রক্তমাংসের শিক্ষিত মনে সে কিছুটা নাড়া দিয়ে যায়।

চন্দ্রা তার স্বামীর সঙ্গে যক্ষপুরীতে ধনবাদী সমাজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের এমন অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে যে, তারা গৃহহারা, সর্বহারা। চন্দ্রাচরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক নারীসুলভ বিশেষ করে ভারতীয় রক্ষণশীলতার সংস্কার বর্তমান থাকায় সে নন্দিনীর মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারেনি। সহজ ও সারল্যের জন্য সে কারও ত্রুটি ধরতে সক্ষম হয় না। যক্ষপুরীতে এসে পুরুষদের জীবনধারা বিপথে গেলেও চন্দ্রার কথায়,— তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবুও এই বদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও চন্দ্রা তার নারীসুলভ সংস্কারকে আশ্রয় করে আছে। কিন্তু যক্ষপুরীর বদ্ধ পরিবেশের ক্লেদাক্ত জীবন থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। নতুন ফসল কাটা, নবান্নের, পৌষের আমন্ত্রণে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলেও সে নিরুপায়, বন্দিনীর জীবনই তার পরিণতি।

এখানকার সর্দারনিদের জীবনযাত্রা শ্রমিক নারীদের থেকে পৃথক। তারা আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন ও আরামদায়ক জীবনযাপন করে। তবুও এরা পুরুষের অধীন। নন্দিনীর মতন স্বাবলম্বী ও বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারেনি। এদের মধ্যে বিশুর স্ত্রী ব্যতিক্রমী চরিত্র। তার স্বর্ণতৃষ্ণা বিশু মেটাতে অক্ষম বলে সে তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। তারা ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে যে যার মতো আছে। সমষ্টি নিয়ে এদের ভাববার অবকাশ নেই। কিন্তু নন্দিনী যক্ষপুরীর শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্রে বন্দিনিদের দীক্ষিত করতে চায়। যক্ষপুরীর বন্দিনিদের মুক্ত করতেই তার এখানে আসা।

বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন-যন্ত্রের ওপর ধনিক শ্রেণির মালিকানায় অবিচার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। মালিক শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটক প্রায় সমকালীন হলেও দুই নাটকের পরিবেশ ভিন্ন। 'মুক্তধারায়' সামন্তপ্রথা স্বৈরচারিতার বিরুদ্ধে প্রজাগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিকারের প্রয়াসের কথা আছে। এই নাটকে নারীর ভূমিকা গৌণ হলেও নারী তার সন্তান-বাৎসল্যের দাবিতে মানবতার কাছে প্রশ্ন রেখেছে। নারী এখানে মূলত মা। কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে যুগের পরিবর্তনে যান্ত্রিক-সভ্যতার অগ্রগতির কথা আছে। এখানে নারী একদিকে শোষিত শ্রমিকের সঙ্গিনী, ঘরনি

এবং সহযোদ্ধাও বটে। আবার সর্দারদের স্ত্রীর মতো তারা বিলাস, বৈভবে অভ্যস্ত। এর মধ্যে নন্দিনী এক ব্যতিক্রমী নারী। সে তার স্বাভাবিক প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি দিয়েই সকলকে জয় করতে চায়। আমরা নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কথা জানি। নন্দিনী কতটা লেখাপড়া করেছে আমরা জানি না। কিন্তু নন্দিনী বিদুষী নারী। সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডির উর্ধ্বে উঠে সে সকলের কাছে শান্তি ও প্রেমের বাণী, বিপ্লবের বার্তা প্রচার করে। নারী এখানে পুরুষের সমধর্মী শুধু নয়, সে সুন্দরের ক্ষেত্রে, মৈত্রীর ক্ষেত্রে প্রেরণাদাত্রী। নন্দিনী যথার্থই এক আধুনিকা নারী। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সমাজ প্রগতিতে সে পিছিয়ে পড়া মানুষ নয়। বরং অগ্রগামী মানুষের সে বার্তাবহ্।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নারীকে কল্পনার আসনে বসিয়ে কেবল মানবমুক্তির ভবিষ্যতই দেখাননি, ভবিষ্যৎ মানব সমাজের এক আনন্দোজ্জ্বল ছবি চিত্রিত করেছেন—আর তার অগ্রপথিক যে নারী সেটাও আমাদের অনুভবের সীমার মধ্যে এনে দিয়েছেন। 'রক্তকরবী' বাংলা নাটকের এক ব্যতিক্রমী নাটক। আধুনিক যুগের আধুনিকতম নাটক।

কালের যাত্রা

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে শোষিত মানুষের বন্ধন মুক্তির কথা বলেছেন 'কালের যাত্রা' নাটকে সেই কথা আরও স্পষ্টরূপ লাভ করেছে।
'কালের যাত্রা' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি'র সংস্কারকৃত রূপ। এই নাটক 'পল্লী-সমাজ', 'পথের দাবি' প্রভৃতির রচয়িতা শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। মানবসমাজে গ্রন্থি মোচন করতে করতে যুগ-সংকটের ভিতর দিয়ে মহাকাল নিজেকে ব্যক্ত করবে, সম্প্রসারিত করবে এবং সম্পূর্ণ করবে। এই নাটকও একটি রূপক নাটক। এই নাটক উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "রথযাত্রার উৎসবে নর-নারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে মানব-সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই সম্বন্ধই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" (বিচিত্রা, ১৩৩৯ কার্তিক পৃ. ৪৯২)।
যে শরৎচন্দ্র সমাজের অনেক সংস্কারকে আঘাত করেছেন, নতুন সামাজিক বোধ সঞ্চার করতে সাহায্য করেছেন, এই নাটক শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়ে সেই সামাজিক বোধকেই কবি আরও স্পষ্ট করে তুললেন।
এই নাটকেও নারীচরিত্র আছে। তবে তারা কোনো বিশেষ নামে পরিচিত নয়। নাটকটি আরম্ভই হয়েছে রথযাত্রার মেলায় সমাগত মেয়েদের নিয়ে; এরা প্রচলিত সংস্কারে আবদ্ধ। প্রতিবারের মতো এবারেও ভোরবেলায় কঙ্কালিতলার দীঘিতে ডুব দিয়ে রথটানা দেখতে এসেছে। কিন্তু এসে দেখে রথের দেখা নেই। চারদিক থম্‌থমে। রাস্তার ধারে লোকেরা জটলা করছে। পুরুতঠাকুর বিড়বিড় করছে, মহাকালের পাণ্ডা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। অথচ এই রথযাত্রা দেশের লোকের কাছে প্রথম শুভযাত্রা। "রথ না চললে কিছুই চলবে না। চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান। এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি। তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানিনে।" এই সংস্কারেই মেয়েরা বিশ্বাস করে। নাগরিক তাদের মেয়েমানুষ বলেই জানে। কালের

রথযাত্রায় তাদের কোনোও হাত নেই। তাদের বলে, "কুটনো কাটো গে ঘরে।" দ্বিতীয়া নারী অবশ্য বলে, নারীরা না থাকলে পুরুতের পেট এত মোটা হত না। তারা রথের দড়িকে নারায়ণ বলে পুজো করে। কারণ এই দড়িপ্রভুই তাদের কাছে প্রত্যক্ষ। এই নারীরা জানে শুধু প্রচলিত নিয়ম। চিরদিনই নিচুরা মাথা হেঁট ক'রে উঁচুর মান রক্ষা করে। সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তারা দড়ি, রাস্তা, গর্ত সকলকেই প্রভুজ্ঞানে পুজো করে। কিন্তু তবু রথ চলে না। তারা পারে কেবল মাথা কুটতে।

তারা এই ভক্তির মধ্য দিয়ে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের পুজো, ভক্তি—সব মিথ্যে। কারণ শেষকালে ম্লেচ্ছর ছোঁয়ায়, শূদ্রের টানে রথ চলেছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেয়েছে তাদের পুজো পড়ে আছে ধুলোয়। আসলে এতকাল যারা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ঠাকুরের বা প্রভুর অবস্থান যেখানে দেখেছে সেখানে প্রকৃত ঠাকুর নেই। কবির কাছ থেকে তারা জানতে পারল একদিন আসবে উল্টোরথের পালা। যারা এতদিন মরে ছিল তারা বেঁচে উঠবে। সেই বেঁচে ওঠার বার্তাই রথের রশির মূল কথা।

এখানে নারীর সংস্কার মুক্তির কথা আছে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা এক গভীর সত্য লাভ করেছে। সেই জন্যই এখানে কোনো বিশেষ নারীর পরিচয় নয়, নির্বিশেষেই তাদের উপলব্ধি।

'রথের রশি'র রচনাকাল ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসেছেন। সেই সময় বিশ্ব জুড়ে সাংঘাতিক অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান দৃষ্টিকটু আকার ধারণ করেছে। অপর দিকে রাশিয়ায় দেখলেন ব্যাপক পরিবর্তন। সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে ভীষণ দরিদ্র থাকলেও মানুষে মানুষে অর্থের বৈষম্য, অধিকারের বৈষম্য বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে সমগ্র জাতি একটা নতুন দুনিয়া সৃষ্টির উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এই নতুন অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ ভীষণ খুশি। সেই জন্য তিনি লিখেছিলেন, রাশিয়ায় না এলে তাঁর তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর দেখলেন এখানকার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন বিক্ষুব্ধ। একদিকে বিদেশি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার আন্দোলন; অন্যদিকে লবণ-সত্যাগ্রহের পরে ধর্ম-বৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়ে থাকবে রাশিয়া ছাড়া সর্বত্রই মানুষে মানুষে সম্বন্ধ ক্রমশ অসত্য হয়ে উঠেছে; গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জট পাকিয়ে গেছে। চিন্তায় নতুনত্ব নেই। মানুষে মানুষে আছে বিচ্ছিন্নতা, নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতা। রথযাত্রাকে

অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন সত্যের বাণী প্রচার করলেন। সে সত্য হল—যারা এতকাল নিচে ছিল সেই অপমানিত, অবজ্ঞাত, উৎপীড়িতের মধ্যেই আছে উত্তরকালের সম্ভাবনা। তাদের শক্তিতেই মহাকালের রথ চলবে।

এই নাটকে ঘটনা সামান্য। এখানে তিনটি নারীচরিত্র। তারা প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। এরা নামহীনা। গাঁয়ের ঘরের বধূ। রথ তাদের কাছে একটি সংস্কার। তারা বিশ্বাস করে যে, রথ অচল হলে তাদের সংসার ভাঙবে, স্বামী-পুত্রের অকল্যাণ হবে। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে একযোগে অচল রথকে সচল করবার কাজে অংশ নেবার অধিকার তাদের নেই। তবু এরা কিছু করতে চায়। পুরুষশাসিত সমাজ তাদের দুর্বল করে রেখেছে। কিন্তু অচল রথ সচল না হলে তাদের অকল্যাণ হবে। এই আশঙ্কায় তারা পথে নাবে, এবং রথ, রশি ও গর্তের পুজো করে। রথকে সচল করতে তারা সকলে দড়ি-নারায়ণ প্রভুর কাছে মানত করে—দ্বিতীয়া বলে, "এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে, মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।" তৃতীয়া—"একমাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি। .....তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি.........।" সংস্কারাচ্ছন্ন এই সব নারীদের মাথা কুটতে দেখা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ তাদের সেখানে আবদ্ধ রাখেননি। শূদ্রের টানে রথ চলার মধ্যে তারা সংস্কার মুক্ত হল, নতুন সত্য লাভ করল। নারীর সংস্কার মুক্তি এই নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

'কালের যাত্রা' নাটকে আমরা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থারই পরিচয় পাই। দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে এই নারীও শ্রমিক হিসাবে নানা কলকারখানায় নিয়োজিত। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গান্ধীজির নীতি হিসাবে ঘরে ঘরে চরকা কাটা এবং মদের পিকেটিং-এ নারীও অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই যুগে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে মেয়েরা যেমন লেখাপড়া শিখেছে তেমনই নাচ, গান, অভিনয় সংগীত ও সাহিত্য চর্চা প্রভৃতিতে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানে বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে 'নারী বিভাগ'ও খোলা হয়। সেখান থেকে প্রতিমা দেবী, হেমলতা সেন, মীরা দেবী প্রমুখ বিশিষ্ট নারীদের পরিচয় জানা যায়। ভারতবন্ধু পীয়ার্সন্ নির্মিত 'দ্বারিক', মীরাদেবী নির্মিত 'নেবুকুঞ্জ' ও 'নতুন বাড়ি' মিলে নারী বিভাগ খোলা হয়। শ্রীনিকেতনে খোলা হয় হস্তশিল্প কেন্দ্র। আশ্রমের বালিকাদের সংঘবদ্ধভাবে সেবা ও সর্ববিধ কাজে ব্রতী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এভাবে মেয়েরা সমাজ সেবা করতেও প্রবৃত্ত হয়। স্বদেশি

আন্দোলনে এই সময় কোনো কোনো মেয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেও অগ্রসর হয়। আবার অন্তঃপুরের মধ্যে থেকেও বাসন্তীদেবীর মতো অনেকেই স্বদেশিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তারা ব্রিটিশ সরকারের দমননীতিরও শিকার হয়েছিলেন।

অতএব এই যুগের নারীসমাজ অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। দেশকাল পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। চিন্তা, চেতনায় বিকাশ লাভ করেছে। তবে সাধারণভাবে নারী তখনও সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। পুরুষশাসিত সমাজে তারা 'সতী' হয়ে বিরাজ করছে। আলোচ্য নাটকে আমরা দেখি সংকারযুক্ত হলেও নারীরা রথের মেলায় গিয়ে যোগ দিয়েছে। উৎসবে, অনুষ্ঠানে তারা গৃহবন্দী হয়। তবে দেব-দেবীর উপরেই তাদের প্রচণ্ড ভক্তি এবং বিশ্বাস। নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী পুজো, পার্বণ, মানত, তুক-তাকের উপর তারা আস্থা রাখে। পুরুষসমাজ নারীর স্বাধীন মতামতের বিশেষ মূল্য দেয় না। নাগরিকের কথায়, —গৃহের মধ্যেই তাদের প্রকৃত অবস্থান। তবে তাদের মধ্যেও নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চেতনা দেখা দিয়েছে। পুরাতন সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাস দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

বাঁশরি

'বাঁশরি' একটি নগরাশ্রয়ী সামাজিক নাটক। নাটক হিসাবে এটি খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও এই নাটকে রবীন্দ্র-মানসের একটা সুস্পষ্ট আলোকপাত লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস থেকেই প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রেখা টানবার চেষ্টা করেছেন। প্রেম দেহ সম্পর্কে নিরপেক্ষ। সেজন্য 'শেষের কবিতা'-য় অমিত-লাবণ্যের বিবাহ হল না। বাস্তবতার নিরিখে যা-ই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'-য় এবং 'বাঁশরি' নাটকে এক নতুন পরীক্ষা বা সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। নিঃস্বার্থ প্রেম দেবতা বা মহামানবে সম্ভব হলেও হতে পারে, জৈব জগতে তার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। প্রেমের সার্থকতা যে ত্যাগে এ-কথা অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু দাম্পত্যজীবনে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থাপনা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কতটা গ্রহণীয় সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে 'শেষের কবিতা'র মতো ভাষায় ও বাচনভঙ্গিতে 'বাঁশরি' অত্যন্ত উজ্জ্বল।

এই নাটকের বিষয়বস্তু, খুবই সামান্য। নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ এই নাটকের বিষয়বস্তু। 'বাঁশরি' নাটকের বাঁশরি প্রধান চরিত্র হলেও এই নাটকে সুষমা এবং পুরন্দরের মধ্যে প্রেম; কিন্তু পুরন্দরের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সোমশংকেরর সঙ্গে তার বিয়ে হল। এখানে প্রেম ও যৌন সম্বন্ধ সম্পর্কে এক অভিনব প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ জীবনদর্শন। বাঁশরি সোমশংকরকে ভালোবাসলেও তার সঙ্গে সোমশংকরের বিবাহ হয়নি। "দেহ আত্মার পৃথক অস্তিত্ব, সমাজ বন্ধনগত ব্যবহারিক দিক, এই দুই দিকের পৃথক অস্তিত্ব এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত।" (দ্র. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ড়. নীহাররঞ্জন রায়)।

এই নাটকে কয়েকটি নারী চরিত্র আছে কিন্তু বাঁশরি এবং সুষমাই প্রধান। এ ছাড়াও আছে দুই সখী—অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা; এবং লীলা, অর্চনা, শৈলবালা এবং সুষমার বিধবা মা বিভাসিনী ও বোন সুষীমা।

শ্রীমতী বাঁশরি সরকার বিলিতি য়ুনিভারসিটিতে পাশ করা মেয়ে। তার চেহারার মধ্যে আছে ইস্পাতের চাকচিক্য। কথাবার্তায়, বুদ্ধিতে বিদ্যুতের মতো ঔজ্জ্বল্য। এদের পরিবেশ বিলিতি-বাঙালিমহল। এদের পাড়াও ফ্যাশানেবল। সব কিছুর মধ্যে আছে একটা উৎকট আধুনিকতা। বাঁশরি সরকারকে আমরা প্রথম দেখি সুষমা সেনদের বাগানে। সেখানে সুষমার সঙ্গে সোমশংকরের এনগেজমেন্ট উপলক্ষে জমজমাট পার্টি। এই পার্টিতে হবে ব্রাহ্মসমাজের মতে সোমশংকরের সঙ্গে সুষমার আঙটি বদল। সোমশংকরকে বাঁশরি ভালোবাসলেও এবং তাদের মধ্যে প্রেমের অনেকটা

অগ্রগতি ঘটলেও সুষমার একদা শিক্ষক এবং প্রেমিক পুরন্দর সন্ন্যাসী সুষমার সঙ্গে সোমশংকরের এই বিবাহের আয়োজন করেছেন। বাঁশরির প্রথম বয়সে এক রাজপুত্র সোমশংকরের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের সখ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু উন্নত ললাট, দাঁড়ি-গোপ কামানো সুডোল মাথা, ছোট করে ছাঁটা চুল, খালি পা, তসরের ধুতি পরা, খয়েরি রঙের ঢিলে জামা, উজ্জ্বল চরিত্রের সন্ন্যাসী পুরন্দরের পরামর্শে এবং চেষ্টায় তারই প্রেমের পাত্রী সুষমাকে সোমশংকরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। বাঁশরি ধনী পরিবারের মেয়ে। শিক্ষা, দীক্ষায়, আচার, আচরণে তারা যথার্থ অভিজাত। স্বাভাবিক নারীর মতই বাঁশরি সোমশংকর সুষমার এই বিবাহকে প্রথমে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু পরে সোমশংকর বাঁশরিকে বলেছিল, সে এক কঠিন ব্রত নিয়েছে। সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়। প্রাণ দিয়েও তাকে তা সম্পন্ন করতেই হবে। সে আরও বলেছে, যে দুর্গম পথে সুষমার সঙ্গে পুরন্দর সন্ন্যাসী তাকে সে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ। তবে সে বাঁশরিকে পূর্বের মতোই ভালোবাসে। বাঁশরী এই নতুন প্রত্যয়ে বিশ্বস্ত হয়ে দুঃখের মধ্যেও সব স্বীকার করে নিয়েছিল।

এই নাটকে সুষমার, যাকে কেন্দ্র করে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তারও চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। গায়ের রং কনকগৌর ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক যেন কুঁদে তোলা। দেখা মাত্র বিস্ময় লাগে। বাঁশরি, সুষমার পরিচয় নিবিড়। এরা সকলে একই সমাজের মানুষ। এদের বিদ্যে এবং বুদ্ধি সবই প্রখর। সুষমা পুরন্দরের একমাত্র ছাত্রী, তবে সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষপর্যন্ত তলিয়ে গেছে। সেই জন্যেই পুরন্দরের কথায় সোমশংকরকে সুষমা বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়। পুরন্দর সুষমাকে বলেন, "যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির-গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের-গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে—ধিক তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার।" ধনবান সোমশংকরের সঙ্গে তার মিলন। পুরন্দর বলেন, "তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।" সুষমা স্বীকার করে পুরন্দরের পথই তার পথ। তাই পুরন্দরের আদেশ সে মাথা পেতে নেয়।

বিভাসিনী সুষমার মা। স্বল্প জল বৈশাখী নদীর স্রোতপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যে-রকম দৃশ্য হয় সেরকম চেহারা। এই নাটকে তিনি সুষমার গার্জেন হলেও তাঁর কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই।

অবশ্য এই নাটকে অন্য কোনোও নারীরই কোনো বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। এরা সকলেই এদের আত্মীয়া-বন্ধু-অতিথি। সুষমার বোন সুষীমা মাত্র এগারো বছরের

মেয়ে। লীলা সুষমার পিসতুতো বোন। সাহিত্যে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা-তামাশায়, তীক্ষ্ণ, সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস। এরা সকলেই শিক্ষিতা, অভিজাত পরিবারের নারী।

যে সমাজ ও শ্রেণি এই নাটকের আশ্রয় সেই সমাজ রবীন্দ্রনাথের কল্পিত হলেও এরা আধুনিক যুগের উঁচুতলার এক শিক্ষিতশ্রেণি। সন্ন্যাসী পুরন্দরও সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নন। তাঁর ব্রত, আদর্শ অস্পষ্ট। কিসের জোরে সুষমা ও সোমশংকরকে এক অনুরাগবিহীন প্রয়োজনসর্বস্ব মিলনে তিনি বাঁধতে পারলেন তার কোনোও স্পষ্ট পরিচয় এই নাটকে নেই। পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশি এবং এত বেশি রহস্যময় যে, বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এই চরিত্র আমাদের কল্পনার রাজ্যে সীমিত হয়ে থাকে। এরা আসলে রবীন্দ্রনাথের একটা তত্ত্ব বা প্রত্যয়ের বাহন মাত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের কোনোও মিল নেই।

তবে নারীর অবস্থান হিসাবে আমরা দেখতে পাই এই নাটকের নারীচরিত্র প্রায় সকলেই বিদুষী। কারও কারও বিলিতি ডিগ্রিও আছে। আমরা বুঝতে পারি আধুনিক শিক্ষিত এবং অভিজাত সমাজে নারীরা কত অগ্রসর হয়েছে। আমরা পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের নানা অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। এখানেও সুষমা ও সোমশংকরের মধ্যে যে এনগেজমেন্টের কথা আছে, তা ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুযায়ী। আধুনিক শিক্ষিত নারীও হিন্দু সমাজের প্রচলিত অনেক রীতি-নীতির বাইরে নিজেদের স্বমতে কাজ করে। এখানকার সমাজ অনেক মুক্ত। একেই প্রকৃত আধুনিকতা বলে। নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি অনুযায়ী যা কিছু যুক্তিবহ তাই এদের কাছে গ্রাহ্য। কিন্তু এদের মধ্য দিয়ে সমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। এরা আলোর ঔজ্জ্বল্যের দিক। কিন্তু আলোর নিচেও অনেক অন্ধকার আছে। তার পরিচয় এই নাটকে পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'বাঁশরি' নাটকে যে আধুনিক বিলিতি শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় আছে তা ঠাকুর পরিবারেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'On The Edges Of Time' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তৎকালে একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সভাপতি। তখন ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা নিজেদের একটি সমাজ গড়ে তুলেছিল। এরা নিজেদের রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের থেকে পৃথক মনে করত। এরা থাকত মূলত বালিগঞ্জে। এরা টেনিস খেলত। খেলার শেষে ডিনার পার্টি হত (The afternoon would start with tennis and tea and end with supper) এরা বিলিতি কায়দায় অভ্যস্ত হলেও জাতীয়তা বিরোধী ছিল না। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন এই বুদ্ধিজীবিদের সমর্থনেই গড়ে উঠেছিল। 'বাঁশরি' নাটকে আমরা এই সমাজের পরিচয়ই লাভ করি।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা নাটক

নবান্ন (১৯৪৪)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আধুনিক যুগের পরিচয় লাভ করেছি। আমরা দেখেছি নাগরিক জীবনে নারীর অবস্থানের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। নারী আর 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' যুগে আবদ্ধ নেই। শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাদেশিক আন্দোলনে নারী পুরুষের সঙ্গে প্রায় সমস্থান লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা যে নাটকের কথা আলোচনা করছি সেটাও আধুনিক যুগের। তবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে। 'বাঁশরি' নাটক রচিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে; আর 'নবান্ন' নাটক রচিত হয়েছে ১৯৪৪-এ। 'বাঁশরি' নাটকের রচনাকালেও বিশ্বব্যাপী চলেছিল এক বিরাট অর্থনৈতিক মন্দা। সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদ তখন অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ৩০-৩২ সালের ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়। গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানও তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তার পূর্বেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়ে সেখানে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুম্বাই-এর শোলাপুরের শ্রমিকরা কিছুদিন শহর দখল করে রেখেছে। সীমান্তের পেশোয়ারে গাড়োয়াল রাইফেলস-এর হিন্দু সিপাহিরা নিরস্ত্র মুসলিম জনতার উপর গুলি চালাবার হুকুম অমান্য করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 'গান্ধীর-আরউইন' চুক্তি, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। গান্ধীজির রাজনীতি ছেড়ে হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন। (দ্র. সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ডঃ সরোজমোহন মিত্র)।

অন্যদিকে বিশ্বমঞ্চে চরম অর্থনৈতিক সংকটের আবর্ত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ফ্যাসিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠল। জাপান, জার্মান, ইতালির যোগসাজসে পৃথিবীর বুকে নেমে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানির রাস্তায় রাস্তায় চলল নানা গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব, দীর্ঘদিনের সভ্যতার অবদান ভস্ম হয়ে গেল। তীব্র হয়ে উঠল উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা।

জাপান আক্রমণ করল চীনের মূল ভূখণ্ড, ইতালি আফ্রিকার একটি দেশ জয় করে নিল। ১৯৩৮ সালে হিটলার হঠাৎ অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে দিল। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করল ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। পোলাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। হিটলারের তখন অপ্রতিহত গতি। একের পর এক দেশ পদানত হতে লাগল। বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল পূর্বে-পশ্চিমে সর্বত্র। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের জার্মান, ফ্যাসিস্ত ইতালি এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে বিশ্ব-প্রভুত্বের এক চুক্তি হল। অবশেষে হিটলার চুক্তি ভঙ্গ করে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করল। যুদ্ধের এক নতুন পর্যায় আরম্ভ হল। কারণ রাশিয়া ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ। হিটলারের জার্মানি চেয়েছিল সোভিয়েতের সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িত শোষিত মানুষের সামনে যে একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল সেই আদর্শকে বিনষ্ট করে দিতে। সেজন্য স্তালিন এই যুদ্ধ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "এই যুদ্ধ হল জার্মান ফ্যাসিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ-জনগণের মহান যুদ্ধ।"

ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের আওতা থেকে বাদ ছিল না। তখন আমাদের দেশের শাসক ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অর্থই ভারতবর্ষকে জড়িত করা। তাছাড়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপান এ-যুদ্ধে শত্রু পক্ষে যোগ দেওয়ায় আমাদের নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হল। ১৯৪১ থেকে জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ লাখে লাখে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানি বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ, ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারির গাড়ি ও বুটের শব্দ। ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছেড়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানি ফ্যাসিস্ত বাহিনীর কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের প্রচেষ্টায় গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ৪২ সালে ইংরেজের ভারত ছাড়ার প্রস্তাব গ্রহণ, কংগ্রেসের মরণপণ সংগ্রাম, মেদিনীপুরের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও ভয়াবহ বন্যা, ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'গণনাট্য সংঘের' প্রতিষ্ঠা হয় এবং ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই

পরিপ্রেক্ষিতেই বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয় তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রাণান্তিক চেষ্টায় প্রচণ্ড হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পবিত্র এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানের জন্য তখন ভারতের লক্ষকোটি প্রাণ কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুষ্ট ছায়ায় এক নতুন শক্তির জন্ম হল, তারা পাইকার, মহাজন, আর কালোবাজারি ও মজুতদার। এদের সকলের মিলিত চক্রান্তে গ্রাম বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। এই সব সমাজদ্রোহী নরপিশাচরা শ্মশান-উল্লাসে বাংলার বুকে ডেকে আনল এক সর্বনাশা বিপর্যয়। মাঠের রাজা কৃষককে তারা ভূমিহীন নিরন্ন ভিক্ষুকে পরিণত করল। কুৎসিত শাসন এবং নিরঙ্কুশ শোষণে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে পড়ল। সারাদেশব্যাপী মহামন্বন্তরের করাল কালোছায়া বিভীষিকার সৃষ্টি করল। বিরামহীন ভুখা মিছিল, শ্মশানের হাহাকার তুলে শহরের অলি-গলি, রাজপথ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল। প্রাণের অপচয়ের সে নিষ্করুণ ইতিবৃত্তান্ত সমগ্র জাতির জীবনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়। অন্যদিকে তেমনি চলেছে স্বাধীনতার জন্যে, মুক্তির জন্যে জনগণের এক মৃত্যুহীন লড়াই।

জাতীয় জীবনের এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে তৎকালীন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিল তারই এক উজ্জ্বল ফসল এই 'নবান্ন' নাটকা। এই নাটকের অভিনয়ে কোনোও পেশাদারি খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন না। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মানুষরাই পেশাদার মঞ্চের কোনোও কলা-কৌশল না দেখিয়ে নিরন্ন মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে মুখর করে তুলেছিলেন।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত আমিনপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে এই নাটকে তৎকালীন জীবনের একটা দলিল উপস্থিত করা হয়েছে। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে তখনকার দগ্‌দগে ক্ষত মুখগুলোকে, মন্বন্তরের বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে তুলে ধরাই কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। নাটকখানিতে এক একটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য, এক একটি ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছে—যা মনে ঘা মারে; এবং তৎকালীন অভিজ্ঞতার ভয়াবহ বাস্তবতাকেই তুলে ধরে।

'নবান্ন' নাটকের আমিনপুর আসলে মেদিনীপুর। সাইক্লোন এবং আগস্ট বিপ্লবের পটভূমিকায় মন্বন্তরের মর্মন্তুদ কাহিনী এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু।

সমকালীন ইতিহাসের তথ্যপঞ্জির সঙ্গে এর প্রামাণ্য ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু 'নবান্ন' নাটকের গুরুত্ব এবং অভিনবত্বই উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বা নাগরিক মানসিকতা প্রাধান্য লাভ করেনি; প্রাধান্য লাভ করেছে গ্রামজীবনের ভয়াবহ চিত্র এবং গণজাগরণ। 'প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘ' বা 'গণনাট্য সংঘ' এবং নাট্যকার এবং নাটকের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা বাংলা নাটককে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে, সমাজে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারা ঘোষণা করলেন—নাটক শুধু বিনোদনের জন্য নয়, নাটকের মধ্য দিয়ে গণচেতনা সৃষ্টিই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা ও সাফল্য বাংলা নাটককে এক বিরাট ব্যাপকতা দান করেছে। নাটকের শিল্পীরাও ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দক্ষ কর্মী এবং নেতা। আমরা এই নাটকে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনে নারীর অবস্থানকেও লক্ষ করতে পারি। সমাজে যখন ভাঙন আসে তখন সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের উপরেই তার প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর আমাদের স্থিতিশীল জীবনে প্রচন্ড বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে তাদের কী দুর্দশা হয়েছিল আমরা তার মধ্য দিয়ে সামাজিক অবস্থানেরও যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল তা লক্ষ করতে পারি।

'নবান্ন' নাটকে অনেকগুলি নারী চরিত্র আছে। যেহেতু এই নাটক একটি পরিবার-কেন্দ্রিক সেইজন্য পরিবারের নারীরাই এই নাটকের মুখ্যচরিত্র। এদের সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসেছে অন্যান্য নারীচরিত্র। আমিনপুরের বৃদ্ধ চাষি প্রধান সমাদ্দারের পারিবারিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে তৎকালীন দেশের এবং সমাজের দুরবস্থাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননী, প্রধান সমাদ্দারের ভাইপো কুঞ্জ সমাদ্দারের স্ত্রী রাধিকা এবং কুঞ্জর সহোদর নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনী এই কাহিনীর উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র।

৪২-এর আন্দোলনের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তের পটভূমিতে এই নাটকের শুরু। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজার রাখার জন্য সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যরা গ্রামে বাড়ির পর বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। সেই আগুনের আভায় যে ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল তারা হল প্রধান এবং কুঞ্জ। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে আমরা দেখি বিনোদিনী ত্রস্ত পায়ে এসে জিজ্ঞেস করল—সে এখন কোথায় যায়? পঞ্চাননীর

কথায় তখনকার অবস্থা জানা যায়, "মেয়ে মানুষের শরম-ইজ্জৎ আর রইল না।" মেয়েমানুষ তখন লজ্জা-শরম খুইয়ে প্রহরের পর প্রহর বন-জঙ্গলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। ব্রিটিশ পুলিশ এবং সৈন্যদের অত্যাচারে তারা নিজের ঘরের মধ্যে বাস করতে পারছে না। পঞ্চাননী পুরুষদের ধিক্কার দিয়ে বলছে, তারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ করতে পারছে না। পঞ্চাননী বলেছে, "আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীলির কষ্ট আমরা সহ্য করতি পারি। সে কোনো কথা না।" কিন্তু দেশের মেয়ে মানুষের অঙ্গের ভূষণ ইজ্জৎ, সেইটেই এখন রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছে। এই ব্যাপারে পঞ্চাননী অত্যন্ত সোচ্চার। সে নিজে জনতাকে পরিচালনা করছে। জনতার সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম! আর পঞ্চাননী তাদের বলছে,—তোরা এগিয়ে যা, তোরা এগিয়ে যা। পুরুষদের বলছে,—তোরা সব আমিনপুরের কলঙ্ক! জনতার নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পঞ্চাননী ব্রিটিশ সৈন্যের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এই ভাবেই তার মৃত্যু হয়।

পঞ্চাননীর পরেই এই পরিবারের প্রধান নারীচরিত্র রাধিকা। আমরা তাকে যখন দেখি তখন গ্রামের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। রাধিকা পুরানো একটা মেটেকলসি ঘর থেকে বের করে এনে বলে, এর মধ্যে যে কয়টা ধান ছিল সেটাই পরিবারের শেষ সম্বল। সেও সংসারের উপর তিক্ত-বিরক্ত। দেশে তখন চারিদিকে ভীষণ দুর্দিন। যুদ্ধের নাম করে সব নৌকো সরকার আটকে দিয়েছে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঘরে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করে দিয়েছে। সংসারে দারুণ অশান্তি। ডুমুর, কাঁচাকলা সিদ্ধ আর কচুর নতির ঝোল—এই সব খেয়ে আর দিন চলে না। মহামড়ক দেখা দিয়েছে। গ্রামে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। রাধিকাও অসুস্থ। অনেকে ঘর ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে দূরের শহরে পাড়ি দিয়েছে। রাধিকা শয্যাগত। জমি জায়গা বিক্রি করেও বাঁচার উপায় নেই। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে রাধিকার একমাত্র ছেলে মাখন মারা গেল। এত সয়েও তারা গ্রামে আর থাকতে পারেনি। শহরে এসে তারা ভিক্ষে করে খেতে আরম্ভ করল। ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাবার সংগ্রহ করতে হত। সে এক দারুণ করুণ অবস্থা। সংসারের যুবক নিরঞ্জন আগেই সংসার ছেড়ে বাইরে চলে গেল। তার স্ত্রী বিনোদিনী সকলের সঙ্গে শহরে এসে পড়লেও একদিন কালোবাজারি কালীধন ও হারু দত্তের খপ্পরে পড়ে এক আশ্রমবাসী হয়। এই আশ্রম আসলে একটি নারী ব্যবসায়ের কেন্দ্র। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের সময় নানা রকমের ব্যবসা গজিয়ে উঠেছিল। ঘটনাচক্রে নিরঞ্জনও কালীধনের চালের

আড়তেই কাজ পেয়েছিল এবং একদিন নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটল। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, বন্যা প্রভৃতির কারণে দেশের যখন চরম দূরবস্থা তখন এই ব্যবসায়ী কালোবাজারিরা এবং তাদের দালালরা সাত রকম ব্যবসা করে। পেটের দায়ে যারা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের টাকার জোরে বেইজ্জৎ করে নিজেদের মতলব হাসিল করেছিল। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ভিখারিনির কথায় তখনকার অবস্থার কথা জানা যায়। সে বলেছিল, "কি বে-আক্কেল কান্ড! মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা-বেটিরে ফেলে গেলি।" অতএব এখানে আমরা যে সব নারীচরিত্র পাই তারা সবাই তৎকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের শিকার। কিন্তু নাট্যকার শুধু বিপর্যয়ের বর্ণনা করেননি, তিনি লিখেছেন, "সে বছর ফসল ভালো হওয়ায় দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের পরে সবাই আবার গ্রামে ফিরে এসেছিল। নিরঞ্জন, বিনোদিনী এই ঘরে ফেরা মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে নবান্ন উৎসব করেছিল। তখনকার দুর্দিনের কথা ফকিরের গানে স্পষ্টই জানা যায়।

"কালান্ত আকালে এমন কত চাষী ভাই।
আকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু-বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।
নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে লজ্জা ঢাকে।।"

যারা গ্রামে ফিরে এসেছে তাদের সকলকে নিয়েই নবান্ন উৎসব। সকলের মিলিত উৎসাহে নবান্ন উৎসব হয়েছে। আবার নারী-পুরুষ সকলের মিলিত উদ্যোগে নতুন করে একটা জীবন গড়ার স্বপ্নে নাটকের শেষ হয়েছে।

এই নাটকে আমরা এক দুর্যোগের মুখে নারী-পুরুষের মিলিত অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করি। পঞ্চাননী মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামকে নায়িকার মতো নেতৃত্ব দিয়েছে। বিনোদিনী নারীব্যবসায়ীদের আশ্রমে বসবাস করলেও তা নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি। অর্থাৎ আধুনিক যুগে বিশেষ করে যখন দেশ, সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে নারীও পুরুষের সঙ্গে সমান দুঃখ ভোগ করেছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানি ফ্যাসিস্ত বাহিনীর

কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয়, ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের মরণপণ সংগ্রামের ব্যর্থতা, মেদিনীপুরের সাইক্লোন ও ভয়াবহ বন্যা এবং ৪২-এর প্রবল আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামন্বন্তর, ভারতের পূর্বাঞ্চলে জাপ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সাহায্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দিল্লি দখলের অসম্ভব চেষ্টা প্রভৃতি এদেশের সব মানুষের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল নবান্ন নাটকে তার সম্পূর্ণ চিত্র না থাকলেও অনেক ঘটনার আভাস আছে। সেদিক থেকে এ নাটককে তৎকালীন যুগের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়।

বাঁশরি নাটকে আমরা উচ্চবিত্ত নারী সমাজের অবস্থান লক্ষ করেছি। আর নবান্ন নাটকে আছে গ্রামীণ কৃষক জীবনের চিত্র ও চরিত্র। সমাজজীবনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে নারীর অবস্থানেরও। নারীরা সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর এই গুরুত্বের কথা সর্বত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই নাটকেও আমরা দেখতে পাই সমাজে নারীর অবস্থানের সঙ্কট অন্য প্রকারে তীব্রতর হয়েছে। সেখানে সামাজিক আচারবিচার অপেক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর এবং অন্যদিকে জাপানি বোমার অতর্কিত আক্রমণ সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে যুক্ত হল মেদিনীপুরের বন্যা এবং ৪২-এর প্রতিরোধী আন্দোলন। এই সময় সমাজের অর্থনীতিতে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। ঐ বিপর্যয় গ্রাম বাংলায় বিশেষ করে অনুভূত হয়। নারীর অবস্থানেরও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। এই নাটকের পঞ্চাননীচরিত্রে মেদিনীপুরের আগস্ট বিপ্লবের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। মাতঙ্গিনীর মতোই পঞ্চাননী সংগ্রামভূমিতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়। মৃত্যুর আগে সন্ত্রস্ত জনতাকে সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে যায়। তবে দুজনের মধ্যে তফাৎ এই যে মাতঙ্গিনীর ছিল স্বাধীনতার লড়াই আর পঞ্চাননীর ছিল ইজ্জৎ রক্ষার লড়াই। নারীসমাজে যে নির্ভীকতা, নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস আমাদের সমাজকে শত-সহস্র আঘাত-সংঘাতের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছে নাট্যকার তারই স্বীকৃতি দিয়েছেন পঞ্চাননীচরিত্রে।

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। গ্রামের পাইকার, জোতদার আর শহরের মজুতদার এই তিনের মিলনে যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারির

ব্যবসা ফুলে উঠেছে—সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে চাল পাচারের সঙ্গে চলে মেয়ে পাচার। সেবাশ্রমের নামে সেখানে হারু দত্তের সহায়তায় মুনাফাবাজ কালীধন নারীদেহের ব্যবসা চালায়। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'-র পুঁটি ও 'নীলদর্পণ'-এর পদী ময়রানি চরিত্রদ্বয়ের মতো এই নাটকে মেয়ে পাচারের সহায়িকা হিসাবে খুকীর মা কুট্টিনী চরিত্রটি পাই। এখানে হারু দত্তের গুণগ্রাহী খুকীর মার তোষামুদে কথাবার্তায় উক্ত কাজটির বীভৎসতা আরও ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া বাংলার চাষি পরিবারের ভিত্তিমূল উপড়ে ফেলে দিয়ে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাকে উলঙ্গ করে শহরের রাস্তায় বের করে দিয়েছে। এখানে নারীর অবস্থান 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের নারীদের অবস্থান অতিক্রম করে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে দেখা যায়, ঘরের লক্ষ্মীকে মন্বন্তরের রূঢ় বাস্তবতায় কলকাতার রাস্তায় ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে একসঙ্গে খাবার খেতে। চিরায়ত সামাজিক রীতি-নীতিকে ত্যাগ করে পেটের জ্বালায় নারীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু শত দুঃখেও নারীর সহজাত মায়া-মমতা, প্রেম-ভালবাসা নির্মূল হয়নি—সে চিত্র পাই কুকুরের কামড়ে আহত রক্তাপ্লুত কুঞ্জের আর্ত-চিৎকারে বিচলিত স্ত্রী রাধিকার ব্যথাতুর চিত্তে শুশ্রূষার একাগ্রতার মধ্যে। নাটকের শেষে দেখা যায়, ছিন্নমূল গ্রামবাসী নারীর প্রেরণায় বাঁচার স্বপ্নে গ্রামে ফিরে এসেছে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের চাপে যে সমাজ ভেঙে গিয়েছিল নারীই সেই সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলল; ক্ষুধার্তকে অন্ন দিয়ে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জোগাল। নাটকে পুরুষদের ভাঙাস্বপ্নকে জোড়া দিতে নারীরাই তৎপর হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে আমরা একদিকে যেমন পরিবর্তিত নারীর অবস্থানের বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করি তেমনই অন্যদিকে আমরা নারীচরিত্রের যুগোপযোগী সমাজ, অগ্রগতি, সচেতনতা লক্ষ করি।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক

বাস্তুভিটা (১৯৪৭)

'নবান্ন' নাটকের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। অবশ্য তার সূচনা হয়েছিল 'আগুন', 'জবানবন্দী' একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়ে। এই নাটকে আমরা দেখতে পেয়েছি গ্রামের মানুষের জীবনের বিপর্যয় তাদের সামাজিক জীবনে ভাঙনের এক নগ্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকে প্রতিরোধের চিত্র আছে। আছে নতুন করে গ্রাম্যসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে। ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একের পর এক উত্তাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৪৩-এ ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পরে ১৯৪৪-এ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ' ফৌজের ভারতভূমিতে প্রবেশ। ১৯৪৫-এর ১৬ আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণ, ভারতের নৌ-সেনানীর বিদ্রোহ, ১৯৪৫-৪৬ মুক্তিসংগ্রামের শেষ আঘাত—ছাত্রবিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট (১৯৪৪-৪৬) ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার শুরু, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী ভারতীয়দের হাতে অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতাদের কাছে দেশ ভাগ করে ক্ষমতা অর্পণ—এইসব ঘটনা দ্রুততালে ঘটে গেছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যেই বাংলা নাটকের একটা নতুন যুগ শুরু হয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে হলেও রক্তপাতহীন হয়নি। তার আগে এবং পরে কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের দেশের এতকাল লালিত-পোষিত সব মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে অন্নহীন আশ্রয়হীন অবস্থায় দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিল। শুরু হল এক নতুন জীবন, নতুন সমস্যা। তার নাম উদ্বাস্তু সমস্যা, উদ্বাস্তু জীবন। ১৯০৫ সালেও বঙ্গ বিভাগ হয়েছিল কিন্তু তখন কোনো উদ্বাস্তু সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দুই বাংলার শাসন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে এলো দুই সম্প্রদায়ের হাতে। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের হাতে। কারণ আসলে ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ ভাগ হয়েছিল। ফলে জাতীয়তা বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তীব্র হল। এই বিদ্বেষের বলি হল উদ্বাস্তুরা।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠল যেখানে ধর্মের নামে জাতিগত বিভেদের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি সেখানে এক দেশে দুই ধর্মের লোক পারস্পরিক বিশ্বাস নিয়ে বাস করবে কীভাবে? ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিময় ঘটেছিল। অবশ্য সেখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বলি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে। পূর্বাঞ্চলের লোক বিনিময় না হলেও বিরাট সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ ঘটেছিল। লিওনার্ড মসলি তাঁর "The Last Days of the British Raj" গ্রন্থে লিখেছেন, "In the nine months between August 47 and the spring of the following year between fourteen and sixteen millions Hindus Shiks and Muslims were forced to leave their homes and flee to safety from blood crazed mobs." (page - 279)"।

বিপুল সংখ্যক মানুষ অকস্মাৎ বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসার ফলে নিজেরা যেমন কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন তেমনি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জীবনেও তারা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। বাড়িঘর, জোত-জমি ফেলে দিয়ে কিংবা জলের দামে বেচে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে তারা এদেশে এসেছে। কিন্তু তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার পরিবর্তে একদল হাঙ্গর-কুমির তাদের সব রকমে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেছে, জমির দাম বাড়িয়ে, ঋণের টাকায় ভাগ বসিয়ে, পুনর্বাসনের টাকা লুঠ করে আগত উদ্বাস্তুদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। টিকে থাকার চেষ্টায় উদ্বাস্তুরা অবশ্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় বহু উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলেছে। কিন্তু তাদের সেই দিনের জীবনযাত্রা কী নির্মম এবং দুর্বিষহ ছিল তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে।

এই উদ্বাস্তুদের নিয়েই প্রখ্যাত নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বাস্তুভিটা' নাটক। অবশ্য আরও অনেকেই এই সমস্যা অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন প্রমুখ নাট্যকারদের নাম করা যায়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাস্তুভিটা' ছাড়াও 'তরঙ্গ', 'মশাল', 'নয়া শিবির' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। 'বাস্তুভিটা' নাটকেও পঞ্চাশের মন্বন্তরের উল্লেখ আছে। যা পড়তে পড়তে আমাদের 'নবান্নে'র কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মহেন্দ্র মাস্টার বলেছেন, "উঃ! সে দৃশ্য মনে হলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। তোমাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি আসবার যে রাস্তাটা, তার দুপাশে মানুষের কঙ্কাল জমে গেল। দিনে শেয়াল ডাকতো, শকুনি-গৃধিনির ডানার ঝাপটে হৃদকম্প উপস্থিত হতো। গেল.....কত লোক গেল......ঢাকী পাড়াটা প্রায় নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেল, জোলা পাড়া, জেলে পাড়ার আদ্ধেক লোক সাবাড়। এদিকে লোক না খেয়ে মরে......ওদিকে রামনগরের নীলাম্বর সার গদিতে হাজার হাজার বস্তা চাল পোকায় কাটে। ....আমাদের সোনা মোল্লাও তার সঙ্গে ছিল.......কৈ বাবা, আমরা নাকি স্বাধীন হলাম? কিন্তু চাল নিয়ে যারা, জুয়ো খেললো, লক্ষ লক্ষ লোককে যারা প্রাণে মারলো........তাদের তো কোন শাস্তি হলো না?''

এই নাটকের ঘটনাস্থল বর্তমান বাংলাদেশের একটি গ্রাম। বঙ্গবিভাগ হবার ফলে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা অত্যাচার ও আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছে। গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মহেন্দ্র মাস্টারের স্ত্রী মানদা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাবার জন্যে সে স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু মহেন্দ্র পণ্ডিত গ্রাম ছাড়তে রাজি নয়। তিনি গরিব; যাবেনই বা কোথায়? এদিকে তাঁর পরিবারে এস জুটল এক প্রতিবেশী—কলকাতার মানুষ শচীন। যুদ্ধের বাজারে টাকা করেছে। অর্থ ঢেলে দুর্নীতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে সে অভ্যস্ত। সে এসেছে বাড়ি বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে যেত। মহেন্দ্রর অনূঢ়া কন্যা কমলাকে সে খেলার সামগ্রী করে নিতে চায়। মানদাও শচীনকে অবলম্বন করে কলকাতা যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র মাস্টার বাস্তুত্যাগের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের গ্রামেও দাঙ্গাবাজরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কলকাতায় তাদের আত্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হওয়ায় তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গ্রামে লুঠপাট শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমীন মুন্সী, মুসলিম লিগ নেতা সোনামোল্লার উদ্যোগে হিন্দুদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। এবং মহেন্দ্র মাস্টার গ্রামে থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন।

'বাস্তুভিটা' নাটকের ভূমিকায় সে-যুগের বিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''হাজার হাজার বছর ধরিয়া হিন্দু মুসলমান শান্তভাবে প্রতিবেশীরূপে ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক বন্ধন যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল আমরা যেন তাহা ভুলিতে চাহিতেছি। অথচ সেকথা না ভোলার পথেই রহিয়াছে সহজ সমাধানের পথ। 'বাস্তুভিটা' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সে কথাই স্মরণ করাইতে চায়।''

'বাস্তুভিটা' নাটকে মাত্র দুটি নারীচরিত্র আছে। মানদা এবং কমলা। মানদা গ্রাম্য পাঠ্যশালার পণ্ডিত মহেন্দ্রর স্ত্রী এবং কমলা তারই কন্যা। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলার সাধারণ হিন্দুদের জীবনে যে অনিশ্চয়তা তাড়া করেছিল তারই শিকার মানদা। মানদা বাড়ির গৃহিণী। তার সবচেয়ে বড় চিন্তা বিবাহযোগ্যা কন্যা কমলাকে নিয়ে। মুসলমান অধ্যুষিত এক গ্রামে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই তার চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্র মাস্টার গ্রাম্য পাঠশালার আদর্শনিষ্ঠ

পণ্ডিত। তাঁর প্রধান চিন্তা ঐ পঠাশালকে কেন্দ্র করে। পাড়া-প্রতিবেশী হিন্দু - মুসলমান সকলের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রেখে চলেন। দারিদ্র্য পীড়িত এই মানুষটি বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে মানদার মাথায় সংসারের যত চিন্তা সবই।

নাটকের প্রথম সংলাপে মানদা বলে "চৌধুরীরা বাড়ীঘর বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মিত্তিরদের বাড়ীটাও নাকি বেচে দেবে।" এই সবই তার দুশ্চিন্তার কারণ। মানদা বলে, পাকিস্তান পেয়ে যেন ওরা আরও মাথায় চড়ে বসেছে। মেয়েটার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। দেশের এবং সংসারের দুশ্চিন্তা নিয়েই মানদার দিন কাটে। সে কমলাকে পুকুর-ঘাটে যেতেও বারণ করে। কারণ পাড়ার মুসলমান ছেলেরা পুকুর পাড়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এই অবস্থার মধ্যে মিত্তির-বাড়ির শচীন যখন তাদের বাড়ি বেচে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামে আসে তখন মানদা যেন একটা বড় অবলম্বন খুঁজে পায়। শচীন যে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত মতলবি ছেলে সেদিকে তার খেয়াল থাকে না। সে ভাবে শচীনের ভরসাতেই কমলার একটা গতি হবে, কলকাতা গিয়ে নিজেদের একটা ঠাঁই হবে। ওর কেবল মান ইজ্জতেরই সমস্যা।

মানদা এই নাটকের একজন টিপিক্যাল বঙ্গ-রমণী, যে কেবল নিজের ঘর-সংসার, নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিজেদের মান-ইজ্জত এই সব নিয়েই দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। সে তার স্বামী মহেন্দ্রকে কেবল বাড়ি ছেড়ে পালাবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মহেন্দ্র মাস্টার বলেন, গরিবের সর্বত্রই বিপদ। চৌদ্দপুরুষের ভিটা ছেড়ে যাওয়া কী কঠিন ব্যাপার তা মানদা জানলেও তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় না। বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতায়—যেখানে পাশের একটা গঞ্জ লুঠ হয়ে যায় সেখানে সে থাকে কী ভরসায়। আব্বাসের কাছে যতই মানদা স্পষ্ট করে বলে, "যে কষ্টে চলে যাচ্ছি, তোমায় তা কী করে বোঝাব আব্বাস। যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আমার বুকটা ভেঙে পড়ছে। দশ বছর বয়সে এ বাড়ী পা দিয়েছি.......তারপর বাপের বাড়ী গিয়েছি জীবনে দুবার কি তিনবার ....আর .....আর ....সারা জীবনটাই তো কাটলো আমার এখানেই। এ বাড়ীর প্রতিটি জিনিস আমার বুকের রক্ত। কর্তা কত সময় অভাবে পড়ে চেয়েছেন ফলের গাছগুলো বেচে দিতে.....কিন্তু আমি দি-ই-নি.....তাকে বেচতে দি-ই-নি....ওগুলো আমার সন্তান.....নিজের হাতে রোয়া গাছ....সে সবই রইল আব্বাস....শুধু একটা অনুরোধ করে যাবো, আমার শাশুড়ী যেখানে রয়েছেন সেই জায়গাটা যেন কেউ অপবিত্র না করে।" এখানে নিরাপত্তাহীনতাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মেয়েদের মানইজ্জৎ নিয়ে এই প্রতিকূল পরিবেশে তাদের টিকে থাকাই বড় সমস্যা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সব ব্যবস্থাই নারীদের পরিপন্থী।

কমলা মানদারই কন্যা। কিন্তু মানদার মতো সে অত ভীতু নয়। মানদা যখন তাকে

কেলেঙ্কারির কথা বলে তখনও সে ভয় পায় না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে যেন টিকে থাকবার ভরসা পায়। সে মাকে বলে বয়স বাড়া না বাড়া তো কারো ইচ্ছাধীন নয় আমার জন্য তোমার ভাবতে হবে না। সে মায়ের মতো অত ভয় পায় না। শচীনের সঙ্গেও সে অবলীলায় মেলামেশা করে। অবশ্য তার এখনও পরিণত বুদ্ধি হয়নি। শচীন কলকাতায় দাঙ্গার বীভৎস বর্ণনা দিচ্ছিল তখন কমলার যেন বিশ্বাস হয় না যে, মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে। এবং কলকাতার দাঙ্গায় বৃদ্ধ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যখন সজোরে দস্যুকে লাথি মারে তখন কমলা খুশি হয়ে ওঠে। বীভৎস দাঙ্গার বর্ণনায় কমলার ধারণা হয় কলকাতা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা। এই নাটকে কমলার যদিও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই তবুও একটি বালিকার যে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শচীনের সঙ্গে তার রোমান্টিক আচার ব্যবহারও বয়সোচিত বলে মনে হয়। পূর্ববঙ্গের এই বাড়ির পরিবেশ, পুকুরঘাট, সবকিছুর মধ্যেই কমলা বড় হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রতি তার আকর্ষণ অনেক বেশি। তারও ভিটে-মাটি ছেড়ে যেতে বড় মায়া। 'বাস্তুভিটা' দেশ ভাগের পরে দুই বাংলায় যে সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল তারই একটি বাস্তব দলিল। এই নাটকের মধ্যে আবেগের স্থান প্রধান। তবু তৎকালীন সাম্প্রদায়িক হানা-হানির যুগে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যে এক মিলনের সুন্দর আদর্শ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছিলেন সেটা সত্যই অভিনন্দিত হয়েছিল। বিশেষ করে যারা সাম্প্রদায়িক নন, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাংলার আদর্শে আস্থাবান তাদের কাছে এই নাটক খুবই কাম্য মনে হয়েছিল। যাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁদের কাছে অবশ্য এর বক্তব্য অভিনন্দিত হয়নি। সেইজন্য তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকার এই নাটক বাজেয়াপ্ত করেছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের কোনো প্রচেষ্টা বা ইঙ্গিতই তাদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধ এবং বিচার ভিন্ন রূপ। পূর্ববঙ্গের সমস্ত মুসলমান লিগ সরকারের মতো সাম্প্রদায়িক ছিল না। সে জন্যই অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার মানুষ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই লিগ সরকারকে পরাজিত করেছিল।

'বাস্তুভিটা' নাটকের প্রধান ভিত্তি মানবিকতার শুভবুদ্ধি। সাম্প্রতিক ঘটনার চাপে এই শুভবুদ্ধি কখনও কখনও পরাজিত বা বিভ্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তার জয় অনিবার্য। সেজন্য নাট্যকার কতকগুলো টাইপ চরিত্র অবলম্বনে সেদিনের উদ্বাস্তু ও বিভ্রান্ত মানুষের বাস্তব কাহিনী রচনা করতে বসেও গড্ডলিকায় নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। একটা ঐতিহ্যের আবেগকে বড় করে ভাঙা বাংলার এক আদর্শের কাহিনী রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে 'বাংলার মাটি' নাটকেও তুলসী লাহিড়ী এই আশার বাণী ফুটিয়ে তুলেছেন।

নতুন ইহুদী

'বাস্তুভিটা' নাটকে দেশ ভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হবার ফলে সেখানে সংখ্যালঘুদের জীবনে যে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার স্পষ্টচিত্র 'বাস্তুভিটা' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শুভবুদ্ধির উদ্রেকে হিন্দু শিক্ষক মহেন্দ্র মাস্টারের সপরিবারে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয়নি। কিন্তু সেখানেই সমস্যা সমাধান বা সীমিত থাকেনি।

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটকের মনমোহন ভট্টাচার্যের জীবনে 'বাস্তুভিটা'র মহেন্দ্র মাস্টারের মতোই সমস্যা দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ত্যাগ করে উদ্বাস্তুজীবনের মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হয়েছে। উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে রচিত নাটকের মধ্যে 'নতুন ইহুদী' উদ্বাস্তুজীবনের এক উল্লেখযোগ্য দলিল।

সলিল সেন আধুনিককালের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার। তাঁর জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্যিই মর্মম। সুস্থিত পরিবারের মধ্যে নিশ্চিত মনে তিনি বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন করেন। তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন নিবিড় ভাবে। মানুষের আশা ও স্বপ্ন, বেদনা ও কাতরতাকে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন।

তাঁর 'নতুন ইহুদী' সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অন্যতম ফসল।

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল নামে নতুন এক ইহুদি রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিরা বহু শত বৎসর উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে। তারা যখন যে দেশে থাকত সেই দেশ অনুসারেই তাদের পরিচয় ঘোষিত হত। যেমন জার্মান-ইহুদি, রাশিয়ান-ইহুদি, আরব-ইহুদি প্রভৃতি। স্বাধীনতার নামে ভারত বিভক্ত হওয়ায়, বিশেষ করে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের সামনে তেমনই এক গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা নিজ দেশ থেকে উৎখাত হয়। নিজের দেশ বলতে তাদের আর কিছুই রইল না। সৃষ্টি হল নতুন এক ইহুদি সম্প্রদায়। নাট্যকার তাই এদের বলেছেন 'নতুন ইহুদি'।

রাজনীতির উপরতলায় দেনাপাওনার দর কষাকষির ফলে কালির আঁচড়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার চুক্তিপত্রে তেমনই দেশের মাটিকে দুভাগ করে দেশের সংখ্যালঘু মানুষের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিয়ে ছিন্নমূল করে দিয়েছিল। ছিন্নমূল নরনারীরা বাধ্য হয়ে মাটির মায়া ত্যাগ করে

অনিশ্চিতের পথে গভীর আশঙ্কার মধ্যে জীবনকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই নির্মমতার কথাই আছে 'নতুন ইহুদি' নাটকে।
বাংলাদেশের পূর্বাংশ চিহ্নিত হল পূর্বপাকিস্তান নামে। সেখানকার এক মাধ্যমিক স্কুলের সংস্কৃত পন্ডিত মনমোহন ভট্টাচার্য। ধর্মের নামে দেশ ভাগ হওয়ায় সেখানে সংস্কৃত পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হতে তাঁকে দেশ ত্যাগর করতে হয়। স্ত্রী অন্নপূর্ণা, অনূঢ়া কন্যা পরী, আধপাগলা এক পুত্র দুইখ্যা এবং আর এক শিক্ষিত পুত্র মোহনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। ভেবেছিলেন এখানে সংস্কৃত পন্ডিতের কদর হবে এবং তিনি আবার চাকরি পাবেন। বাস্তু ত্যাগের আগে তিনি স্কুল থেকে দুমাসের বেতন এবং বাস্তুভিটা বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নতুন দেশে অজানা অচেনা পরিবেশের মধ্যে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র বিদেশি শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা যায়। মাধ্যমিক স্কুলে মনমোহনের এক সহকর্মী ছিলেন মৌলবী মীর্জা সাহেব। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তিনি বহু চেষ্টা করেও স্কুল থেকে মনমোহনের গ্রাচুইটির টাকা আদায় করতে পারেননি।
নাটকের এইটেই হল মনমোহন পরিবারের পূর্ব পরিচয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল তাঁদের উদ্বাস্তু জীবন। যে সামান্য অর্থসম্বল সংগ্রহ করে মনমোহন এদেশে এসেছিলেন এবং টিকে থাকার দুর্বার চেষ্টা করছিলেন, অর্ধাহারেও সেই টাকা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে গেল। উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে এদেশে যে কত ব্যবসা এবং বঞ্চনা শুরু হয়েছিল মনমোহন এবং তাঁর সঙ্গী প্রজা কেষ্টর অভিজ্ঞতা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বল শরীর নিয়ে প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করতে গিয়ে মনমোহন অসুস্থ হয়ে পড়েন। আত্মমর্যাদার জন্যে শহীদ পরিবার হিসাবে তিনি অর্থ সাহায্য কারও কাছে প্রার্থনা করলেন না। সংসারের অবস্থা যখন ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠল তখন তাঁর পুত্র দুইখ্যা চুরি করে টাকা আনল। অসৎ উপায়ে অর্জিত এই অর্থ মনমোহন ও তাঁর স্ত্রী গ্রহণ করেননি। দুইখ্যা এখানকার অসৎ সঙ্গে পড়ে চোরের দলে যোগ দিল। ধরা পড়ে প্রচন্ড মার খেল। এই সঙ্গ দোষের জন্যে একদিন তাঁর মৃত্যুও হল। টাকার অভাবে মনমোহনের আর এক পুত্র মোহনের পড়াশুনা বন্ধ হল। সে কুলিগিরি করে মহাজনের মাল রাস্তায় বিক্রি করে কোনোক্রমে সংসার চালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিনা লাইসেন্সে মাল বিক্রি করতে গিয়ে হাজতবাস করল। মনমোহন রান্নার বামুন ঠাকুরের সহকারী হিসাবে কাজ করেও শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। সংসারের অভাব মেটাতে গিয়ে বিবাহযোগ্যা পরীকেও দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হতে হল।

এমন করে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ছিন্নমূল পরিবারের ধ্বংসের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দুইখ্যা মারা গেলে, মনমোহনের মৃত্যু হল। তাঁর স্ত্রী না মরে বেঁচে থাকল। নিরূপায় মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় এবং চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছিল নাট্যকার এই নাটকে সেই নির্মম কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই নাটকে মোট তিনটি নারীচরিত্র আছে। পন্ডিত মনমোহনের স্ত্রী অন্নপূর্ণা, তাঁর অনূঢ়া কন্যা পরী এবং মনমোহনের গ্রামের নমঃশূদ্র চাষি কেষ্ট দাসের স্ত্রী আশালতা।

অন্নপূর্ণা মনমোহনের পরিবারের গৃহিণী। সংসাবের সব দিকেই তাঁকে লক্ষ রাখতে হয়। গ্রামে থাকতে তাঁকেই সংসার সামলাতে হত। বড় ছেলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে মৃত্যু বরণ করায় তিনি পরের ছেলে দুইখ্যাকে আর লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন না। দুইখ্যা খেয়ে-দেয়ে নিজের মতোই অন্যের সঙ্গে মারপিঠ করে বেঁচে ছিল। তাকে তার বোন পরীও বলে, 'ছাগল্যিয়্যা', 'বলদা'। এরকম ছেলেকে নিয়ে অন্নপূর্ণার সংসার। তাকে বকাঝকা করলেও দুর্বল সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন বেশি দুর্বলতা অন্নপূর্ণারও দুইখ্যার জন্যে সেই রকম দুশ্চিন্তা। তাকে সব দিক লক্ষ রাখতে হয়। মেয়ের বয়স বাড়ছে, সে কোথায় যায়, দেশ ভাগ হওয়ায় দেশ গাঁয়ের কী অবস্থা, কী করে তাঁর সংসার প্রতিপালিত হবে এই সব চিন্তায় তিনি অস্থির। মুখুজ্যে বাড়িটা যখন আজগর মিঞার কাছে বিক্রি হয়ে গেল তখন তাঁরই যেন সেই বাস্তুর জন্য বেশি কষ্ট। চাষি কেষ্ট গিন্নী যেন তাঁরই পরিবারের একজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও বাস্তুভিটা বিক্রি করে কলকাতায় মনমোহনের পরিবারের সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তুজীবন কাটাতে হয়। সেখানেও অন্নপূর্ণার একই পারিবারিক চিন্তা। অল্পবুদ্ধি দুইখ্যাকে সব সময় তিনি কেবল আগলে রাখতে চান। কিন্তু প্রচন্ড অভাব এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি মিথ্যাচার এবং অসৎপথে উপার্জনের ভীষণ বিরোধী। কেষ্ট এবং তার স্ত্রী সকলকে নিয়ে তাঁর সংসার। দুইখ্যা মিথ্যা কথা বলে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে দুধ নিয়ে আসে, চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করে, এ সবকিছুই তিনি ভীষণ অপচ্ছন্দ করেন।

অবশেযে মোহনরা কলকাতার এক বস্তি-ঘড় ভাড়া করে। সেখানেও নিয়মিত ভাড়া দিতে না পারায় তাদের বাড়িওয়ালির নানা কথা শুনতে হয়। আমরা সেখানে অবশ্য দেখি অন্নপূর্ণা ভীষণ প্রতিবাদী। ন্যায়অন্যায়বোধ তাঁর প্রচন্ড। অন্য ভাড়াটেরা মাসে আট টাকা করে ভাড়া দেয় আর তাঁদের কুড়ি টাকা এবং একশ টাকা সেলামি। বাড়িওয়ালির অন্যায় গালাগালি সহ্য করতে তিনি

নারাজ। প্রয়োজনে তিনি প্রতবাদ করতে পারেন। পরী যখন তাঁকে চুপ করতে বলল, তখন অন্নপূর্ণা বলেছিলেন,—"থাম্‌তো সোহাগী! কত মুরদ এক এক জনের, জানতে আর বাকী নাই। আমারে লুকাইয়্যা বাড়ী বেইচ্যা আইছে। আমি মুখ্যু মাইয়া মানুষ কিছু বুঝি না? কারোরে বুঝতে বাকী নাই আমার আর। বাড়ী-আলীরে দুপুরের সময় আইতে কইয়া কেউ বাসায় নাই। আমারে এই যন্ত্রণার মধ্যে ক্যান?" এর মধ্যেই আমরা অন্নপূর্ণার চরিত্র এবং তাঁর অবস্থান বুঝতে পারি। অন্নপূর্ণা একজন নিরক্ষরা মহিলা, সংসারের কাজে-কর্মে তাঁর পরামর্শ কেউ নেয় না। অথচ সব কিছুর জন্যই তাকেই ভুগতে হয় বেশি। তিনি ভুক্তভোগী। কেউ তাঁর কথা শোনে না। তাঁর সে যে কী যন্ত্রণা সেটা কাউকে বোঝানো যায় না। অথচ সকলকে নিয়েই তাঁর সংসার।

এই উদ্বাস্তুজীবন যে কী ভয়ঙ্কর তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্নপূর্ণা বলেন, "আকালের বছরও এত চিন্তা করি না। ভাত দুগা কম দিছি, কিন্তু উপাসও রাখি নাই, আধপেটাও খাওয়াই নাই। কলমী, ঢেঁকি, কচু, বেথাইগ, ফলটা পাকুড়টা এই গুলির তো অভাব কোনদিন হয় নাই। এই যে ঠুন্ডা কইরা আমারে চাইর দেয়ালের মধ্যে আট্‌কইছে—থাক হাত তুইলা,—তারা যদি কিছু আনতে না পারে তয় থাক উপাস।" এই যে কী অসহায় অবস্থা, নারী জীবনের কী বিড়ম্বনা একমাত্র অন্নপূর্ণারাই বুঝতে পারে। গ্রামে গঞ্জে থাকার সময় বাড়ি-ঘর, গরু-ছাগল, পাড়া-প্রতিবেশী, মানুষ-জনকে নিয়ে যে জীবন সেই জীবন আর নাই।

এই অসহায় জীবনেও তাঁর ছেলে দুইখ্যা যখন দলে পড়ে কিছু চুরি করে নিয়ে আসে তখন অন্নপূর্ণা আত্মগ্লানিতে অপরাধবোধ করেন। বলেন, "এ খুব অন্যায়, দলেবলে করলেও এইটা চুরি-ই। যা—দোষ যা করনের করছস্‌ যা ফিরৎ দিয়া আয়। এ খুব দোষের কথা কইলাম, এ খুব অন্যায়, খুব দোষের—"। তখনও অন্নপূর্ণা একটা মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তবে ঘটনাচক্রে বাঁচার তাগিদে তাঁকেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সংসারের জন্যই তিনি মিথ্যা কথা বলে চাল ধার করার চেষ্টা করেন। গ্রামে থাকতে ব্রাহ্মণ পন্ডিত বলে এটা সম্ভ্রমের জায়গা ছিল, ভদ্রলোক বলে একটা পরিচিতি ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তুজীবনে সব নষ্ট হয়ে গেল। শুধু বেঁচে থাকাই যাদের কাছে চরম সমস্যা তাদের কাছে আর এই সম্ভ্রমের কোনো মূল্য নেই।

অন্নপূর্ণা একদিকে মা, আর একদিকে গৃহিণী। তাঁর সব বিষয়েই দুশ্চিন্তা। হালুইকরের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মনমোহন পণ্ডিতের বাড়ি

ফিরতে রাত হল। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা। অন্নপূর্ণার আর সময় কাটে না। সংসারের বিপর্যয়ের জন্য তিনি কেবল নিজেকেই দোষী মনে করেন। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত সরল মহিলা। সবাইকেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। লম্পটের দালাল যতীনও যখন পরীকে হাত করার জন্য অন্নপূর্ণার সংসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন কিন্তু তিনি যতীনকে অবিশ্বাস করতে পারেন নি।

মোহনের বিপদে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতের সোনা বাঁধান নোয়া বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। কোন সধবা নারী প্রাণ থাকতে একাজ করতে চায় না। কিন্তু অন্নপূর্ণা বিপদের সময় এই সংস্কারকেও জয় করেছিলেন। এমনকি পরী যখন দায়ে পড়ে দেহ বিক্রির টাকা এনে দিল তখন সেই টাকাও অন্নপূর্ণাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। নানান দুর্গতির মধ্যেও অন্নপূর্ণা পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে সংযত রেখে আত্মক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্নপূর্ণার মধ্য দিয়ে আমরা এক গ্রাম্য জননী এবং পরে এক উদ্বাস্তু জননীর চিরমানসিক যন্ত্রণার পরিচয় পেয়েছি। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁকেও সব সংস্কার এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন সহ্য করে নিতে হয়। উদ্বাস্তু নারীর মধ্যে আমরা এক পৃথক নারীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

এই নাটকে পরীর ভূমিকা প্রথমে ছিল খুবই গৌণ। সে মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজকর্ম করে। ফাইফরমাস খাটে। বয়স হওয়ায় মা তাকে সব সময় আগলে আগলে রাখেন। উদ্বাস্তুজীবনেও সেই-ই একমাত্র মায়ের সঙ্গী। যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছিল উদ্বাস্তুজীবনে সে পরিবেশ নেই। এক ভিন্ন পরিবেশে এসে সে বসবাস করেছে। প্রথমে শেয়ালদা স্টেশনে, পরে বস্তিবাড়িতে। শেয়ালদার জীবনে অনেক সময় সে স্নান করার সুযোগও পায়নি। বস্তির জীবনেও এক ভিন্নতর পরিবেশ। তবু মা, বাবা, ভাইদের নিয়ে তার জীবন। এর মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু তার যৌবনের দিকে অনেকেরই লোভ ছিল। তাদের দালালি করে যতীন। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সাহায্যের নাম করে যতীন পরীদের সংসারে প্রথমে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে, পরে এই যতীনের মারফতেই তাদের সংসার এবং দাদাদের সাহায্য করার জন্যে শেষ পর্যন্ত দেহের বিনিময়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে টাকা রোজগার করল। মায়ের হাতের নোয়া বিক্রি করতে গিয়ে যতীনের খপ্পরে পড়ল। পরী তার দুরবস্থার কথা মোহনকে বলেছিল—“মায়ের মনে ধারণা, আমি একটা গলার কাঁটা ছাড়া কিছু না। বাবা মরতে বইসাও আমার চিন্তায় শান্তি পাইতেছে না। মেজদা বোকার মত আমার ভাল করণের লেইগা আইজ মরতে বইছে। পেটে ভাত নাই। পরণের কাপড়

ছিঁড়া—ভিক্ষা আর মিথ্যা ধার আইন্যা আমি পাড়ার লোকের কৃপার জীব। মাথার উপুর আমার শকুন ওড়ে। লেখাপড়া জানি না।......বুদ্ধি নাই যে বিপদ কাটাইয়া উঠি। ক্ষমতাও নাই যে সকলের দুর্ভাবনা দূর করি।" তাই তাদের সংসারের দুর্গতির অংশ গ্রহণ করতে শেষ চেষ্টা হিসেবে সে তার ঐ পথ বেছে নিয়েছিল। পরী সত্যিই বলেছিল, "স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, মায়া ভাতের হাঁড়ির ওজনের লগে লগে বাড়ে কমে।" পরী স্বাধীনতাউত্তর উদ্বাস্তু জীবনের এক নির্মম বলি। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই নারীমেধ নির্মম বাস্তব ঘটনা।

এই নাটকে আর একটি নারীচরিত্র আছে, সে হল কেষ্ট-গিন্নী। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের গ্রামজীবনে এই চাষি পরিবার ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের আশ্রিত ছিল। তাঁদের বাড়িতে কাজকর্ম করে, চিড়াকুটে বাইরের কাজকর্ম করে এবং তরি-তরকারি বেচে তাদের দিন চলত। তাদের কাছে ধর্মের অর্থ মূল্যহীন। তারা হিন্দুস্থান, পাকিস্তান বোঝে না। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর সব ভদ্র লোকেরাই যখন কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে তখন তাদের অবস্থা আরও নিঃসহায় হয়ে পড়ল।

কেষ্ট-গিন্নী বোঝে না, "পাকিস্তানে কি ডররে মশয়? তোমাগো তিন ঘরের মইধ্যে মুখুইজ্জ্যা বাড়ী তো চুপচাপ পিঠটান দেওনের মতলব। পালেগো পোলারা দুইজন ছাড়া বেবাকটিরে পাঠাইয়া দিছে। বাকী তোমরা গো! তোমরা যদি পেরজারে না দেখ, আর পেরজা কইতে নম ঘরের আমরাই তো এক আছি। মা-ঠাইন গরীবের দুঃখ কষ্ট সর্ব্বত্তর এক। যে চুলায়ই যাই, ভাতের কষ্ট আর এই জন্মে মিটবো নাগো।" কিন্তু শেষপর্যন্ত কেষ্ট তার গিন্নীকে নিয়ে পন্ডিতের সঙ্গেই কলকাতায় চলে এল। তার পরিবারেও কেষ্ট-গিন্নির মতামতের কোন মূল্য নেই। তাকে না জানিয়েই কেষ্ট বাড়ি-ঘর বিক্রি করে দিয়েছে। কলকাতায় এসে প্রথমে শিয়ালদা স্টেশনে পণ্ডিতদের সঙ্গে বাস করছিল। কিন্তু চাষি কেষ্ট জমি কিনতে গিয়ে এক ঠগের পাল্লায় পড়ে তার সর্বস্ব হারাল। তার জমানো ৩০০ টাকা ঠগবাজরা লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কেষ্ট-গিন্নি পরে আফ্‌শোস করে বলল, "তার বুদ্ধি কেষ্ট নেয় না।" কেষ্ট পালিয়ে গিয়ে জমি কিনতে চেয়েছিল কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে গেল। কেষ্ট-গিন্নি জানত তারা গরিব। তাদের ভাতের অভাব কখনও ঘুচবে না। কিন্তু নিজের বাড়ি-ঘরের আশাও এতে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। কেষ্ট টিটাগড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গিন্নির চাপে কুলিগিরি আরম্ভ করল। অবশ্য চাষি কেষ্ট প্রথমে কুলির কাজ করতে নারাজ ছিল। কিন্তু কেষ্ট-গিন্নি রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ায় সে বলে, "দাসত্ব করুম না—ইস কি পীর আইছেন, মাগনা জমি দেওনের লেইগ্যা সব কুটুমেরা বইয়া

আছে! আমি দাসী বান্দীগিরি করি, না? কোন লাট সাহেব আইছে! কুলিগিরি করুম না। এত মাইনষে কুলীগিরি করতাছে উনি করবেন না। করলে যে পেট ভইরা ভাত খাইতে পাইব, তা করবো ক্যান?" অবশেষে কেষ্ট কুলীগিরি করতে বাধ্য হয়।

কেষ্ট আর কেষ্ট-গিন্নির জীবনবোধ পণ্ডিতদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। কেষ্ট টিটাগড়ে গিয়ে একটা কারখানায় কুলির কাজ করে, আর বৌটা এক ভদ্রলোকের বাড়ি ঝি-এর কাজ করে। তাদের কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। এদের বাস্তববোধ ভদ্রলোকদের চেয়ে পৃথক। এরা খেটে খাওয়া মানুষ। অবস্থা পরিবর্তনেও শারীরিক পরিশ্রম করে এরা টিকে থাকে। অন্নপূর্ণা এবং পরী যেহেতু ভদ্রলোক সেইজন্য তাদের জীবনেই নানা দুঃখ এবং বিপর্যয়। মোহন কুলীগিরি করেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে কখনও সহজ হতে পারেনি। পণ্ডিত বাধ্য হয়ে হালুইকরের সহকারীর কাজ করলেও আত্মসম্মান-বোধের জন্য সেই কাজেও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে যত ট্রাজেডি সবই দেখা দেয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনেই। নাট্যকার এখানে কেষ্ট আর কেষ্ট-গিন্নির বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় দিয়ে এই ট্র্যাজেডিকে আরও করুণ করে তুলেছেন।

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটক ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার আগের বছর থেকে কলকাতার ব্যবসায়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে বিশেষ করে বাংলা ভাগ হবার পরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সংসার চালানোর দায়িত্ববোধ, আত্ম-সম্মান, চেতনা, সুরুচি ও সুনীতিবোধ তাদের সাধারণ মজদুরের মত জীবনযাপন করার পথে অন্তরায় হয়ে থাকে এবং অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হলে শকুনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া অন্য গতি নেই। তিলে তিলে অন্নপূর্ণার মত নারী ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আধুনিক যুগে নিম্নবিত্ত পরিবারে অসহায়তা এবং দুঃখ দুর্দশা ভোগই নারীর একমাত্র পরিণতি।

ছেঁড়াতার (১৯৫৩)

আমরা পূর্বে যে সব নাটক আলোচনা করেছি তার মধ্যে মুসলমান চরিত্র এসেছে প্রসঙ্গত। আমাদের সমাজের একটা বড় অংশ মুসলমান সমাজ। তাদের রীতি-নীতি, শাস্ত্রীয় আচার-বিচার স্বতন্ত্র। তাদের নিয়ে তুলসী লাহিড়ী একটি সাড়াজাগানো নাটক লিখেছেন 'ছেঁড়াতার'। এই নাটক আমাদের জাতীয় জীবনের এক মূল্যবান দলিল। এর পটভূমিকায় আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই পটভূমিকায় আমরা 'নবান্ন' নাটক দেখেছি। সেখানেও গ্রাম এবং শহরজীবনের বিভিন্ন কাহিনী এসেছে। কিন্তু 'ছেঁড়াতার' তার থেকেও স্বতন্ত্র। উত্তর বাংলার রাজবংশী ভাষায় মূলত একটি মুসলমান চাষি পরিবারের দুঃখময় জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র এতে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান যুগে তার বীভৎসতা এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করাও কষ্টকর।

চল্লিশের দশক বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণ কাল। তখন একের পর এক সাংঘাতিক সব ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল। তখনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অন্য ঘটনাগুলো তারই অনুষঙ্গ। আনুষাঙ্গিক ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মর্মান্তিক পটভূমিকায় 'ছেঁড়াতার' রচিত। একটি গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে কৃষক রহিমের জীবনে ও তার পরিবারে যে সর্বনাশ ঘটেছিল নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তাকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকের প্রথম প্রকাশকাল ১৯৫৩। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই ১৯৫০ সালে কলকাতার 'নিউ এম্পেয়ার' থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

তৎকালীন বাংলানাটক ও থিয়েটার আন্দোলনে নাটকের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে গণনাট্য যে বিশাল পরিবর্তন এনেছিল তার সঙ্গে এই নাটকের নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এর মূলে ছিল এক সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। এই সময় থেকেই বাংলা থিয়েটার জনগণের থিয়েটারে পরিণত হল। প্রাথমিক সূচনার কথা বাদ দিলে এর যথার্থ শুরু বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। তার পূর্বে থিয়েটার ছিল মূলত পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের মধ্যে আবদ্ধ। এরা থিয়েটারকে কেবল আমোদ-প্রমোদ এবং দেশাত্মবোধক উদ্দীপনার সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। গণনাট্য আন্দোলনই প্রথম নাটকের কুশী লব থেকে আরম্ভ করে তার দৃশ্য, সজ্জা পরিচালনা সবকিছুতেই আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

'ছেড়াঁতার' নাটকে আঞ্চলিকতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। তুলসী লাহিড়ী এই নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন ঐ অঞ্চলের মানুষ। তাই তাঁর লেখায় আঞ্চলিক মানুষের জীবন-ধারা, তাদের বিশিষ্ট পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অপরিচিত মানুষের কাছে এই আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার সহজবোধ্য না হলেও এই নাটকে চরিত্রায়ন, জীবনবোধ, বাস্তবতা এবং নাট্যকারের আন্তরিকতা সহজেই পাঠক এবং দর্শককে আকৃষ্ট করে। নাট্যকার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে কেবল তাদের জীবনচিত্রই মর্মান্তিক হয়ে ওঠেনি, তার প্রতিকারের জন্যও স্বাভাবিক ভাবেই পাঠক এবং দর্শক যত্নশীল হয়ে ওঠেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ, আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় যাদের চোখের জলের হিসাব নেবার কেউ নেই, যারা বঞ্চিত, উৎপীড়িত সেই সব মানুষই নাট্যকারের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য তাঁর নাটকের চরিত্র তারাই। তিনি এই সমাজব্যবস্থাকে নির্মম কশাঘাত করেছেন। ধর্মের নামে, সমাজের নামে যে অবিচার, মানবিকতার যে লাঞ্ছনা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি তীব্রভাবে তুলে ধরেছেন। এই অচলায়তন সমাজকে তিনি শ্লেষ-বিদ্রূপের মাধ্যমে নির্মম আঘাত করেছেন; অন্যদিকে তাদের প্রতিবাদী এবং সংগ্রামী চেতনাকে দিয়েছেন উৎসাহ। তাঁর লেখার বড় শর্ত হল সমাজ বাস্তবতা। যারা অগ্রগামী, যারা জীবনকে তুচ্ছ করেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে তিনি তাদেরই জয়গান করেছেন।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র রহিমুদ্দি। কৃষক হলেও সে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। স্কুলে ও ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' ছিল সে। কিন্তু গরিব বলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু তারই সহপাঠী চাষি পরিবারের ছেলে হলেও মহিম পরবর্তিকালে এক সরকারি বড় কর্মচারী। স্কুলে রহিম ভালো গান-বাজনা করত। কিন্তু সকলেই ওদের চাষা বলে ঘৃণা করে। তার বাবা পরিবারের সকলকে বাঁচাবার জন্য রহিমের লেখাপড়া ছাড়িয়ে তাকে চাষের কাজে লাগিয়ে দেয়। তার বন্ধু সরকারি অফিসার মহিমের কাছ থেকে এইসব কথা জানা যায়। তারপর রহিম পরিশ্রম করেই নিজের অবস্থা কিছুটা সচ্ছল করে তুলেছিল। বিয়ে-সাদিও করেছিল। তার মার্জিত রুচিবোধ, সৌন্দর্য-চিন্তা, উন্নত ও প্রবল ব্যক্তিত্ব তাকে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্যই সে প্রবল প্রতিরোধের সামনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সে জানে গ্রামের মানুষের সীমাবদ্ধতার কথা, "মানুষগুলার হাত পা ও মাথা

সবে আছে কিন্তুক্ কাঁয়ো পুরা মানুষ নয়।'' সে জানে মান আর হুস থাকলেই মানুষ হয়। এতএব তার বোধ-বুদ্ধি এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে সীমিত থাকেনি। স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বসিরের প্রতি তার স্নেহ ভালবাসা, মায়ের প্রতি ভক্তি তার চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। তার চরিত্রের দুটি দিক—একদিকে গভীর আবেগ অন্যদিকে অকাট্য যুক্তিবাদ। অবস্থার দুর্বিপাকে এই চরিত্রের জীবনে নেমে আসে নানা লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা।

নাটকের শুরু হয়েছে কিন্তু একটি সুখময় পরিবেশে। শহেরর পরিবেশে, রহিমের এককালের বন্ধু সরকারি অফিসার মহিমবাবুর বাড়িতে গান বাজনা এবং অতীতের সুখময় স্মৃতি দিয়ে। মহিমবাবু তার বন্ধুকে পুরানো দিনের কথা মনে রেখে একটা দিলরুবা এবং তার পরিবারের জন্য কিছু জামা, কাপড়, জুতো কিনে দিল। গ্রামের মধ্যে পাঁচ-ছ'ঘর ধনী পরিবার। আর বাকি সকলেই গরিব। রহিমের গ্রামের জোতদার, মহাজন হাকিমুদ্দি সে গ্রামের সব দন্তমুন্ডের কর্তা। তা ছাড়া ততদিনে যুদ্ধ লেগেছে। হাকিমুদ্দি সকলের কাছ থেকে যুদ্ধের চাঁদা সংগ্রহ করছে। তার যারা অপ্রীতিভাজন তাদের উপর স্বাভাবিকভাবেই চাপটা বেশি। এই হাকিমুদ্দি গ্রামের মাথা হলেও রহিমুদ্দির বড় শত্রু। কারণ রহিম ন্যায্য কথা বলে, নিজে খেটে উপার্জন করে। সে হাকিমুদ্দিকে তোষামোদ করে চলে না। মহিমের দেওয়া জিনসপত্র দেখে হাকিম ঈর্ষান্বিত হয় এবং রহিমকে চোর বলে ধরিয়ে দিতে উদ্যোগ নেয়। কারণ দারোগা, পুলিশ, গ্রামের প্রেসিডেন্ট সবই তার হাতধরা।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এল আকাল। চারিদিকে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। কৃষকেরা সপরিবারে উপবাসের আশঙ্কায় কাতর। অন্যদিকে ধনী মাতব্বররা তাদের ধানের গোলা লুঠ হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত। দুশ্চিন্তায় সকলেরই আহার নিদ্রা দূর হয়েছে। ক্রমেই হাহাকার বাড়তে লাগল। কৃষক লাঙ্গল, গরু, বীজধান, জমিজমা সব বেচতে লাগল। কেউ কেউ স্ত্রীকেও বেচে দিল। হাকিমুদ্দি পূর্বেই রহিমের পৈতৃক জমিজমা গ্রাস করে নিয়েছে। তবু রহিম কখনও হাকিমুদ্দির কাছে নতি স্বীকার করেনি।

অনাহারে তাদের দিন কাটতে লাগল। দুর্দিনে আত্মীয়রাও তাদের সাহায্য করল না। আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হল। মন্বন্তরের সময় সরকারি সাহায্যে লঙ্গরখানা খোলা হল। কিন্তু সব টাকা তো আসে গ্রামের মাতব্বরের হাত দিয়ে। হাকিমুদ্দি নিজের বাড়িতেই লঙ্গরখানা খুলল। রহিম প্রথমে সেই লঙ্গরখানায় তার স্ত্রী-পুত্রকে পাঠায়নি। পরে অনাহারে

কাতর হয়ে বাধ্য হয়ে একদিন সেখানে পাঠয়েছিল। কিন্তু রহিম চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় ঐ অজুহাতে তার স্ত্রী-পুত্রকে লঙ্গরখানায় বসতে দিল না। অবশেষে সে স্ত্রীকে তালাক-পত্র দিয়ে দিল। ফলে এখন আর রহিমের স্ত্রী ফুলজানের লঙ্গরখানায় যেতে এবং হাকিমের বাঁদি হয়ে থাকতে কোনো বাধা থাকল না। কিন্তু এর কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে, রহিম সে কথা ভাবতে পারেনি। ফুলজানকে তালাক দিয়ে রহিম তার ছেলে বসিরকে নিয়ে শহরের বন্ধু মহিমের কাছে আশ্রয় নিল। মহিম তাকে আশ্রয় দিলেও পুত্র বসির মায়ের জন্য ব্যাকুল এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে। রহিম ফুলজানকে ফিরিয়ে নিতে গ্রামে ফিরে এল। কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রমতে তা কখনও সম্ভব নয়। ফুলজান আবার কাউকে পুনরায় বিবাহ করে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত সে তার পূর্বস্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারবে না। ফুলজানের একান্ত ইচ্ছে সত্ত্বেও সে হাদিজের ভয়ে রহিমের ঘরে ফিরে আসতে পারেনি। তার একমাত্র পুত্র বসিরকে কাছে নিতে পারেনি। কারণ ফুলজান তখন হাকিমুদ্দির বাঁদি। হাকিম তাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে নারাজ। প্রতিবেশী এক রুগ্ন কানা ফকিরকে পাওয়া গেল যে অর্থের বিনিময়ে ফুলজানকে 'নিকা' করে পরদিন তালাক দিতে রাজি হল। কিন্তু হাকিম নানা চক্রান্ত করতে লাগল। অবশেষে রহিম ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে নিজেই হাকিমের বাড়ি থেকে ফুলজানকে নিয়ে আসে। কিন্তু ফুলজানের হাদিজের ভীষণ ভয়। সে রহিমের দিকে তাকাতেও পারল না। রহিমের প্রতিবেশীরা হাকিমকে প্রতিরোধ করবার জন্যই তৈরি। কিন্তু রহিম এত যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। তার দিলরুবার তার ছিঁড়ে গেল। ফুলজানের কাছে সাড়া না পেয়েই রহিমের এই পরিণতি। কিন্তু গ্রামসংস্কারে বাস করে ফুলজানের অন্য উপায় ছিল না। ফুলজান যদি রহিমের মতো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারত, তাহলে তারা তিন জনেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে পারত। ধর্মীয় ভয় মানুষকে কী অসহ্য যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে এই নাটকে তারই প্রমাণ আছে।

মুসলমান সংস্কার এবং জীবনকে ঘিরে এই নাটক সেই সময়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। ধর্মের সংস্কার না করে এদেশের কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়। বহুদিন আগে রাজা রামমোহন রায় এই সত্য অনুভব করেছিলেন। তুলসী লাহিড়ী এই নাটকের মধ্যে তাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করলেন।

এই নাটকের নারীচরিত্রের মধ্যে ফুলজানই প্রধান। অবশ্য তাকে ছাড়াও আরও দুটি নারীচরিত্র আছে। তারা হল মহিমবাবুর মেয়ে মায়া এবং রহিমের মা।

ফুলজান রহিমের স্ত্রী। রহিমের মা একটি সহজ সরল গ্রাম্য সংস্কারে বেড়ে ওঠা নারী। পিতৃমাতৃহীন ফুলজান বিবাহ-পূর্ব জীবনে ফুফার আশ্রয়ে অনাদরে মানুষ হয়েছিল। কিন্তু রহিমের সঙ্গে বিবাহের পরে তাদের জীবন সুখের হয়েছিল। মহিমবাবুর দেওয়া রহিমের স্ত্রী-পুত্রের জন্য জামা-কাপড় এবং ফুলজানের জন্য একজোড়া জুতো তার জীবনে এক প্রধান ব্যতিক্রম। গ্রাম্যজীবনে, বিশেষ করে মেয়েদের জুতো পরার কোনো অভ্যাস নেই। এমন কি চাষিপরিবারে ভাল জামা-কাপড় পরাও একটা ব্যতিক্রম। সে স্বামীর মুখে শহরের জৌলুস সভ্যতার কথা শুনে বিস্ময়ের ডাগর চোখ তুলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর বিপদ আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোন বাড়িতে চুরি হয়েছে সেই অজুহাতে হাকিম রহিমকে চুরির দায়ে ফাঁসিয়ে দিতে চায়। ফুলজানকে ঘিরেই রহিমের অনেক স্বপ্ন। কিন্তু চেষ্টা করেও রহিম মন্বন্তরের সময় তার স্ত্রী-পুত্রের মুখে খাবার সংস্থান করতে পারেনি। ফুফার বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফুলজান ফিরে এল। তখন তার স্বামীর মর্যাদার প্রতি আস্থা এবং অভুক্ত সন্তানের প্রতি জননীর বাৎসল্য এই দুই-এর দ্বন্দ্বে ফুলজান অস্থির হয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত সে তার কাতর সন্তানের খিদে মেটাতে রহিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লঙ্গর খানায় গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও সে অপমানিত হয়ে বসিরকে নিয়ে ফিরে এল। দিশেহারা রহিম হাকিমুদ্দির কৌশল বানচাল করার জন্য ফুলজানকে যে আনুষ্ঠানিক 'তালাকপত্র' দিয়েছিল তা ফুলজানের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ করল। ফুলজান একথা কখনও ভাবতেই পারেনি। কারণ তাদের পরস্পরের ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। তবে অভাবের দিনগুলো কাটিয়ে বসিরকে ও স্বামীকে সে ফিরে পাবে রহিমের এই আশ্বাসে ফুলজান বিস্ময়ের সঙ্গেও কিছুটা নিশ্চিত বোধ করে। রহিম তাকে 'তালাক' দিয়েছে এই প্রচণ্ড শক্তি-শেলের আঘাতে ফুলজান বিমূঢ় জ্ঞানহারা। যে ঘর একদিন তারা দুজনে ভালোবাসা দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল, সে ঘরে আর ফুলজানের কোনোও অধিকার নেই—এ কথা ভাবতেই তার ভীষণ কষ্ট হয়। এর থেকে চরম যন্ত্রণা তার জীবনে আর কী হতে পারে। একটি মুখের কথার পরেই তার জীবন স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়ানোর মতন অবস্থা হয়। তার পরেও রহিম যখন বসিরকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে তখনও ফুলজান তার একমাত্র পুত্রকেও বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে। কানা ফকিরের সঙ্গে তার নিকা প্রসঙ্গে, কানা ফকিরের দর কষাকষি ও অশ্লীল ইঙ্গিত এবং কানা ফকিরের সঙ্গে হাকিমুদ্দির বিকৃত রুচির আলোচনা ফুলজানের মর্যাদার পক্ষে খুবই হানিকর।

তবু স্বামী-পুত্রের জন্য সব ব্যবস্থাকেই মেনে নেওয়ার মানসিকতা এক সাধারণ গ্রাম্য সহজ সরল নারীর বিড়ম্বনারই পরিচয়। শেষ পর্যন্ত রহিম জোর করে ফুলজানকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ফুলজানের সর্ব মন-প্রাণে তার সমর্থন থাকলেও এই সরলপ্রাণা নারী ধর্মের সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে না। সে অসহায় হয়ে বলে, "ঘরে যাওয়া যায় না যে"। ফুলজানের রক্তাক্ত হৃদয় শুধু নিরুপায় আর্তনাদ করে। তবু তার একমাত্র সান্ত্বনা ছেলেকে কোলে নেওয়া। কিন্তু তার শেষের পরিণতি আরও ভয়ঙ্কর। ফুলজান ঘরে না যাওয়ায় একে একে রহিমের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় রহিম শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করে। ফুলজানের শেষ উক্তির মধ্যে, "জুড়াইছে জুড়াইছে আল্লা অঁয় কি জুড়াইছে?" উক্তিটির মধ্যে সব হারানো নারীর জীবনের রক্তাক্ত বেদনাকে অতিক্রম করে সমস্যাটাকেই জ্বলন্ত করে তুলেছে।

এই নাটকে ফুলজানের কথা বেশি নেই কিন্তু তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের হাহাকার, তার ভালোবাসা আর সংস্কারের দ্বন্দ্বই এই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। এই নাটকে আর দুটি নারীচরিত্র আছে। তার মধ্যে রহিমের মা গ্রাম্যজীবনে এক চাষির ঘরের বুড়ির মহাজনের বাঁদি হয়ে থাকার বিড়ম্বনারই পরিচয়।

অপর নারীচরিত্র মহিমবাবুর মেয়ে মায়া—শহরের এক আধুনিকা। আসছে বার ম্যাট্রিক দেবে। সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাজার চলতি আধুনিক গান করে। এই চরিত্র ফুলজানের একেবারে বিপরীত। এর দ্বারা একই সময়ে গ্রামজীবন এবং শহরজীবনে নারীর অবস্থানের তারতম্যই সূচিত হয়। আধুনিক যুগেও একদিকে যখন শহরের চাকচিক্যময় চোখ ধাঁধানো জীবনযাত্রা তখন আলোর নিচে অন্ধকারের মত গ্রামজীবনের যে করুণ অবস্থা তা এই নাটকে সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের দেশ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে। তাদের নির্মম শোষণের এক শোচনীয় পরিণাম ছিল ভারতবর্ষে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মান্তিক চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ হয়েছিল বাংলার ১৩৫০-এর মন্বন্তর। এ সম্পর্কে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন, "১৩৫০ সম্বন্ধে কোন বাঙালিকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেননা ১৩৫০ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙ্গা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে

পথে মৃত্যুর ইতিহাস। আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।" (দ্র. সুকান্তের জীবন ও কাব্য,—ড. সরোজমোহন মিত্র। পৃ. ৪০)।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতীয় কৃষির অবস্থা যে কী পরিমাণে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল তার নগ্ন প্রকাশ পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন হারছিল। বার্মাদেশ থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশে তখন মালের ঘাটতি ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহের। সেই ঘাটতি আমদানি এবং সুসম বন্টনের দ্বারাই মেটানো যেত। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের তখন সেদিকে লক্ষ ছিল না। তারা তখন যুদ্ধের খেলায় মত্ত। ব্যাপক কাগজি মুদ্রা ছাপিয়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিল তারা। ব্যবসায়ীচক্র নিজেদের কোলে ঝোল টানবার জন্য জিনিস-পত্রের দাম হু হু করে বাড়িয়ে দিল। গোপনে মজুদ করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করল। শুরু হল ব্যাপক কালোবাজারি। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে যেখানে চালের দর মণ ছিল মাত্র ৬ টাকা, সেখানে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে প্রতি মণ চালের দাম উঠল ১০০ টাকা। দরিদ্রতর শ্রেণির উপরে এই আঘাত এসে পড়ল প্রচন্ড। মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে গ্রামগুলো শ্মশান হয়ে গেল।

'ছেঁড়াতার' এই নির্মম পটভূমিকায় রচিত তৎকালের এক নির্ভরযোগ্য চিত্র। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সুবিধাভোগী মানুষেরা যে আরও নির্মম হয়ে ওঠে 'ছেঁড়াতার' নাটকে হাকিমুদ্দির চরিত্রে তার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তৎকালীন সমাজের এক নির্মম কিন্তু যথার্থ চিত্র এই নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকের আরও বেশি আকর্ষণ হল—আমরা এখানে সমাজের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার সঙ্গে একটি মুসলিম পরিবারের কথাও জানতে পারি। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, অন্যদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের নির্দয়তা গ্রাম্যজীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই সমাজের দুটো শ্রেণি গড়ে উঠেছে। একদিকে জমিদার, মহাজন, বড়লোক অন্যদিকে সাধারণ গরিব মানুষ। তাদের মধ্যে ধর্মভেদ থাকলেও কোন জাতিভেদ নেই। রহিম-ফুলজানের দুরবস্থার সময়ে গ্রামের সব মানুষ-ই তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছে। তাই ফুলজানের দুঃখ কেবল কোনো এক বিশেষ ধর্মীয় নারীর দুঃখ নয়; সাধারণ গরিব মানুষেরই এক দারুণ বিড়ম্বনা।

ধর্মঘট

'ধর্মঘট' আধুনিক যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের এক উল্লেখযোগ্য নাটক। রবীন্দ্র-উত্তর যুগে তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে গণ্য করা হয়। আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি আত্মিক যোগ রেখে তিনি তাঁর নাটকে প্রগতিমূলক চিন্তা ও আদর্শের পরিচয় রেখেছেন। তাঁর বহু নাটকে কৃষক, শ্রমিক অবজ্ঞাত উপজাতীয় লোক প্রভৃতি প্রধান স্থান লাভ করেছে। বর্তমান সমাজের বিষময় ব্যাধিগুলি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মহাজন, জমিদার, মিল-মালিক, অসাধুব্যবসায়ী প্রভৃতির অমানুষিক শোষণ ও নির্মম প্রবঞ্চনা তাঁর নাটকে প্রকাশ লাভ করেছে।

আমরা লক্ষ করেছি সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা বাংলানাটকের প্রধান উপজীব্য ছিল পরে জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারা নাটকে অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এইটাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। নাটক জীবনের দর্পণ। সমাজের সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সামাজিক সমস্যা দেশের পরাধীনতা নাটকের প্রধান উপজীব্য হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশেষ করে গণনাট্য আন্দোলনের ফলে বাংলা নাটক সাধারণ মানুষের জীবনের দর্পণ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা আধুনিক সমাজজীবনকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে নাটকে রাজনীতিবোধও প্রবল হয়ে উঠেছে। আমরা সাম্প্রতিক যে-সব নাটক আলোচনা করেছি তার মধ্যে এর স্পষ্ট প্রকাশ অনুভব করেছি।

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যা শ্রমিক-মালিকের বিরোধ। বনধ্, ধর্মঘট বর্তমানে প্রতিবাদ প্রতিরোধের এক বড় হাতিয়ার। মন্মথ রায়ের এই নাটকের নামই 'ধর্মঘট'। মালিক ও শ্রমিকের সংঘাত অবলম্বনেই এই নাটক রচিত।

হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্ফীত ছাতার কারখানার মালিক দীনবন্ধু চৌধুরী কারখানার ব্যয় হ্রাসের জন্য ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা এই ছাঁটাই-এর প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প। হিন্দু-মুসলমান সব শ্রমিকই এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। তখন শ্রমিকের সংঘশক্তি ভেঙে ফেলবার জন্য মালিক ইংরেজদের অবলম্বিত পুরানো কৌশল গ্রহণ করেছিল— 'Divide and rule'। অর্থাৎ বিভেদ ও শাসনের কূট কৌশল অবলম্বন করে মালিক দীনবন্ধু চৌধুরী শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল।

মালিক শ্রমিকের এই সংঘাতপূর্ণ কাহিনী এই নাটকের প্রাণকেন্দ্র।

এই নাটকের দুই প্রধান শ্রমিকসর্দার জনার্দন এবং ইব্রাহিম। এই কারখানায় দুটোই জাতি—মালিক এবং শ্রমিক। শ্রমিক শোষণের ব্যাপারে মালিকের যেমন কোনো ধর্ম নেই তেমনি মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও শ্রমিকের কোনোও জাতিভেদ নেই। জনার্দনের মেয়ে মায়া এবং ইব্রাহিমের ছেলে লাল মিঞা বাল্যকাল থেকেই একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে, বেড়ে উঠেছে। এখন এক সঙ্গেই নাটক করে, নাচ-গান করে। মায়া এবং লাল মিঞার ঘনিষ্ঠতা বিবাহে পরিণতি লাভ করতে চলেছে। সিদ্ধান্ত ছেলে মেয়ে দুজনেরই। অভিভাবকরা এদের মেলামেশা প্রত্যক্ষ করলেও বিবাহের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে তাদের কোনো আপত্তিও নেই।

এই হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধতাই মালিক দীনবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শ্রমিক কলোনিতে 'মহুয়া পালাগান'-এর স্টেজ রিহার্সালের সময় মিথ্যা কথা বলে দীনবন্ধুর ভাড়াটে লোক অর্থবলে কৌশলে মায়াকে অপহরণ করে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। দাঙ্গায় অনেকের ঘর-বাড়ি পুড়ে যায়। অবশেষে হাত-মুখ বাঁধা, আগুনে আহত মায়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, এবং মালিকের সমস্ত হীন ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। বেপরোয়া শ্রমিকরা আবার মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই নাটকে দুইটি মাত্র নারীচরিত্র আছে। শ্রমিক নেতা জনার্দনের স্ত্রী পার্বতী এবং মেয়ে মায়া। নারীচরিত্রের মধ্যে মায়াই প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই যত গণ্ডগোল। মায়া আধুনিক যুগের মেয়ে। লেখাপড়া শিখেছে। নিজের বোধ-বুদ্ধি মতোই সে চলতে শিখেছে। সে শ্রমিক কলোনির লাল মিঞাকে ভালোবাসে। এমন কি তাকে সে বিয়ে করারও সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রমিকপল্লির অনেকেই এ কথা জানে। শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা পরস্পর মেলামেশা করে একসঙ্গেই বড় হয়। তারা স্থির করেছে 'মহুয়া পালাগানে'র টিকিট বিক্রি করে একটা 'প্রসূতি সদন' গড়ে তুলবে। শহরের ভদ্রলোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে টিকিট বিক্রি করেছে। এই মহুয়াপালা-গানে লাল মিঞা সেজেছে 'নদের চাঁদ' আর মায়া 'মহুয়া'। মায়া একটি 'ফরওয়ার্ড' মেয়ে। নিজের ভবিষ্যতের কথা নিজেই চিন্তা করে। তার পিতা জনার্দন ভারি গোঁড়া হলেও শেষপর্যন্ত দেখা যায় লাল মিঞার সঙ্গে মায়ার বিবাহে তার কোনো আপত্তি নেই। মায়া লাল মিঞাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু

লাল মিঞা শ্রমিক বলেই 'ধর্মঘট' সফল হওয়া পর্যন্ত মায়াকে অপেক্ষা করতে বলে। সে বলে, "তোমাকে আমি বিয়ে করলে তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন। হিন্দুরা ক্ষেপে যাবে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধবে। শ্রমিকের একতা নষ্ট হবে। ধর্মঘট ফেল করবে।.........বিয়ে আমি তোমাকে করবোই। কিন্তু ধর্মঘটটা আগে ভালোয় ভালোয় চুকে যাক।" কিন্তু মায়া বলে, "ধর্মঘট যদি ধর্ম হয় আমাদের বিয়েটাও অধর্ম নয় লালুদা। আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—পারছিনা আমি—একটা সত্য—একটা ধর্ম—আমরা যদি পালন করি, আর একটা সত্যে—আর একটা ধর্মে কেন আঘাত লাগবে।" মায়া অন্যদিকে তার মা-বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে।

তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মায়ের কলিক পেনের মিথ্যা খবর রটিয়ে মায়াকে দীনবন্ধু নিজের গাড়িতেই অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অপহরণকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বাধে। লাল মিঞাও মায়ার সন্ধানে দূরে ছুটাছুটি করে। মায়া এবং লাল মিঞার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে দীনবন্ধুর পালিত দালাল হারানের বাড়ি থেকেই মায়াকে পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণেই ইব্রাহিমের লোকেরা হারানের বাড়িতে আগুন দিয়েছিল। সেই আগুনে মায়ার শরীরও ঝলসে গিয়েছিল। মায়ার কাছ থেকেই সত্য ঘটনা জানা গেল। লাল মিঞা কিংবা ইব্রাহিমের কোনো লোক মায়াকে চুরি করেনি। হারানই দীনবন্ধুর টাকা খেয়ে এই জঘন্য কাজ করেছিল। সে কথা হারানও পরে স্বীকার করেছিল। "ওরা বুঝেছিলেন, তোমাদের স্ট্রাইক বন্ধ করতে আর কোন পথ ছিল না। ছিল এই একটিমাত্র পথ। মায়াকে সরিয়ে ফেলে দুই দলে একটি দাঙ্গা বাধানো। তাই আমাদের কয়েকজনকে টাকা খাইয়ে হাত করে—মায়ের কলিক হয়েছে বলে মায়াকে থিয়েটার থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন নিজের মোটরে, যে মোটরে রুমালে ক্লোরোফরম্ মাখিয়ে লুকিয়ে বসেছিলাম আমি।" সেদিন মায়াকে হারানের বাড়িতেই নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় মায়ার নিজস্ব কোনো ভূমিকা ছিল না। সে ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চড়ানোর জন্য মালিকের হাতের গুটি।

পার্বতী মায়ার মা। মায়ার অপহরণের পরেই আমরা নাটকে তাকে দেখতে পাই। মেয়ে হারাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই মাতৃহৃদয় অস্থির। সেই অস্থিরতার সংবাদ দিয়েই পার্বতীর আবির্ভাব। যে আব্দুল পার্বতীর শূল

বেদনার মিথ্যা খবর দিয়েছিল তার উপরেই পার্বতীর যত রাগ। আসলে সবটাই ছিল সাজানো। পার্বতী যথার্থ অর্থেই জননী। পার্বতী জনার্দনের কাছে অভিযোগ করে, "মেয়েকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছিল। দু-পাতা লেখাপড়া শিখেছে বলে মেয়ে ঘর-গেরস্থালির কাজ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় নেক্‌চার দিয়ে বেড়ায় কার আস্কারায়? তোমার। ধাড়ী ধাড়ী ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, গান-বাজনা করে, থ্যেটার করে। বাধা তো দাওনিই,—বরং তারিফ করেছ। মেয়েছেলের মাথা এতে ঠিক থাকে—ঐ সোমত্ত মেয়ের? এখন হল তো! মুখে চুনকালি পড়ল তো!" জনার্দন কিন্তু স্থিরবুদ্ধির লোক। তাদের ঐ একমাত্র সন্তান। মেয়েটাই ছিল তার ছেলে। তার হাতের লঠি। পার্বতী ঠিক সন্দেহ করেছিল যে, তার মেয়েকে কেউ চুরি করেছে। জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সে জনার্দনকে থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু জনার্দন পুলিশে তবু খবর দেয়নি। কারণ এতে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়ে যাবে। জর্নাদন লাল মিঞা এবং মায়ার সাদি করার কথাও হারানের কাছে শুনেছিল তার উত্তরে জনার্দন বলেছিল, এ বিষয়ে সে কিংবা পার্বতী কিছুই জানে না। তবে এ বিষয়ে সে তার স্পষ্ট মত জানিয়েছে। সে বলেছে, "মেয়ে যদি নাবালিকা হত, তবে অবশ্য এ বিয়েতে আমরা কখনও রাজী হতাম না। কিন্তু মেয়ে এখন সাবালিকা । তার মত হলে এ বিয়েতে অন্তত আমি কোন বাধা দিতাম না।"

মায়ার অনুপস্থিতির খবরে মিথ্যা গুজব রটনা করে মালিকের কৌশলে যখন শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ল তখন পার্বতীর মুখেই জানা যায় যে, ওরা মেথর পাড়ায় আগুন দিয়েছে। পার্বতী জননী এবং নারী হলেও সে এই সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাতে চায় না। পার্বতী বলেছে, তার এক মেয়ের জন্য আর দশ জনের ছেলেমেয়ে মরবে এ সে কিছুতে চায় না। মারামারিতে হারানো ধন ঘরে আসে না। মাঝখান থেকে ঘরের ধন হারিয়ে যায়। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যে যখন লাল মিঞা ফিরে এল তখন পার্বতী লালমিঞার কাছে সব ঘটনা জানতে পেরেছে। পার্বতী লালমিঞাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার থেকে বোঝা যায় পার্বতীর মেয়ে হারালেও কখনও তার মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়নি। জনার্দন আগুন জ্বালাবার কথা বললেও পার্বতী নারী হয়েও অনেক বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল অন্যের বাড়িতে আগুন দিয়ে, অন্যের ক্ষতি সাধন করে তার কোনো উপকার হবে না।

'ধর্মঘট' সাম্প্রতিক কালের নাটক। সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন নাটক। বাস্তব বুদ্ধি থেকেই মানুষের চেতনাও প্রাগ্রসর হয়। এই চেতনায় ধর্মভেদ থাকলেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থনীতির স্বার্থেই যত বিভেদ, যত গণ্ডগোল। যারা খেটে খায়, যারা শ্রমজীবী মানুষ তাদের একটাই স্বার্থ—শোষণ এবং শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

এই নাটক শ্রমিক সাধারণের নাটক। শ্রমিক চেতনায় শিক্ষা লাভ করে জীবনসংগ্রামে নারীরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকনেতা জনার্দনের মেয়ে মায়া জনার্দনের হাতের লাঠি। সে পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিকের স্বার্থেই বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। সে লেখাপড়া শিখেছে, তার কাছে মানুষই সকলের চেয়ে বড়। সেখানে ধর্ম কোনো বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। মেয়ে সাবালিকা বলে সে তার পছন্দ মত জীবন-সঙ্গীও নির্বাচন করে নিতে পারে। এতে পিতা-মাতার কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। আধুনিক শিক্ষা এবং সমাজ পরিবর্তনের ফলে নারী এখন ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়েছে এবং স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পেরেছে। সমাজে নারীর অবস্থানের এটা গুণগত পরিবর্তন। পার্বতী কতটা শিক্ষিত আমরা জানি না। কিন্তু সেও বাস্তববুদ্ধি নিয়ে নিজের স্বার্থকেই বড় করে ধরেনি। নিজের হারানো মেয়ে সন্ধানের চেয়েও তার কাছে দশজনের কল্যাণ চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে আমরা যে অসহায় অবরোধবাসিনী কুলকামিনী এবং নারীদের অবস্থান লক্ষ করেছি তার থেকে এযুগের নারীরা শিক্ষায়, দীক্ষায় মানসিক শক্তি এবং চেতনায় ও সামগ্রিক কল্যাণবোধে অনেক এগিয়ে এসেছে। আমাদের বাংলার সমাজের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। এখানে ধর্ম কোনো বিশেষ বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজৈনতিক কারণে অনেক সময় এই ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠলেও মনের দিক থেকে জীবনচর্যার দিক থেকে এই বিভেদ কখনও দৃঢ়মূল হতে পারেনি।

পার্বতী বা মায়া আধুনিক সমাজের কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়। বর্তমানে সাধারণভাবে এবং সর্বস্তরে নারীজীবনের এবং নারীর অবস্থানের যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তারই নিদর্শন আছে এই নাটকে।

আমরা পূর্বে সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের নারীজীবনের প্রাগ্রসরতা লক্ষ করেছি। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের নারীজীবনের প্রাগ্রসরতা লক্ষ

করেছি। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সময় থেকে নারীর জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সমাজের যারা নিচু তলার মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ—তাদের জীবন এবং সমস্যা নিয়ে নাটক রচিত হচ্ছে। ফলে আধুনিক নাটক কেবল শিক্ষিত মানুষের জীবনের প্রতিফলন নয়, সর্বস্তরের মানুষের জীবনের প্রতিফলনই সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

নারী। সমাজজীবনের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ নারী। সমাজের আমূল পরিবর্তন না ঘটলে পরিপূর্ণ নারীমুক্তিও সম্ভব নয়। তবে শিক্ষায়, শ্রমে সমাজের বিভিন্ন অংশে নারী এখন পুরুষের সহযোগী, এমনকি প্রতিযোগীও হয়ে উঠেছে। সমাজের সকল স্তরেই এই পরিবর্তন সমানভাবে দেখা না দিলেও নানা ভাবে যে পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করেছে তা অনস্বীকার্য। 'ধর্মঘট' নাটকেও আমরা তারই প্রতিফলন লক্ষ করছি।

উপসংহার

উনিশ শতকের ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার প্রবল আলোড়নে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কে আদর্শের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বাঙালির জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। আমাদের আলোচিত কালপর্বে ১৮৫৪-১৯৫৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের নারীচরিত্র অবলম্বন করে আমরা সমাজে নারীর অবস্থানের যে ক্রমিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার অনুধাবনের চেষ্টা করেছি।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর একটি রচনায় (প্রাচীন সমাজে নারীর আইনি অধিকার) দেখিয়েছেন, প্রাচীনকালে সমাজে নারীর মর্যাদা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু কালপ্রভাবে সমাজে অর্থনৈতিক চাপে নারী যখন অন্তঃপুরবাসিনী দাসীতে পরিণত হয়েছে তখন নারীর মর্যাদা ভীষণ কমে যায়। তারপরে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে যখন মানুষের জন্মগত অধিকার সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল তখন নারীজাতিকেও সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কারণ নারী যদি মনুষ্যত্বের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়।

ইউরোপে মিল ওয়েন কিংস্ লে প্রভৃতির চেষ্টায় এই জাগরণ পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে সেই ভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠে। আমরা জানি মানবকল্যাণ-যজ্ঞের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায় নারী জাতির প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, তাঁর আদর্শেই নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, নারীর দায়াধিকারে রামমোহনের প্রচেষ্টা, কন্যাপণের বিরুদ্ধে রামমোহনের অকাট্য যুক্তি, বহু বিবাহ প্রথা নিরোধে রামমোহনের চেষ্টা, বিধবাদের দুঃখে রামমোহনের সহানুভূতি, বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ প্রভৃতি নারীকল্যাণ প্রচেষ্টায় তাঁর শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক আলোড়ন নারী জাগরণের সূচনা করেছিল। রাজনারায়ণ বসু যথার্থই বলেছেন, "রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকিল ছিলেন এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত স্মিথ সাহেবও নহেন।" রামমোহন তাঁর উইলে স্পষ্ট নির্দেশ

দিয়েছেন যে, যদি তার পুত্রগণ বা তাদের বংশধরের মধ্যে কেউ এক পত্নী বর্তমান থাকতে পুনরায় দার গ্রহণ করে তবে সে তার বিত্তের ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা দেখেছি রামমোহনের পরে দ্বারকানাথ, প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর, কিশোরী চাঁদ প্রভৃতির চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা আয়োজন। বিদ্যাসাগর তো বিধবা বিবাহের উদ্যোগের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় বামাহিতৈষিণী সভা, ব্রাহ্মিকা সমাজ, বামাবোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি প্রভৃতি নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নারী জাগরণের বিরাট সূচনা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে আরও বহুবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে নারী তাদের দাসত্ব-জীবন থেকে ক্রমশ বেরিয়ে এসে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শিক্ষায়, নানা সামাজিক কর্মেও নারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বহু 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। এমনি করেই নারীজাতিকে মুক্তি দেবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এখনও সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং সমস্যা বিদ্যমান। তা হলেও, শিক্ষিত, সচেতন নারীর জীবনে যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা আমরা 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক থেকে 'ধর্মঘট' নাটকে এসে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি।

মানবজীবন গতিশীল এবং প্রতিনিয়তই তা পরিবর্তিত হয়ে আরও উন্নতিকর পথে অগ্রসর হচ্ছে। পরিবর্তনের এ ধারায় বেগ সঞ্চার করে শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জ্ঞান ও কাজ করবার সুযোগ ইত্যাদি। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে ঐ সব সুযোগ সুবিধার সংকোচন কিংবা প্রসারণের বীজ নিহিত থাকে। পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, অর্থনীতি ইত্যাদি আলোচনার মধ্যে এসে যায়। সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরও সেই সব আলোচনা করতে হয়েছে।

ইতিহাসের ক্রমঅগ্রগতি পর্যালোচনা করে কোনো বিশেষ বিষয়ের সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। আমাদের কাজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নিয়ে নয়, নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা নারীর অবস্থান সম্পর্কে শতবর্ষ ব্যাপী এক পর্যালোচনা সমাপ্ত করেছি। এর মধ্যে ২৩টি নাটকের যে বিস্তৃত আলোচনা করেছি তাতে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষা, এবং সামাজিক আন্দোলনের ফলে নারী আপনার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা তথা স্বাধিকার অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং পরিবারপ্রথার রদ-বদল ইত্যাদি যাবতীয় পরিবর্তন সাধনকারী বিষয়গুলি আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তার থেকে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে কীভাবে সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানেরও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে নারীর বিন্দুমাত্র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আমাদের আলোচনার সর্বশেষ নাটক 'ধর্মঘট' (১৯৫৪) নাটকে তার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা দেখেছি নারী সংসার ও সমাজের অবরোধ থেকে অনেক মুক্ত, অনেক স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করেছে। গার্হস্থ্যজীবনে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক কাজকর্মে রাজনীতি এবং ধর্মঘটী মিছিলেও নারী পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে। আধুনিক এই পরিবর্তনের অন্তরালে যে একটা গভীর অন্ধকার এবং মনুষ্যত্ব-বিরোধী সামাজিক রীতিনীতি ছিল আধুনিক যুগের মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের আলোচনা অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণে নারীজাগরণের একটা শতবর্ষের ইতিহাস আছে।

এই শতবর্ষের ইতিহাসে অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছে। সামাজিক জীবনে যেমন নারীকে বাদ দিয়ে কিছু কল্পনা করা যায় না, তেমনি নারীচরিত্র ছাড়া নাটকও খুব অল্পই আছে। আমাদের আলোচনায় সব নাটক উল্লেখিত হয়নি। আমরা তো নাটকের ইতিহাস রচনা করতে উদ্যোগী হইনি। আমাদের লক্ষ নাটকে নারীর অবস্থান। প্রতি যুগসন্ধিক্ষণে বিশেষ বিশেষ নাটক সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে বহু নাটক রচিত হয়েছে।

বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকের তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু আমরা এখানে ঐ পর্যায়ের মাত্র একটি নাটক আলোচনা করেছি। সেই নাটক প্রতিনিধি স্থানীয়। বিধবার দুঃখ, দুর্দশা, তার জীবনযন্ত্রণা, সমাজজীবনে তার অবস্থান এই নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনি করে বিশেষ বিশেষ যুগে সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনার জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক নির্বাচিত করেছি এর মধ্য দিয়েই যুগ পরিবর্তনের

একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আশাকরি এই সীমিত নির্বাচনের দ্বারা আমাদের আলোচনা ব্যাহত হয়নি। লক্ষ যেখানে স্থির সেখানে নির্বাচনকেও গুণগত করা প্রয়োজন।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা নাটকের ইতিহাস রচনা করেছেন, আমরা তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছি, সশ্রদ্ধভাবেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাসও অনেকে আলোচনা করেছেন। আমরা সেসব আলোচনার দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু বাংলা নাটকের নারীচরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শতবর্ষব্যাপী নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে জানা নে । আমাদের স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকতা এখানেই। বর্তমানে নারীজাগরণের যে প্রবল জিজ্ঞাসা বর্তমান নাটকের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় আমাদের এই আলোচনা সেই জিজ্ঞাসারই এক প্রসারণ। এখানে সীমাবদ্ধতা যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা আমাদের অনাকাঙ্খিত। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যদি কিছু ত্রুটি ঘটে তবে তা অনিচ্ছাকৃত। বিষয় নির্বাচন এবং বিশ্লেষণে আমাদের মৌলিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যই বিবেচ্য।

গ্রন্থেতিবৃত্ত

১। নাটকের কথা — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

২। রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন — যোগানন্দ দাস।

৩। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। Age of Reason — Thomas Pain.

৫। The English Works of Raja Ram Mohan Roy — Letters.

৬। সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক — গোলাম মুরশিদ।

৭। উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা — ড. অজয়চন্দ্র সরকার।

৮। সমাচার দর্পণ পত্রিকা।

৯। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন — কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভূমিকাংশ।

১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ — নগেন্দ্রনাথ বসু।

১১। বহুবিবাহ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১২। অবোধবন্ধু, ভাদ্র ১২৭৬।

১৩। সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক — গোলাম মুরশিদ।

১৪। বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৩।

১৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮। বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১২৭২।

১৬। A Statistical Account of Bengal V.55, (হান্টারের মতে)

১৭। বহুবিবাহ, পৃঃ ৩৯৫ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮। Kulin Polgamy, P-145, K. M. Banerjee.

১৯। সমাচার দর্পণ, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৯, সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

২০। The Kulin Brahmins of Bengal — K. M. Banerjee.

২১। Foreign Accounts of Marriage in Ancient India — S. Bandopadhyay.

২২। মনুসংহিতা।

২৩। The Kulin Brahmin of Bengal — P. - 16, K. M. Banerjee. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ভাদ্র, ১৭৬৭ শকাব্দ (আগস্ট, ১৮৪৫)।

২৪। আত্মচরিত — শিবনাথ শাস্ত্রী।

২৫। বিদ্যাদর্শন পত্রিকা।

২৬। শরৎ সাহিত্যে সমাজ চেতনা — ড. সরোজমোহন মিত্র।

২৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,— শিবনাথ শাস্ত্রী।

২৮। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, — অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯। বিয়ে পাগলা বুড়ো, — দীনবন্ধু মিত্র।

৩০। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড — বিনয় ঘোষ।

৩১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩২। সমাচার দর্পণ — ঈশ্বর গুপ্ত।

৩৪। রাণীভবানী, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৪ (১৮৯৮) — অক্ষয় কুমার দত্ত।

৩৮। পল্লীসমাজ — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৯। সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, — গোলাম মুরশিদ।

৪০। ভূমিকা — সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রহসন।

৪১। শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম — শিবনাথ শাস্ত্রী।

৪২। জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮০।

৪৩। সেকাল আর একাল, — রাজনারায়ণ বসু।

৪৬। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭ — বিনয় ঘোষ।

৪৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২২১ — শিবনাথ শাস্ত্রী।

৪৮। নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ — প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

৪৯। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৫০। রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন — যোগানন্দ দাস।

৫১। „ „ „ „ পৃঃ ২১৫।

৫২। রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫ — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

৫৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২২৩ — শিবনাথ শাস্ত্রী।

৫৪। বন্দী নারী, পৃঃ ৮১ — সম্পাদনা স্বপন সিংহ।

৫৫। সখী সমিতি — সম্পাদনা স্বর্ণকুমারী দেবী।

৫৬। ভারতী পত্রিকা — ১২৯৫ পৌষ, পৃঃ ৫৩২-৩৩।

৫৭। ২০০ বছরে বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার।

৫৮। বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক, পৃঃ ৪৯২।

৫৯। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - - ড. নীহাররঞ্জন রায়।

৬০। সুকান্তের জীবন ও কাব্য — ড. সরোজমোহন মিত্র।

৬১। চিরায়ত সাহিত্য সংগ্রহ — সম্পাদনা কাঞ্চন বসু।
